কলকাতা

পুরশ্রী

নাগরিক পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে বকেয়া কর অবিলম্বে মিটিয়ে দিন

জলই জীবন—এর অপচয় রোধে সক্রিয় সহযোগিতা করুন

আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক সময়ে ফেলুন

কলকাতা আমার—আপনার। এর ঐতিহ্য বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সবারই

কলিকাতা পৌরসংস্থা

756.05
P77
756.
P

কলকাতা পুরশ্রী

২৩-৩৪ যুগ্ম সংখ্যা ❑ ২৩ বর্ষ ❑ ২৬ জুন, ২০০০

শিল্পী গৌরিহর চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে একটানা মনোযোগ দিয়ে একাজ করে গিয়েছেন। গত ৭২ এপ্রিল প্রতিকৃতিটির চিত্রণ হলে শিল্পীকে ঘেরেছে মৃত্যু আমরিক সংবেদনা। অনুরাগে চলন্ত শিল্পীর প্রচ্ছদ এ সংখ্যায় রয়েছে।

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয় ❑ ২
গৌরিহর চট্টোপাধ্যায়ের আমরিক সংবেদনা ❑ ৩
নতুনভাবে দৌখার, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ৩
অর্থসংস্থান / তুলসী গোস্বামী ❑ ৭
কলকাতার পার্শী প্রতিবেশী / পীযূষকান্তি ঘোষ ❑ ১০

কলকাতার আমরণের ঘোক অনেক মেয়ের মানুষ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে গড়ে তুলেছে কলকাতা শহরের আন্তর্জাতিক চেহারা। গত দু বছর ধরে এই সমস্ত মানুষকে নিয়ে অনুসন্ধানমূলক লেখা পুরশ্রীতে প্রকাশিত হচ্ছে। এবারের বিষয় কলকাতার পার্শী প্রতিবেশী।

সহযোগী অরুণকুমার বসু
মূল্য এক টাকা

সম্পাদক : অমলেন্দু ভট্টাচার্য

কলিকাতা পৌরসংস্থার পক্ষে মুখ্যসচিব কর্তৃক, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, ১ কম স্ট্রীট, ৪র্থ তলা, (ঘর নং ৪০৯), কলকাতা-৭০০ ০০১ হইতে প্রকাশিত এবং বসুশ্রী প্রিন্টার্স লিমিটেড কর্তৃক ১২১, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

গত দু বছর ধরে আমাদের পুরশ্রীতে ''কলকাতার প্রতিবেশী'' শীর্ষক বেশ কিছু গবেষণামূলক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখাগুলি ইতিমধ্যেই সমাদৃত হয়েছে। এবারের সংখ্যার বিষয় ''কলকাতার প্রতিবেশী পার্শী সম্প্রদায়।''

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে পরিবেশ বিষয়ক একটি লেখা দেওয়া হল।

শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রদত্ত শিক্ষামন্ত্রী ও শিল্পীর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ নাগরিক সংবর্ধনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে দেওয়া হল।

P, 10, 802

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাগরিক সংবর্ধনা

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে মানপত্র তুলে দিচ্ছেন মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়

গত ২৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় ঐতিহ্য-মণ্ডিত টাউন হলে শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল কলকাতা পৌরসভা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মেয়র পারিষদ সময় রায়চৌধুরী। মেয়র প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় মানপত্র পাঠ করে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের হাতে সেটি তুলে দেন। সঙ্গে ফুল, ফলের ঝুড়ি, মিষ্টান্ন, পৌরসভার প্রকাশিত বইপত্র এবং পৌরসভার লোগোও উপহার দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী সত্যসাধন চক্রবর্তী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, "আমি প্রথমেই আমার পক্ষ থেকে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের প্রিয় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই কলকাতা পৌরসংস্থাকে যে তাঁরা আমাদের সকলের প্রিয় শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নাগরিক সংবর্ধনায় সংবর্ধিত করছেন। প্রথমেই বলে রাখি আমার আজকে খুব ভাল লাগছে শুধুমাত্র সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত সেইজন্যই নয়, আমার ভাল লাগছে এই জন্যে আমার প্রিয় শিল্পী যাঁর

অভিনয় এবং আবৃত্তি আমি মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলাম এবং শুনেছিলাম আজকে তিনি সংবর্ধিত। অভিনেতা গৌতমির চট্টোপাধ্যায় বাংলার জনগণের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। একজন শিল্পীর সবচাইতে বড় গৌরব মানুষের হৃদয়ে যখন তিনি স্থান করে নেন। মানুষ যখন তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দেয়। তার চেয়ে বড় পাওনা আর কিছু হতে পারে না। তবে সংবর্ধনা সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ে হয় কিন্তু তিনি চিরদিনই জনগণের কাছে সংবর্ধিত। আজকে আমাদের ভাল লাগে এঁর অভিনয় তখন দেখেছিলাম জগদ্দল পর্বতে কিংবা বিটি হয়ে যেতাম, বুদ্ধির দীপ্তি, উচ্চারণের স্পষ্টতা, এবং সবটা মিলে অভিনয়ে সকলে মনে হয় অনেক বাঙালিরা যেমনটি হতেছিলাম তেমন একজন অভিনেতাকে পেলাম। আমি যাকে মনে করি যেদিন সংবর্ধনাতে আমাদের আকৃষ্ট করেন। এখন মনে হয় সবটা মিলে তিনি আমাদের আকৃষ্ট করেছেন। এবং শুধু হৃদয়ের কাছে আবেদন নয়, ভাবাবেগ নয়, বুদ্ধির কাছে আবেদন ছিল এবং যেটা আমাদের খুব ভালো লাগত। প্রশান্তবাবু তাঁর সংবর্ধনির ভাষণে বলেছেন, জনযুদ্ধের সঙ্গে এক হয়ে চলা, জীবন থেকে পালিয়ে যাওয়া নয়—এই ধরনের যে অভিনয় এবং রবিন্দ্রভিনয় আমাদের মুগ্ধ করত। আমাদে খুবই ভাল লাগে আমাদের বাংলার সেই যুগটা যখন পানে, অভিনয়ে, সাহিত্যে সবকিছুকে আমার মনে হয় যেন আমাদেরই জন্যপুর হয়ে গেছে। আমরা এত পেয়েছি এঁদের কাছ থেকে এখন মনে মনে অনেক সময় দুঃখ হয়, আমি অনেক সময় জিজ্ঞাসা করি কি এমন ঔদ্ধত্য বলুন তো আমাদের ঘাড়ে করলে, আমাদের যৌবন বয়সে আমরা আমাদের শিল্প-সাহিত্যে যে জীবন পেয়েছি, তার থেকে নিরিড় পরিচয়ের ছবি দেখবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজকে অনেক ক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত যেন। আজকে শিল্পের যে পরিবর্তনগুলি হচ্ছে তা আমাদের আকর্ষণ করে না যেন। আমাদেরই কোনও দুর্বলতা না কি শিল্পের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সেটা গ্রহণযোগ্য নয়? আমি সেই কথা আজকে বলব না। কিন্তু একথাও বলব যে, আমরা পড়েছি, আমরা পড়ছি এইজন্যই যে গৌতমির চট্টোপাধ্যায়ের মতো আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম অভিনয়ে প্রিয় শিল্পীকে, যিনি অভিনয়ে সুখ দিতেন, যিনি আমাদের ভাবতেন, যিনি আমাদেরকে আকৃষ্ট করতেন, এই অভিনয় নৈপুণ্যে। আমি একটা কথা বলার বিশেষ অর্থে, মহাকরণে বসন্তদাস যে অদ্ভুত একটা বুদ্ধির দীপ্তি এবং চোখে-মুখে দেখতাম আর মনে মনে মনে হয় একজন ঠিক অনবিবল হলে কেমন হবে? কখন সেটা আমাদের উপহার দিতে পারে? যাই হোক, আমি এ বিষয়ে কোনও বিশেষজ্ঞ নয়, শুধু এ কথা বলতে পারি যখনই এঁর অভিনয় দেখেছি তখনই মুগ্ধ হয়ে দেখেছি এবং আবৃত্তি আমাদের স্পর্শ করত একটা আলাদা বুদ্ধিতে আলোকবর্তী আমাদের হৃদয়কে। আমার ধারণা রাজনৈতিক সচেতনতার এঁর অভিনয় এতদূরে স্পর্শ করেছে, মুগ্ধ করেছে, আমি খুব খুশি কিছুদিন আগেও এঁর আবৃত্তি শুনেছি। রবীন্দ্রসদনে উনি যে ধরনের আবৃত্তি করেন তার থেকে সহজ 'বেলতলার ছাদে'। কিন্তু কি সুন্দর আবৃত্তি করলেন! এখনও সুন্দর কণ্ঠ, এখনও সেই সুন্দর উচ্চারণ, এখনও সেই সুন্দর ভঙ্গি—আজকে ষষ্ঠি পেয়েছেন পরেও এঁর আমরা এই গুণ দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। আমি এঁর দীর্ঘ জীবন কামনা করি এবং আমি আশা করি, আমার সাধারণ শিল্পরসিক তাঁর কাছ থেকে আরও কিছু পাবে। আজকে আমি জগদ্দলের মনে এক হয়ে এঁকে অভিনন্দন জানাই, দীর্ঘায়ু কামনা করি এবং আশা করি তাঁর এই প্রতিভা আরও বেশি বিকশিত হবে, আমরা আরও কিছু পাব।"

সংবর্ধনার উত্তরে শিল্পী গৌতমির চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, "অভিনয় কথা বলতে কি এমন ধরনের চর্চা অনুষ্ঠানে এলে তবু অভিনয়ই শেষ করি না, একটি বিষয়ও শেষ করি। [illegible] আমি যে বিষয়ে মনের কাছে এই একটা সহজে মেরেই যাই। সেই অনুভূতি শেষ হতে চায় না। এর মধ্যে আবৃত্তি, অভিনয়কালে আমি উপযুক্ত ছিলাম। আমি এই শেষ দিলাম। তবুও এই শহরে আমি প্রায় পঞ্চাশ বছর বাস করছি। আমি এই শহরের মেয়ে নই, আমি এসেছি পাইকে থেকে মানুষ হয়েছি, তখন এর কলকাতা-সম্পর্কে দুই ইতিহাস আছে। প্রথমতঃ আমার জন্মস্থান শহর থেকে আমি এসেছি। কিন্তু পঞ্চাশটি বছর কেটে গেছে আমার এই শহরে। এই শহরে যখন এসে পৌঁছেছিলাম তখন আমি সত্যেন্দ্রনাথেরই অনুভব করেছিলাম এই শহরকে বিপুল এবং খুব বিস্তৃত হিসাবে। এই শহর রবীন্দ্রনাথের শহর, বিবেকানন্দের শহর, সুভাষচন্দ্রের শহর এবং আরও যত যত জ্ঞানী-গুণী-মনীষীদের শহর। সেই শহরের একটা ভাবধারা থাকে, একটা সাংস্কৃতিক অবহাওয়া, রাজনৈতিক অবহাওয়া, চেতনার একটা অবহাওয়া থাকে। সেই অবহাওয়ার শরিক হয়েছিলাম আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে। সেই শহরের নাগরিকদের যে চলন সত্ত্বে গৌতমিরা তাঁর কাছ থেকে সংবর্ধনা পেয়ে নিশ্চয়ই অভিভূত বোধ করছি। কিন্তু মনে হচ্ছে, আমি এমন কিছু করিনি যার জন্য এইসব সম্মান আমার পাওনা হয়েছে। প্রধান কারণ যে পেশায় আমি এসে গৌতমিরাম এই শহরে আসার পর, প্রথমে অভিনয় শিল্পে সেটা প্রথমতঃ বা প্রথমতঃ আমার প্রবাসদের ভাষা নিয়ে সেই ভালবাসাটা এসেছিল। যেখানে পঞ্চাশ বছর আগে কলকাতায় এসে গৌতমিরামের পরে কলকাতার থিয়েটার দেখবার অবসর হয়নি। এবং আজকে অনিমা গৌতমিরা যে, শিশিরকুমারের অনুভূতির মতো এইরকম একজন অভিনেত্রী এবং নাট্য নির্দেশকের থিয়েটারই আমি কলকাতায় প্রথম দেখি। তাঁর পঞ্চাশটীকালে এই পেশায় তিনি

শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
মহোদয়ের উদ্দেশে
কলিকাতা পৌরসংস্থার বিনম্র অভিনন্দন

দীর্ঘ চার দশক ধরে নব নব সৃষ্টির মাঝে আপনার অভিনয় প্রতিভা ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে। আপনি অসংখ্য দর্শকহৃদয় স্পর্শ করেছেন। চমৎ করেছেন। বিস্ময়রেখা। চলচ্চিত্রের মহত্তর মানের কালজয়ী সৃষ্টিতে ও আপনার উজ্জ্বল উপস্থিতি। আমরা বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। 'বাক্সবন্দি নক্সত্রমালা' থেকে বলিউডের মলিকেয়ায় স্থান পাওয়া আপনার অজস্র কবিতা, বাংলা প্রেমমূলক অভিনয়, নাটকপাঠনা, নির্দেশনা এবং স্বপ্নজগতে আবৃত্তি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই আপনি অমলা।

সংস্কীর্ণতার আবর্তে ঘেরা আজকের সমাজে আপনার মানবিকতা, শ্রুতিবোধ চেতনা, জীবনমুখীনতা আপনাকে যথার্থ শিল্পীর মর্যাদা প্রদান করেছে। কলকাতা মহানগরীর কস্মোপলিটন রাজপথে জনকল্যাণ ও গণআন্দোলনে আপনি পা মিলিয়েছেন মানুষের মিছিলে। নিজ মত ও পথে অপসহীন আপনি, তাই হয়ে পুরস্কার আপনার নাগাল পায় না। আবার সেই কারণেই শিল্পজগত ও শিল্পরসিকদের সঙ্গে আপনার দূরত্ব নক্ষত্রের নয় বরং সান্নিধ্য মহত্ত্ব নম্রতাপূর্ণ ও সহমর্মীর।

আজকের সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতার এক অনাত্মীয় সাংস্কৃতিক দূত আপনি। কলকাতার নাগরিক ও পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন ও সশ্রদ্ধ সংবর্ধনা।

আপনার দীর্ঘ সৃষ্টিশীল জীবন কামনা করি।

টাউন হল
২৮ শ্রাবণ ১৪০৭

প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়
মহানাগরিক

আমার সঙ্গেই ঈশ্বর প্রেমিকের প্রিন্সিপ [illegible] ঈশ্বরচন্দ্র মহাবিদ্যা [illegible]—আমাদের বন্ধু। তাঁর ছবিটেই আমি প্রথম এডিনবরা করা এক কাপড়ছিলাম। আর মিলিয়ে আমার পাশে

রঙ্গালয়ে এবং চলচ্চিত্রে হাত [illegible] হয়ে দিয়েছেন। সেই [illegible] থেকে আজ আপনাদের [illegible] একটি আমাদের গর্বিত হবার মতো। এই [illegible] এই রঙ্গালয় ও চলচ্চিত্র [illegible] বলা করেছেন। বিশেষ করে [illegible] হিসেবে আমার চেয়ে অনেক [illegible] এই রঙ্গালয়ে এবং চলচ্চিত্রে [illegible] এক অঙ্গেই দেখেছি। [illegible] সংবর্ধনা দেবার রীতি হয়তো এখন ছিল না, সেই জন্য তাঁর সংবর্ধিত হননি। কিন্তু আজ যখন পৌরসভা তথা কলকাতার নাগরিকবৃন্দ আমাকে সম্মানিত করছেন, আমি বিনয়ে তাঁদের হয়ে এই সম্মান গ্রহণ করলাম।

আর একটা কথা বলা শেষ হয় আমার, আমি মানুষ, ভেবে শিল্পী যে একজন নয়, সে একটা সময়ের ফসল। তা নইলে তাঁর [illegible] নিয়ে [illegible] কোন কাহিনি লক্ষ্য [illegible] আমি তাঁর সঙ্গে [illegible] এডিয়ে যেতে পারতাম। সেইজন্য আমি আপনাদের কাছে গর্বিত ও [illegible] আমার সঙ্গে [illegible] আমি [illegible] আমার সময়েরই ফসল। সেই সময়—যে সময়ে আমি ছাত্র ছিলাম, কলকাতায় প্রথম পড়তে এসে যে সময়ে কলকাতার রাজপথে আমি ছাত্র রাজনীতি করেছি, মানুষের সঙ্গে মিশেছি, মিছিলে মাঁটিয়েছি সেই সময়ে যেন ঘটেই সেই সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সাহিত্য আন্দোলন, যখন নতুন কবি লিখছে, আন্দোলন [illegible] কিছু বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এঁরা যখন কালোপাহাড়কে নতুন পথ নির্দেশ দিচ্ছেন, যখন চারদিকে নতুন আন্দোলন তৈরি হয়ে দিয়েছে, পালটা আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে নবনাট্য সব কিছুর মধ্যে দিয়ে এবং আমাদের [illegible] যখন চলচ্চিত্রে [illegible] পথচলা শিখছেন তখনকার [illegible]—সেইটাই আমার তৈরি [illegible] করেছে। আমি সেই সময়েরই ফসল। হয়তো সেই কারণেই আমার একটা বিশেষ [illegible], এমন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আমার কাজের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। সেইজন্যই আপনারা আমাকে ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন। আমার কাছে এই ভালবাসাটাই সবচেয়ে বড় পুরস্কার। আর কিছু আমি প্রত্যাশা করি না।

চল্লিশ বছরের ওপর কাজকর্ম আমাকে [illegible] করেছে, আমাকে সমৃদ্ধ করেছে, আমাকে আরও [illegible] তাঁদের সামনে [illegible] হয়ে আসতে দিয়ে—এইটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। মানুষের দেওয়া এই পুরস্কার আমার তুলে নিয়ে, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে, পৌরসভাকে বিশেষভাবে এই সংবর্ধনার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।" অনুষ্ঠানের শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পৌরসভার চেয়ারম্যান সুপ্রিয় সেনগুপ্ত।

পরিবেশগত দিক থেকে কলকাতা

ভারতের সবচেয়ে নিরাপদ বাসযোগ্য মহানগরী

এই শহরকে দূষণমুক্ত করতে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট

এই কাজে চাই নাগরিকদের সচেতন প্রয়াস ও আন্তরিক সহযোগিতা

কলিকাতা পৌরসংস্থা

সবুজায়নে সৌন্দর্য, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান

তুলসী বসাক

আজ সর্বজন স্বীকৃত কথা যে, প্রচুর পরিমাণ আর্থিক বিনিয়োগ ছাড়াই বৃক্ষরোপণ আমাদের জীবনে এক অপরিসীম ও অনন্য উন্নয়নমূলী ভূমিকা পালন করতে পারে। সরকারি স্তর ছাড়াও তাই বহু বাণিজ্যিক সংস্থা গড়ে উঠেছে ইদানীংকালে। এরা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লাভজনক বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি গ্রহণ করে কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করছে। শেয়ার বাজারে এই উদ্দেশ্যে প্রচুর শেয়ারও বিক্রি করছে।

স্বভাবতই সুনিশ্চিতভাবেই আজ এ কথা বলা যায় যে, বৃক্ষরোপণ শুধুমাত্র পরিবেশ দূষণ রোধেই নয়, বরং দেশের সার্বিক উন্নয়নে এক অপরিমীম সোনার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ বিনিয়োগ দ্বারা, যার শৌনঃপুনিক কোনও ব্যয়ের দায় নেই, অথচ যে বিনিয়োগ দ্বারা দশ-বিশ বছরের মধ্যেই প্রতিটি গাছই ২০-৩০-৫০ হাজার টাকার ফসল উৎপাদনক্ষম হয়ে উঠতে পারে।

বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন সৃষ্টি ও পরিবেশ দূষণ মুক্তির উদ্দেশ্যে ভারতের বেশ অনেক দশক থেকেই ব্যাপক সরকারি প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। যদিও এখনও প্রায় সম্পূর্ণভাবেই এই প্রচেষ্টা সরকারি স্তরেই সীমাবদ্ধ। তবুও গ্রাম-শহরে প্রচারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত উদ্যোগের দৃষ্টান্তও যথেষ্ট দেখা যায়। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক স্তরেও বৃক্ষরোপণে যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে বিশেষভাবে।

বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে, সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে, তার মূল উদ্দেশ্যই মূল মুনাফা সৃষ্টি। তাই এই সব সংস্থাগুলি তাদের পরিকাঠামো গড়ে তোলে পরিকল্পনামাফিক মুনাফা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু সরকারি উদ্যোগের যেহেতু সেই ধরণ মুনাফা সৃষ্টির কোনও দায় নেই, তাই বাণিজ্যিক ভিত্তিতে সুপরিকল্পিত কোনও পরিকাঠামো গড়ে তোলার মতো কোনও পরিকল্পনাও নেই। ফলে বনসৃজনের দ্বারা কেবল সবুজায়নের সৃষ্টির মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ রোধই সরকারি উদ্দেশ্য থাকে আর তার দ্বারা সৃষ্টি আকর্ষণ ও কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। অনাদিকে বন সংরক্ষণ তবে ব্যাঘ্র প্রকল্প, সিংহ প্রকল্প, গণ্ডার প্রকল্প, হাতির এমনকি পরীক্ষাগার সৃষ্টিতেও সরকারি উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, প্রকৃতিতে অনাদিকাল থেকে যে বনসৃজন হয়েছে সেই সব গভীর অরণ্যেও যেন বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। বিশেষ বিশেষ

এলাকার বিশেষ বিশেষ বাসের বৃক্ষের সমন্বয়ে সেই সেই এলাকাকে এক নির্দিষ্ট সৌন্দর্যের পরিমণ্ডলে গড়ে তুলেছে। মানুষের হস্তক্ষেপ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সৌন্দর্যে ব্যাঘাত ঘটেছে। আর বর্তমানে সেই লোভী হাতটি এরইমধ্যে অধিকাংশের মধ্যে থাকা করে ফেলেছে যে, সেই সব জায়গায় যে সব গাছ লাগানো হচ্ছে বিশেষি প্রয়োজনের তা শুধু সেই সব এলাকার পরিবেশকেই যে বেমানানই শুধু নয়, বরং সেই এলাকার পরিবেশেরও ক্ষতি করছে।

কোনও বনে আম, জামরুল, কাঁঠাল, এলাচ কোনও বনে দেবদারু, দেবদারি, চন্দন গাছ প্রভৃতি প্রকৃতির নিজস্ব চিরাচরিত ধারা যে খাদ্য ও বেঁচে নিঃশেষ করে সেখানে ইউক্যালিপটাস জাতীয় গাছ লাগানো হচ্ছে বনসৃজনের নামে, আমার এসব গাছই লাগানো হচ্ছে রাজনৈতিক স্বার্থসাধী সংগঠনগুলির স্বার্থের প্রয়োজনায়। অথচ এই সব গাছে পাখির কাকায় উপযোগী কোনও ফুল বা ফল ফলে না। এমনকি এই গাছের ডালপালাতেও পাখি বাসা বাঁধতে পারে না। এই গাছের নীচে কোনও তৃণজাতীয় লতা বা ঘাস পর্যন্ত জন্মাতে পারে না। ফলে ক্রমে, প্রজাতি জাতীয় কোনও পতঙ্গের জন্মাতে পারে না। এই গাছ মাটি থেকে এত জল টেনে নেয় যে, গাছ স্থানের নিম্ন নিম্ন এলাকাকে টিক মরুভূমিতে পর্যন্ত পরিণত করেছে।

আমার নিম্ন বিদেশি গাছ হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের প্রকৃতির ভারসাম্য পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। ফলে ঘুচেছে অসংখ্য প্রজাতির পাখি, প্রকৃতির সৌন্দর্যেও তা এক অপূর্ব সৃষ্টি। অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই সব বিদেশি বৃক্ষ যে আমাদের দেশের পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর তা সরকারি কর্তৃপক্ষেরা অনুধাবন করতে পারছেন না। তাই সমুদ্রায়নের নামে অঞ্চলে কেবল যেমন বৃক্ষরোপণ করে তাদের কর্তব্য সমাধান করছে।

আজকের দিনে কোনও দেশেই কোনও বিশেষ পরিকল্পনাকে বিশেষ একটি মাত্র উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয় না। বহু উদ্দেশ্য সাধক পরিকল্পনা গ্রহণই গ্রহণ করা হয়। সমুদ্রায়ন সৃষ্টিতেও তেমনি বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। দেখা যাক কি কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বৃক্ষরোপণকের বহুমুখী উদ্দেশ্য সাধক পরিকল্পনা ছকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রথম : পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ সংরক্ষণ করতে প্রথমেই জলবায়ুমণ্ডল ও মাটির যৌগ থেকে নির্গত মানুষ ও জীব জগতের পক্ষে ক্ষতিকর বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাসীয় পদার্থ নিয়ন্ত্রিত করে মানুষকে নিরাপদ্ধীকরণ ও সেই সঙ্গে বৃষ্টিপাতে সহায়তা করা একমাত্র উদ্দেশ্য হতে পারে না। পরিবেশ বলতে জীব জগতের সংরক্ষণও অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সরকারি উদ্যোগে গড়ে তোলা হচ্ছে, শিল্প প্রকল্প, পর্যটন প্রকল্প, চড়ুইভাতি এমনকি পক্ষীনিবাস ও বুলবুলি প্রকল্পও গড়ে তোলা হচ্ছে। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কথা জলবায়ুর জন্য নির্দিষ্ট বনাঞ্চলকে অবশ্যই সংরক্ষিত রাখতে হবে। কিন্তু পক্ষী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বলা যায় যে নির্দিষ্ট বনাঞ্চল ছাড়াও সারা দেশকেই পক্ষীনিবাসে পরিণত করা যেতে পারে।

আধুনিক কালে বন কেটে নিধনযজ্ঞ ও নগরায়নের ফলে অধিকাংশ বৃক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়েছে। পক্ষী বিশারদ সেলিম আলি দেখিয়েছেন যে বিগত ৪০ বছরের মধ্যে কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে বহু উপনগরী গড়ে ওঠার ফলে প্রায় পঞ্চাশটি প্রজাতির পাখি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অন্যদিকেও প্রায় বিলুপ্তির পথে। আধুনিক কলকাতার শিশুরা জানে, চড়াই ছাড়া আর প্রায় কোন পাখীই চেনে না কাছে থেকে দেখতে না পারার জন্য। বৃদ্ধ আকাশে চিল, শকুন উড়তে দেখলেও চেনা সম্ভব নয়। শালিক, বুলবুলি, টিয়া, ময়না, শেঁয়া, বাদুড়, চামচিকে শুধু ছবি দেখেই তারা চেনে। অথচ পাখী প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি, ফুলের মতই সুন্দর, যেমন পাখীর কুজন প্রকৃতিতে যে অপূর্ব সঙ্গীত মূর্ছনা তুলিয়ে দেয় তার প্রভাব মানুষের মনকে এক অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে সাইকিনের কর্মক্ষমতাকে অনেকগুণই বাড়িয়ে দেয়।

এমনি অবস্থায় সরকারী স্তরে পক্ষী সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন ফল ও ফুল বিশেষভাবে বৃক্ষরোপণ। পাখীর খাদ্য ফল ও ফুল। যত বেশি ফুল ও ফলের গাছ লাগান যাবে ততই পাখীরা আকৃষ্ট হবে সেই সব গাছে বাসা বাঁধতে এবং তাতেই বিভিন্ন প্রজাতির পাখীর বংশ বৃদ্ধি ঘটবে। এটি হলে পক্ষীবিলাস সৃষ্টি করে বিদেশি পক্ষিপ্রেমী পাখীর আকর্ষণ বৃদ্ধি করে আয়বর্ধনে উদ্যোগ সৃষ্টি করা যেতেও সাথে সাথে বিভিন্ন প্রান্তের অসংখ্য প্রজাতির পাখির বিলুপ্তি রোধ করা যাবে না। অবশ্য তাদের সংখ্যা বৃদ্ধিও হবে না। যার জন্য প্রয়োজন সারা দেশে পরিকল্পিতভাবে ফুল ও ফলের গাছের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা। এর ফলে একদিকে যেমন সমুদ্রায়নের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে অন্যদিকে প্রকৃতির মোহ সুন্দর এলাকা পক্ষীকুলের সৃষ্টির সহায়তা করা হবে।

আমার ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয়, মৌমাছি, প্রজাতি জাতীয় পরাগ সংযোগকারী পতঙ্গ। মৌমাছি মৌচাক বৃদ্ধি করে মধুর যোগান বৃদ্ধি করতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। এক ঢিলে দুই কাজ হবে।

দ্বিতীয় : সৌন্দর্য সৃষ্টি

জীব জগতের সৌন্দর্য প্রকৃতির অকৃপণ দান। সৌন্দর্য মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি উদ্ভাবনী শক্তি। প্রকৃতি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে সে তার পরিবেশকে শ্রীমণ্ডিত করে তোলে। আনন্দ পায় নিজে, আনন্দ পরিবেশন করে অন্য সকলের জন্য। বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে তেমনি মানুষ পরিকল্পিত সৌন্দর্যের ছোঁয়ায় পরিবেশকে আনন্দময় করে তুলতে পারে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ফুলের বাগান থেকে। এখানে ফুল ও ফলের গাছকে বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে গোছিয়ে মনোরম করে আকর্ষণীয় করে তোলে বাগানকে। তাতে বিশেষ ভাব ভঙ্গি ও মুদ্রাকে

শিল্পী-মনের বিকাশ ঘটায় তাদেরকে সেই একটি ফুল ও ফল গাছের পরিবেশনার বিভিন্নতায় ভরা দিয়ে।

ঠিক তেমনি শিল্পীমন নিয়ে গড়ে তোলা যায় উদ্যান নগরী। গড়ে তোলা যায় শৌখিনদের সুসজ্জায় সুরভিত বৃক্ষ রোপণের স্বপ্নময় অনুষ্ঠান।

শহরে বা নগরে চলমান আলোক স্তম্ভ অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় এক বস্তু। যেখানে যেমন খুশী জলজ গাছ লাগানো যায়নিকভাবে আলোক স্তম্ভের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। আমার শহরের পয়ঃপ্রণালী, বিদ্যুতের তার, টেলিফোনের তার যেগুলি জমীর নীচ দিয়ে নেওয়া হয়, তাদের শিকড় সেই সকল কিছুর ক্ষতি করতে পারে। তাই শহরে বৃক্ষরোপণে একদিকে কারিগরী দক্ষতা, অন্যদিকে শৌখিন মনের প্রয়োজন। যে সব গাছের শিকড় খুবই প্রসারী, সেই সব গাছ শহরে রোপণ না করে অন্য কুল নিরালা গাছ লাগানোই উচিত। আসল এক এক রাস্তায় এক এক ধরণের বৃক্ষ রোপণ এবং সেই সঙ্গে কোন রাস্তায় সেই গাছকে ঘেঁষে শহুর আকৃতি, কোন গাছকে ঘনের আকৃতি ও প্রকৃতিতে ধরে তুলতে পারলে সত্যি করে সৌন্দর্য সৃষ্টির খৈচিত্র্য ঘটানো যাবে তেমনি আলোক রশ্মিগুলি গাছের বিভিন্নরূপে যাতে প্রাপ্ত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা যাবে। অন্যান্য বিভিন্ন রাস্তায় এপাশ ওপাশ ছেয়ে থাকা ফুলের রং ছেয়ে থাকা লাগানো যায় আরো ফুল ফোটার সময় এক অপূর্ব সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে শহরকে উদ্যান নগরী রূপে বিকশিত করবে। এক রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায় শহরেই সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিবেশ মনের উপর এক অনাবিলীয় আনন্দের প্রভাব ফেলবে।

তৃতীয়-অর্থনীতি :

পরিকল্পিত বৃক্ষ রোপণ প্রতীন তথা আমাদের অর্থনীতিতে এক বিরাট উন্নয়ন ঘটিয়ে দিতে পারে। এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (১) প্রতীন ফেরার সমস্যার সমাধান; (২) ফুল ও ফলের উৎপাদন-এ প্রত্যাশা বৃদ্ধি; (৩) কাঠ শিল্প ভিত্তিক কারখানা নির্মাণের বিকাশ; (৪) কাঠ আমদানি কমিয়ে ফেলিনিয়ো কাঠের কমানো; (৫) ঔষধি শিল্পের বিকাশ।

কেন বৃক্ষ পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের এই সব বিষয়গুলির উদ্দেশ্য সাধনে কি ভাবে সহায় হতে পারে।

১। প্রতীন ফেরার সমস্যার সমাধান : আমাদের মত উপমহাদেশের হাজার হাজার মাইল জাতীয় সড়ক পথ ও রেল লাইন আমাদের শত শত গ্রামের ভিতর দিয়ে গায়ে গেঁষে ছড়িয়ে আছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের ফুল ও ফলের এবং বিভিন্ন ধরনের বনী আসবাব শিল্পের উপযোগী, যেমন শাল, সেগুন, মেহগনি ইত্যাদি কাঠের উৎপাদনের পরিবেশ রয়েছে। সরকারি উদ্যোগে এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করে এলাকা ভিত্তিক উপযোগী গাছ রোপণের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর প্রতীন বৃক্ষরাজির সেই সমস্ত ফুলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়ে, সেই সময় বৃক্ষের ফুল, ফল, কাঠ ব্যবসারী ভিত্তিতে বিক্রী করার অধিকার দিলে প্রতীন ফেরার ফুলফলের যোগানকে অনেকটাই লাঘব করা যাবে। প্রত্যেক জেলে এলাকা ভিত্তিক সমবায় সংগঠন গড়ে তুলে সেই সমবায়ের উপর দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে। এই সব বৃক্ষ প্রতিপালন, পরিচর্যা ও সংরক্ষণ এবং নতুন করে বৃক্ষ রোপণে আর্থিক সহায়তা এবং সেই সঙ্গে বিজ্ঞান ভিত্তিক বৃক্ষের পরিচর্যা ইত্যাদির কারিগরী সহযোগিতা দিয়ে উৎসাহিত করলে অর্থকরী ফসল হিসাবে বৃক্ষ রোপণ জাতীর জীবনে একদিকে বেকার সমস্যা সমাধানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করবে অন্যদিকে ছায়াতরু ও গন্ধতরু বাগিচা বৃক্ষরাজি সম্পদ হিসেবে ভূমি অর্জনে এক নতুন ভূমিকা গ্রহণ করবে। অন্যদিকে বনির গ্রামবাসী পুষ্টি ও খাদ্য হিসাবে নিজ ফল খাওয়ার সুযোগ পাবে।

২। রপ্তানি বাণিজ্য : অনেকটা ফুল ও ফলের চাহিদা সারাবছর প্রচুর। গরম দেশগুলি ফুল ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহজে বৈদেশিক বাণিজ্যে নতুন মাত্রা যোগ হবে। অন্যদিকে দেশের সবচে কাছে চাঁদের গ্রহের দিয়েরা বাহের ফলাফ পড়ে থাকা ফল কুড়িয়ে খেয়ে অপুষ্টিজনিত রোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

৩। আসবাব শিল্প ও কাঠের শিল্প : এই উভয় শিল্পের জন্য বহু বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়। এই সমস্ত শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী দেশজাতী বৃক্ষ রোপণ করলে সহজে বৈদেশিক মুদ্রার অনেক সাশ্রয় হবে।

৪। ঔষধি শিল্প : এলাকা ভিত্তিক প্রচুর বৃক্ষ সৃষ্টি হওয়ায় ফলে ঔষধি শিল্পের বিকাশ ঘটবে এবং বহু ঔষধের জন্য বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পাবে এবং অনেক ঔষধ রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

গরম রাস্তার বনাঞ্চল উপমহাদেশের প্রায় ১৮ শতাংশ। আমাদের প্রায় ৫২ হাজার কিঃ মিঃ রেলপথ এবং পৃথিবীর এই বৃহত্তম রেলপথের অধিকারী। এটাকে কথার কথা বলা আছে ২০ লক্ষ কিঃ মিঃ রাস্তাপথ। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা এই বিরাটাল রেল ও রাজপথের উভয় পার্শ্বে ১০০ মিঃ করে যদি বৃক্ষ রোপণ করা যায় তাহলে তাতেও প্রায় ৫ শতাংশ বন সৃজন সম্ভব হবে। এর ফলে আমাদের জনপুষ্টিক প্রাণে বনাঞ্চলের অভাব প্রায় সম্পূর্ণটাই পূরণ হতে পারে। অবশ্যই এ সবই নির্ভর করে পরিকল্পনা তৈরিক সরকার ও সরকারি কর্মীদের বনসৃজনের প্রতি আন্তরিকতার উপর।

মোটামুটি উপর আলোচনা দিনে এই প্রস্তাবিত কাজ যে বিনা পরিশ্রমে ও প্রায় বিনা অর্থ ব্যয়ে বৃক্ষ রোপণ এক অপূর্ব সম্ভাবনাময় ও অর্থকরী ফসল একদিকে, অন্যদিকে পরিবেশ দূষণ রোধের এ কার্বন-হ্রাসের এক সহজ পন্থা। সেজন্যই বন সৃজন নয়, উদ্যান সৃষ্টির মানসিকতা পূর্ণ সুচিন্তিপন্থার অনুরোধের উপর এই বৃক্ষ রোপণ পরিকল্পনা তৈরী করায় গবিষ্ঠ মাত্র করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

কলকাতার পার্শী প্রতিবেশী

শীর্ষকর্তি রায়

ইংরেজের বাণিজ্যে সাইলাভের সূচনা প্রত্যেকে হলেও পরিণামে এই অনাহূতরা নগরীর ভূষণ। তাদের ব্যবসায় লাভ করে এ জনসমূহকেই ঘটে তুলছিল এক হিসেবসম্পন্ন নগরীকপে, তবে প্রশিক্ষণ ও শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে ছিলেন। এ সূত্র ধরে ইতিহাসের আধুনিক পর্বে বিশ্বের নানা জাতির আগমন ঘটেছিল এ মহানগরীতে বাণিজ্যিক কারণে। তাদের পূর্বে, বহু পূর্বে, বিদেশের ধন, সম্ভ্রম ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষাকল্পে সুদূরতর ইংলিশিত্ব বিশ্ব মানবগোষ্ঠী ভারতবর্ষে আগত প্রথম অংশেছিলেন। এরা এক গোষ্ঠী ছিল ইসলামিত জরথুস্ট্রবাদী পার্শী সম্প্রদায়। তারা পরবর্তে 'পারস্য' প্রদেশ থেকে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। এ জায়গায় তারা পার্শী নামে আখ্যায়। তাদের আগমন ঘটেছিল ৭৩৩ খ্রিস্টাব্দের কিছু পরে।

তাদের বিষয়ে তাদের কলকাতায় আগমনের ইতিহাস খুবই সম্প্রতিক ঘটনা। কারণ এ ঘটেছিল ইংরেজ বাণিজ্য শুরু হওয়ার দ্বিতীয়ভোগ পরে। কিন্তু ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে তারা এসে কলকে অনে দুসেছিল বেশ কয়েক পূর্বে। ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে অবশ্য তাদের বহু পূর্বে, প্রতিম পর্বে, ভারতবর্ষের সঙ্গে শাসন সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক যোগসূত্রের রচিত ঘটেছিল ব্যবসাবাণিজ্যের উপর তাদের আক্রমণাত্মক লড়াকুমনী অভিযানের মাধ্যমে।

পার্শী সম্প্রদায়ের ভারতবর্ষে তথা কলকাতায় আগমন ও প্রতিষ্ঠা লাভের বিষয়ে সাম্প্রতিককালে পূর্বে পারসিকদীপুরের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সম্পর্কের আলিপর্বে বিস্তৃতি আলোচনা করা যেতে পারে। খ্রিষ্টীয় জন্মের পূর্বে আক্রমণকারী পারসা সম্রাটের সাম্রাজ্য বিস্তারের মধ্য দিয়ে ইরান পশ্চিম ভারতের মাটিতে সর্বপ্রথম প্রবেশ ঘটেছিল এ সম্পর্কে। প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারত, মনোনা পুরাণ এবং কালিদাসের রঘুবংশ কাব্যে পারসিকদের (পারা-পারসা, সিন্ধুরাজ-মকরন) উল্লেখ পাওয়া যায়। সিন্ধুর ভারতীয় ও সাহিত্য নিদর্শনেরও ইতিমধ্যে পারস্য দেশের ভাষাতত্ত্বীয় ধারা প্রবেশ ভারতীয় মূল স্রোতধারার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। এ কারণেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন পারস্য বুলবুল পাঠান মোগল/এক ক্ষেত্রে ঠাঁই নিল। রবিয়া পুরাণ গ্রন্থে নাম একটি দেশীয় উল্লেখ রয়েছে। তাদের আদর-আহ্বান জরথুস্ট্রবাদী পুরোহিতদের মতো। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তারা পূর্বের উপাসক, উপবীত ধারণকারী ও দুধ্রদের শপথগ্রহণের অপরিহ্য প্রবর্তক বিশ্বাসী। ভারতবর্ষে নূর উপাসনার প্রবর্তক হিসেবেও এ গোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে থাকেন অনেক পণ্ডিত। ইরানদেশের দুঃখ পার্শী উদ্বাস্তুদের আগমনের বহু পূর্বেই তারা ব্যবসা করে লীন হয়ে গিয়েছিল ভারতের অন্তরে পার্শী ভাষায় হয়ে পরিচিত হয়ে আসছেন। ৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আরবের শাসনা আক্রমণের ভারতে এসেছে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে। তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য জরথুস্ট্রবাদী পার্শীদের অনেকে ৯-বর্ষ বন্ধা হেতু ভারতবর্ষের দিকে সাগর পাড়ি দিয়ে জন্মভূ আসেন। তাদের এ যাত্রার বিশদ বিবরণ জানা আছে পার্শী পুরোহিত হেদুমন আইতোমন সঙ্কলন করেছিল ১৬৬৯ খ্রিষ্টাব্দে রচিত কিসসা-ই-সঞ্জন' নামে একখানি গ্রন্থে। আলোচ্য এ গ্রন্থে বর্ণিত তারিখগুলির সাথে ঐতিহাসিক সত্যের নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবুও মোটামুটি এ গ্রন্থে পার্সিদের বিষয়ে সমুহ বিষয়টির নানা সূত্রের সন্ধান মেলে। এর বিবরণ অনুযায়ী জরথুস্ট্রবাদী পার্শী সম্প্রদায়ের একটি দল আরবের মুসলমান আক্রমণকারীদের হাত থেকে তাদের ধর্ম বিশ্বাস রক্ষাকল্পে তারা হয়েছিলেন দেশান্তরে আশ্রয় গ্রহণকারী শরিয়তাব করতে। তারা প্রথম দিকে উপস্থিত হয়েছিলেন কুলাই খোরাসানের পার্বত্য অঞ্চলে। সাময়িক অবস্থানের পরবর্তে এরা পার্সনা উপকূলীয় অঞ্চল হরমুজ প্রবেশে চলে এসেন। এখানে আরও পনের বছর অবস্থানের পর তারা ভারতের সন্ধানে ছুটে আসে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে উপস্থিত পশ্চিম উপকূলে গুজরাটের দিউতে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে আরও উনিশ বছর অবস্থানের পর এখানকার হিন্দু রাজা যাদব রানা তাদেরকে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে স্থানীয়ভাবে সন্তুষ্ট আশ্রয় দিতে সম্মত হলেন:

(১) গোটির সর্বোচ্চ পদাধিকারী পুরোহিতকে রাজার নিকট তাদের ধর্মের ব্যাখ্যা করে বুঝাতে হবে;

(২) তাদের বিবাহ হলে বর্ষন করে রাজাটীয় ভাষা গ্রহণ করতে হবে;

(৩) তাদের স্ত্রীলোকদের স্থানীয় রাজাটীয় অটিলের পরিচ্ছদ গ্রহণ করতে হবে;

(৪) তাদের পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে আনা অস্ত্র ত্যাগ ও সমর্পণ করতে হবে;

(৫) বিবাহের শোভাযাত্রা রাত্রে কোনমতে বাদ্যের অনুষ্ঠানটি বের করতে পারবে।

এরপর পার্সীরা গ্রহণের পুরোহিত হোরোমজি ঘোষণা সংস্কৃত ছোবের মাধ্যমে রাজার নিকট ব্যাখ্যা করে পুরন করলেন। রাজি শর্তগুলিও পুরন করে তারা দুধপরায় ধরা দিয়ে সাধনিকেতে ভারতবর্ষে স্থায়ী হয়ে করে জীবন যাপনের পথ বেছে নিলেন। সেই

থেকে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর অভিব্যক্তির ধারে প্রায় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়। গ্রন্থকারটির বিশ্বাসে অবতারবাদের মূল তাত্ত্বিক ভিত্তি পরম্পরা বিরোধী ধারণার বাস্তবের মেটামুটি ১৫০ খ্রিস্টাব্দে এর প্রবেশ ঘটেছিল বলে ধরা হয়। ভিদেভ-ই-দাদ্‌ গ্রন্থে বর্ণিত জরথুস্ট্রবাণী পার্শীদের উপর পরবর্তী মুসলমানদের ধর্মপরিবেশগুলির অত্যাচারের ফলেও অনেক পার্শী পণ্ডিতের বিশ্বাস প্রায় নয়। এ ধরনের কি কে অভিযোগ পালগ্রব আলে আপনা নিজে নির্দেশ করেছেন যে আর্যী ভাষায় (অভিধা অর্থ) রচিত জরথুস্ট্রবাণীদের উপরই হোলান ঘটনা, তা ইহুদী এবং খ্রিষ্টিয়ানদীদের উপরও লাগু করা হয়েছিল। এ ছাড়া এদের উপর অন্য কোনরূপ অত্যাচার করা হয়নি। এ নিয়ে পার্শী সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের মধ্যে এক সময় নানা তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৪৬৯ অথবা ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে আলয় খান-এর নেতৃত্বে এক সাম্প্রদায়িক সাহিত্যী সঙ্গঠন অত্যাচার করলে পার্শীরা হিন্দুরাজার শরণ নিয়ে মুসলমান বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। অত্যাচার হিন্দু মুসলমানের সঙ্গে তাদের অনেকেরও যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটেছিল। অবশিষ্টরা গুজরাটের অন্যত্র গিয়ে নিজেদের নূতন বসতি গড়ে তোলেন। এই সময়ই তারা তাদের পবিত্র 'আর্যী' ভাষা ত্যাগ করে গ্রহণ করেন গুজরাটী ভাষা। পরবর্তীকালে নৌশেরওয়ানি প্রতিষ্ঠা করেন ১৪১৯ খ্রিস্টাব্দে। পহ্লবি-এ অর্থাৎ পার্থীয় ভাষা থেকে "ইরান শাহ্‌" বা নৌশেরওয়ানি রচিত হিল ১৭৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। বিষয়টি নিয়ে তাদের নিজেদের মধ্যে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হলেও অবশেষে এই পহ্লবি আর্যী ভাষাটিকে প্রতিষ্ঠা করা হল উদ্‌যাদা (UDYADA) নামক স্থানে। এ স্থানটি পুরুশস্পির আর্য ভাষাভাষের জন্য আজও তাদেরকে পার্শীদের নিজস্ব মুসলমানদের হস্তক্ষেপ থেকে পবিত্র রেখেছে পূর্ণ।

সম্রাট আকবর ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট অধিকার করলে বাদশাহের পার্শী অধিবাসীদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই সময়ের একজন পার্শী সন্ন্যাসী বাদশাহ মোগলবীর জালাল সাহেব ওরফের ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করে তাঁকেই আকৃষ্ট করেন। পরে

ফতেপুরসিক্রিতে আসুত ধর্মসভায় বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের যে সম্মেলন বসত তাতেও পার্শী নেতা নির্বাচিত হয়ে আপনারা ধর্মের সত্যতার ব্যাখ্যাদানের সুযোগ লাভ করেছিলেন। সেই সুযোগে নৌশেরবির পার্শী সম্প্রদায় ধীরে ধীরে সংখ্যায় পুনরায় বৃদ্ধিতে সমর্থ হয়েছিল। পুরুষানুক্রমে এই ধর্মের অনুশাসন আজও সে সমাজে কার্যে রয়েছে। সংখ্যায় সমগ্রদেশে যে মাত্র কয় হাজার ধর্মের অনুসারী রয়েছে, তারাই হল পৃথিবীর প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ-ই-ইলাহি প্রবর্তকদের। এ ছিল একেশ্বরবাদী ধর্মবিশ্বাসের এক নতুন ভিত্তি। পণ্ডিতদের ধারণা, খ্রীষ্ট অব্দের ৫ হাজার বছর পূর্বে এই ধর্মের প্রবর্তন হয়।

জরথুস্ট্র প্রবর্তিত ধর্মের উৎস সন্ধানে ইসলামপূর্ব পারস্যের ইতিহাসও কিছু প্রাচীন বিষয়। ৫৫০ খ্রিঃ পূঃ পারস্যের আকিমেনীয় (Achaemenian) সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সাইরাস নিজে তাঁর ধর্ম ও ইসলাম অত্যন্তদেশ ধারণ করেন অথবা ৭০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিল তাঁর রাজত্ব। এই সাইরাসের সৈন্যবলই আরবদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের আধার ভেঙে দিয়েছিল। তাঁর উপযুক্ত পুত্র পুরুষ দারায়ুস (৫২২-৪৮৬ খ্রিঃ পূঃ) সাম্রাজ্যের তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন সিন্ধু ও পাঞ্জাব পর্যন্ত। ইতিহাসের সাক্ষ্যেই জরথুস্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম পারস্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের দুজনের আবির্ভাব পারস্যের ইতিহাসে এক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় বা যাত্রা আরম্ভ নিয়ে এই কথাকে বলেছেন—The beginning of the relevant historical epoch is characterised by the apperance of two personalities who were to become determining factors in the persian political as well as religious development: Cyrus and Zoroaster. With these two names, Iran enters a period of history characterised in Greece, Israel, India and in China by an extraordinary intellectual upheaval. জরথুস্ট্রের ইতিহাসিত্বের অস্তিত্বের প্রশ্ন তোলা হয়, যে কারণে তিনি পণ্ডিতের দ্বিধার প্রতিনিধিত্ব নিয়েই। গ্রীক্‌সেলিত তাঁহার দিলেন ইরান দুই বিশিষ্ট ভেবেছে বিভাজিত ছিল। তার একদিকে ছিল ইন্দোইরানীয় প্রাচীন বেদোপনিষদীয় সংস্কৃতির প্রতিফলন আর অন্যদিকে ছিল তখন এশিয়ার ইরানীয় গ্রেস অঞ্চল থেকে গ্রীস পর্যন্ত ছিল প্রসারিত ভূমধ্যসাগরীয়। মুসলমান আমল While the persian polity originated in western Iran under the Achemenidian Cayrus, the teachings of Zoroaster were conceived in the East in direct confrontation with the nomadic culture on the threshold of myth and history. The dichotomy represents the basic Principles of Iranian history: the call to enablish a universal political order and the divine mission of Ahura Mazda. জরথুস্ট্রের আবির্ভাব কাল, জন্মস্থান ও দিন নির্ণয়ের বিষয়ক নিয়ে বিতর্ক চলেছে। তাঁর জন্মের দিনক্ষণের প্রাচীন পারস্যের রাজধানীতে রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পহ্লবি ও সাংস্কৃতিক সাহিত্য গ্রন্থে প্রথমে আরবদেশবাসী আলেকজান্ডারের সৈন্যরা অগ্নি সংযোগে ধ্বংস করেছিল। এই পারস্যদের নাম ছিল হখা-ই-জামাসপ। পণ্ডিতদের এ সামান্যিকদের এই অংশগুলি থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের ঘটনাগুলির টেক্সা করতে সক্ষম হলেও ৭০০ খ্রিষ্টাব্দের আরব আক্রমণকারীরা তা পুনরুদ্ধারের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিল। সে যাই হোক, পারস্য ও সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব এবং আক্রমণকারীদের পরিচয়ের কোনরূপ তার নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়াও ছিল জরথুস্ত্রের সৃষ্টিতে গাথা গানগুলোর ইতিহাসের জটিলি। এই দুটি উৎস থেকে মনস্তাত্ত্বিক এবং জরথুস্ট্রীয় ধর্ম

পুনরুজ্জীবনের বিষয় নিয়ে মূলধারা থেকে আলাদা মতামত হয়েছে। আমেরিকান পণ্ডিতগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে রাজবংশগুলোর যে রাজত্বকাল উল্লেখ করা হয়েছে তা ঠিক ঈশ্বর উপাসকদের। হাজার বছর ঈশ্বর, ইসলাম বছর ঈশ্বর উপাসকদের। উজির ইবনুল খেইরের অনুবাদিক ৬০০ খৃঃ পূঃ জরথুস্ট্রের জন্ম তারিখটির কথা বলা হয়। আবার আমেরিকার পণ্ডিতদের অনেকের বিশ্বাস জরথুস্ট্র আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৫০০ বছর পূর্বে। তিনি ইরানের বিভিন্ন অংশে পরিভ্রমণ করে তাঁর বাণী ও ধর্মমতামত প্রচারের পর বিস্তার হয়েছিলেন হাজার (প্রচারের আরবাবিজান) প্রদেশে। এখানে তিনি স্থানীয় নৃপতি বিশতাস্প (Vishtasp) এর সভাসদদের তাঁর ধর্মোপদেশ প্রদান করেন। কথিত আছে, তাঁর বাহাত্তর বছর বয়সে এক অঘটন ঘটেন। তিনি একদিন নিজের বিছানে বসিয়ে উপাসনারত। ঠিক এ সময় তুরানী রাজার বাহিনী অগ্নিকুণ্ড বসলে তিনি ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিজে প্রাণ হারালেন। এভিস্তাসাই-নামের বাদানুল ১২ এর (৫২১-৪৮৬ খৃঃ পূঃ) সময় থেকে জরথুস্ট্রের অনেক নৃপতির পালন আসে প্রক্ত অবশেষও তাঁকে পয়গম্বর ও তাঁদের ধর্মবিশ্বাসের ধর্মীয় নিয়ে আগ্রহ রাখেন ও তাঁদের কারো কোন অনেক নিয়ে প্রচুর ছিলেন না। তাই বলা যায় বিশুদ্ধ, পরিশিলিত ও নক্ষ-ই-রুস্তম (Naqsh-i-Rustam) শিলা লেখায় জরথুস্ট্রীয় ধর্ম অনুপস্থিত। এ কারণেই জরথুস্ট্রীয় আবির্ভাবকে কোন নিশের স্থান নিয়ের প্রচুর নিল না। পরবর্তীকালে আলেকজান্ডার শাসকদের রাজত্বকালে (২২৬ খৃঃ—৬৫১ খৃঃ) জরথুস্ট্রীয় ধর্মী পয়গম্বর প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা করা অংশিল।

জরথুস্ট্র প্রবর্তীত ধর্ম মূল একেশ্বরবাদী। তিনি কোনো কল্পনায় দর্শনভিত্তিক বা সাধ্য নিয়ন্ত্রণের একমাত্র অনন্তকালের ঈশ্বর আহুরা মাজদার কাছে আত্মসমর্পণ। আহু অর্থ জীবন বা শক্তি, তা অর্থ দেওয়া এবং মাজদা অর্থ মহান দাতা। সাধুদের আহুরা মাজদার অর্থ কৌশল জ্ঞানদাতা, মহান দাতা, মঙ্গল প্রষ্টা। ধর্মের মূলে দুটি পরস্পর বিরোধী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার এ বিশ্বকে পরিচালনা করছে এক সংগ্রাম বৃদ্ধিমত্তে। অবশ্যই অন্তিমে অন্তত শক্তির বিরুদ্ধে ভালশক্তির বিজয়লাভ হবে। তা সম্ভব হবে বিশ্বের সমস্ত পাপি আত্মার কাছে আহুরার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার মাধ্যমে। জরথুস্ট্র বলি এ কাজ করতে যার্থ হন, তবে অন্তত্তম পরমাত্মা তাকে ধ্বংস করতে হবে। জরথুস্ট্রের মতে দুষ্টিকর্তা হলে কেউ নেই। মানুষের নিকট নৈতিক আচরণের যে দাবি তিনি করেছেন তা হল সংকর্ম, সৎ কথা ও সৎ চিন্তা। অভিনিষ্টিকল্পে এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সত্য নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, পবিত্রতা, অধ্যবসায়, প্রশস্তি ও ধর্মশীলতা। জরথুস্ট্র সংসার বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস ধর্মকে নিন্দা করেছেন জানা, তাঁর মতে, এ পথে মানুষ মুক্তির জন্তজগতিক সাধনা প্রাপ্তি হয়। অনিষ্টকারী কীট-পুরিকাদির মতজগতিক নৈতিকভাব বিশেষে ধরে সকল জন্তু একান্ত ঘৃণ্য। প্রাচীন অবেস্তার বর্ণিত বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ পরবর্তী গ্রন্থে আবেস্তার দ্বৈতবাদের রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু হাজারবছরের পারসী সম্প্রদায় পুষ্ট ধর্মের পাশাপাশি তাদের ধর্মকে প্রাচীন অবেস্তার মানুষরূপে অর্চনাকরণে এককালীন রূপে ব্যাখ্যা করে থাকেন। মৃত্যুর পর মানুষের দেহ জন্তপ্রাপ্ত হলেও তার আত্মার পরিণাম নির্ণয় হয় আহুর মাজদার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে অন্তর্দৃষ্টির শেষ বিচার সভায়। বাজদেহে মানুষের ইহজগতের কর্মজীবনের পরিচালনা করে পাপেরকের পুরস্কার অথবা শাস্তিদান করা হয়। জরথুস্ট্রধর্মে ক্ষমার কোন স্থান নেই, তবে বিচারক বড় করুণাময়। মহাগ্রন্থ কুরানের ভাষায়, while an eternal existence close to the 'Wise lord' is waiting for the good, the wicked and impious are threatened with non-existence in the evil spirit's sphere of influence, which concretely means inhuman torments in everlasting darkness. এখানে নিয়ে ইহুদীদের বিশ্বাস অবশ্যই সঙ্গে তাদের মিল রয়েছে।

জরথুস্ট্রীয় মতে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি মানবী অন্তরাত্মার কোন প্রয়োজন অপেক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে না। তিনি মানুষের নিজ ইচ্ছে ১২,০০০ বছরের এক ইন্দ্রজালের (Salvation) ইতিহাস। তা তিনি প্রতি পদে ১০০০ বছর করে চার যুগে ভাগ করেছেন। প্রথম পদে আহুরিক জীবনের সৃষ্টি, দ্বিতীয় পদে সৃষ্টি মানুষের। এ দুই যুগের পর জরথুস্ট্র শক্তি বা পয়গম্বরের আবির্ভাব ঘটে মানুষ পৃথিবীতে তার নাম অনুষ্ঠিত— পয়গম্বরের দুর্ভাগ্য। এ পদেই দুই বিপরীত ধর্মী শক্তির লড়াই শুরু। চতুর্থ পর্যায় ৩০০০ বছরে তাঁর বাণী অবেস্তার মাধ্যমে সত্য ও শুভ পক্ষ চূড়ান্তভাবে শক্তিশালী করার জন্য পৃথিবীতে আবির্ভাব জরথুস্ট্র। ৯৯৯৯৯৯ ঘটে শুভ ও সত্যের চূড়ান্ত। শুভ ও অশুভ, এ দুটোরই উৎপত্তি আবার আহুরা মাজদা থেকে। কারণটি, হিন্দুদের পুরাকাহিনীতেও বিশ্বের পরিচালনা করেছেন যা হল গরু, ঘোড়া, ছাগল ও জমি। সেখানেও দুধের ও অনুখাদের মূলধন অবস্থানে জরথুস্ট্র আহিক্য :

হয়া বয়া হি বর্ধায় প্রমিতিরিহি হারত।
অনুখোনবধর্মা তেনাহমন্ন বৃহন্নায়ন॥
পরিক্রমা সাধুনা বিনাশায় দুষ্কৃতায়।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥
(গীতা—৪র্থ অধ্যায় ৭ ও ৮ নং শ্লোক)

ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান বিষয়ে নৈতিক মূল্যবোধের শ্রেক্ষাপটে নিয়েনই গৌন ভাবের মর্মে। পার্শীরা ভাবের মানুষের মুক্তি একমাত্র প্রার্থনা খ্রীষ্টানের অনুরূপ। আচার-অনুষ্ঠান বা প্রার্থনা প্রায়শ্চিত্তের ব্যাপারে নয়। জরথুস্ট্রবাদীদের ধর্মানুষ্ঠানের মূল আগুন শুদ্ধিকরণ অনুষ্ঠান মাত্র। এ ব্যাপারে ও পৃথিবী, অগ্নি ও জলের মত প্রাকৃতিক পদার্থের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা— হিন্দুধর্মের মতো যাতে কোন মৃতদেহ সংস্পর্শে এসে অশুদ্ধ না হয় তার নির্দেশ দিয়ে গেছেন জরথুস্ট্রবাদীদের মধ্যে। মানুষ মৃতদেহ সংকারের পদ্ধতিও থেকেই এ প্রথম সুস্পষ্ট। প্রকাশ্যে শুদ্ধ না নিলাপদ মনে করেছেন (মানুষ আকাশ

দেবতা)-এর উদ্দেশে আরাধনারত নিম্নে তাদের মৃতদেহ দাহন করা হয় নিজ, পরবর্তি কালে উৎসবের অঙ্গ। সংবিধানের আমলে প্রজাদিগকে তাদের ঘরে, ঘরিহীন, অগ্নি ও জল তর্পণ দিতে হয়। তাই মৃতদেহ বা অন্যকোন অপবিত্র পদার্থের স্পর্শে মানবদেহ অপবিত্র হলে তাকে কঠোর শুদ্ধিক্রিয়া প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মৃতদেহ যেখানে কেন্দ্রীভূত অগ্নির সমক্ষে অবস্থান। অগ্নির উপস্থিতি ব্যতীত মৃতদেহ কোন অনুষ্ঠানই সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। ঋগ্বেদ যদিও বেদ কিন্তু বেদ, যেমন রয়েছে হিন্দু ধর্মে। তাই মৃতদেহ অগ্নির পুজারী বা উপাসক হলেও তুল হবে।

আমাদের মানবদেহ প্রতি প্রকৃত নিবেদনের জন্য বিপুল প্রার্থনা-সাহিত্যের সম্পদ ঐতরেরিকের সূত্রে হলে আসছে দীর্ঘকাল থেকে তাদের নিকট। পারস্যবাসিরাও তা স্বীকার করেছে মন্ত্রের যা উচ্চারণের সময়ে নিজেদের আদর্শ পুরুষের জন্য ঈশ্বরকে খুশী করা সম্ভব। তা অনুষ্ঠিত ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই একমাত্র আরোগ্যের মূল রয়েছেই। সব ধর্মেই এ বিষয় প্রচলিত। তবে তার বিরুদ্ধে সংস্কারপন্থী পার্শিদের পরিবর্তনের চেষ্টাও হয়েছে। আমাদের দেশে রামমোহন নানা শাস্ত্র গ্রন্থ সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার জন্য বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। অনুরূপ পারসীদের উদ্যোগে জন বোমাঞ্জি এ সার্ভেন্টস অফ নলেজ এর ইয়াসনা অনুবাদ করেছিলেন নিজে কর্তৃপক্ষের অনেক বিরোধিতা উপেক্ষা করে।

পুরোহিতদের ভূমিকা পার্শী সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রত্যেকেই ইমোলোকে তার কর্মের ফল হিসেবে পরলোকে লাভ করবে বলে বা পুরস্কার। ঈশ্বরপুত্রীর বিশ্বাস ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে অন্য কারো ভূমিকা স্বীকৃত নয় বা কোন ব্যক্তি কোন রহস্যাবৃত প্রক্রিয়ার অধিকারী এ ধারণার অনুপস্থিতি বলীয়ে অনুপস্থিতি। অবশ্য মারাই (জ্ঞানী পুরুষ) ও অগ্নি মন্দিরের পুরোহিতদের কিছু বিশেষ ভূমিকা আছে ধর্ম ক্ষেত্রে। জরথুস্ত্রীয় পার্শী সমাজে তারা কখনো ও যেমেন—এই দুটি ধাপে বিভক্ত।

প্রাচীন পারস্যের ইতিহাসের সম্বন্ধে তেমন কিছু সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। যোসেফোসীসের বক্তব্য অনুযায়ী ঐতি পার্শী সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্ব দেখতে পাই নি। ধারণা বিশ্বাস অনুযায়ী খৃষ্ট-পূর্বাব্দ অব্দিকে পুরস্কৃত করবার সময়কাল করার জন্য প্রাচীন পারস্যে নিশ্চয়ই কোন পবিত্র গ্রন্থের অস্তিত্বান ছিল। প্রত্নতত্ত্বে তারা খু অনেক মূল্যবান নিদর্শন রয়েছেন—

(১) ঐতিহাসিক অগ্নিমন্দির যার নাম আতশ বেহ্‌রাম

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীর অগ্নিমন্দির যার নাম আতশ আদারান বা অগ্নিধারি—ধারণা।

আতশ কথাটি আগ্নি, যার অর্থ অগ্নি। আবেস্তা ভাষাতে এটি অর্থে শব্দটি ব্যবহার করে থাকি যেমন আতশ বাজি। অগ্নিমন্দির শব্দটির অর্থও "আগ" বাংলি শব্দ বা হিন্দী/উর্দুতে আগুন বা অর্থ। ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে আবেস্তার পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌরোহিত (নবধর্ম) উপাসকের উপলব্ধি করে বিষয় উপস্থিত হলে তার খৃষ্টি সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রক হয়ে পড়েছিলেন— পারসেপোলী (১৩%) ও কমদী (৭%) দোষী। নিয়ম ছিল উৎসবের দিন-ক্ষণ নিয়ে পারসেপোলীদের মতে ১১ মাসটি আর কমদীদের মতে ১৯ দেখাশোনা। প্রাচীন পারস্যের সমাজ ব্যবস্থার আর-সাম্প্রতিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে হিন্দু সমাজের কলিযুগের মত প্রাচীন বিভাগের প্রচলন ছিল। কিন্তু তা কখনো কার্যকর ব্যবস্থার পর্যবসিত হয়নি। ঐতিহাসিক পর্যালোচনা অথবা সর্বাধুনিক তা থাকলেও পর ব্যবস্থা অনুপ্রাণিত পরিলক্ষিত। উচ্চতর শিক্ষার সূত্রে ব্রাহ্মণকুলি এরা জন্মের অধিকার রয়েছে হয় পুরুষ পর্যন্ত। দেখা যাচ্ছে পুরোহিত বংশের অনুসারী শিক্ষা-দীক্ষা, বুদ্ধিবৃদ্ধি এরা ও শিশু সাধনার বিশেষভাবে তৈরি করে রেখেছিলেন তাদেরকে। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ভাবাভাই নওরোজী, ইটা পরিবার, ধরুর পরিবার এরা আরও অনেকে। পার্শীদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হল আবেস্তা। আবেস্তা শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল মূল গ্রন্থ। আবেস্তীয় ভাষা হল প্রাচীন পারস্যের দুটি ভাষার একটি যা দ্বারা রচিত হয়েছিল পার্শীদের ধর্মগ্রন্থ। আবেস্তার আক্ষরিক অর্থ, জ্ঞানপুঞ্জ থেকে মনে করা হয়। পণ্ডিতেরা অনেকে বলেন, এ গ্রন্থের ছিল একদা সমাধ, কিন্তু হয়ে আজ তারই যৎসামান্য পড়া। পবিত্র রীতি নিয়মের ধোপাকুলে যেসব মূল আবেস্তীয় জীবন ধারায় আবর্তিত দৃষ্টি বা মোক্ষলাভের যে পথ নির্দেশিত তা কালের হাত বিকৃতিবশী। পার্শীদের ক্ষেত্রে সমাজ ও ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্নতির। সমাজবদ্ধী এ যুগে ঈশ্বরের প্রতি আবেদন নিবেদনের কোন আড়াল নেই। প্রত্যেকটি মানুষের ঈশ্বরের প্রতি আবেদন রয়েছে সরাসরি অনুভূতির কিন্তু অপ্রকাশ করে নিজের অন্তরের মাধ্যমে সুখদুঃখের কথা ঈশ্বরকে। তা ছাড়াও তাদের সমাজের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল হয়েছে তাদের। এ ক্ষেত্রে সমাজ ত্যাগী সন্ন্যাসজীবন গ্রহণ বিশ্বাসযোগ্যতাকে সমান। এছাড়া ভিক্ষাবৃত্তি পবিত্র শাস্ত্রিদের অংশ ছিলেন এ প্রাচীন ইতিহাস। তারা ভাবে মানুষ, তারা শক্তিহীন। অন্যের সাহায্য করে হাত তারা অক্ষম, তারা অন্যের পুণ্যফলের অংশের অযোগ্য, পরিবর্তন পুত্রের জন্ম নিয়েও অক্ষম। আসল, তাদের মধ্যেই বিরাজ করছে ঈশ্বরেরকের জীবন, অন্যকুলের দুঃখ অনিবার্য। শক্তি সঞ্চয় ও নিজেকে সংযোগ আনন্দের মুখে পাওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য। এ সংসারে মানুষের সমুখে চলে বিভিন্নরূপ, দুর্দশা, রোগ, বিলাস, কবিদ্রা ও দুর্গতি। যারা এ সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায় তারা এ সৃষ্টি জগতে কয়ে থাকে সত্যের পক্ষে সংগ্রাম। জাগ-যজ্ঞ বা ঐশ্বরিকীয় প্রার্থনার মাধ্যমে জীবনযাত্রার দুটি নেই। তা সম্ভব একমাত্র সক্রিয় কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে। অন্যায় বা অসত্যের পরাজয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যই মানুষকে বিচারের জন্য রয়েছে বুদ্ধি ও ইচ্ছার ঈশ্বরের অংশরূপে যা হল চিরন্তন বলিও মানুষের নশ্বর। তার দুটি বিশেষ গুণ হল ভাবনা (Vasah)—বুদ্ধি ইচ্ছা এবং জীবন-বিবেক। এ দুটি গুণের বলেই মানুষ বলীয়ান হয়ে এর বিচার ক্ষমা কর্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। বলীয় কোন শক্তি বা ক্ষমা থেকে

পরিচালনা করে না তাদের টিকিয়ে রাখতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বন্ধুদের এ সাহায্যে ডাক্তারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম জয় লাভ করে যায় আজ অধিবেশনেরদের দুর্গ হয়েছে আত্মনির্ভরতা। জনপ্রিয়তা অর্জনে যে দুশাখের দুর্গ জয়ে সাংগঠনিক ঈঙ্গিতে তা প্রকাশিত তাঁর কবিতায় :

ছোকরা সবাই জেনে, ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এ বিশ্ব তাঁরই নির্দেশে করে ছোকরাদের অভ্যাসদের এ পরিচ্ছন্ন সমাজকে চালিয়ে যাওয়ার জন্যে। অথচেই আমাদের মূল্য কি না, তাদেরি জন্ম ও সম্পর্ক যেন সম্পন্ন করে যেতে পারে এ জীবনে। একমাত্র পরিচ্ছন্ন দ্বারাই মানুষ অর্জন করতে পারে শৌচাল। ছোকরা কবিতা ও সংকর্ম ছোকরা পক্ষে পালনীয়, তা পালন করতে হবে আজই, কখনোই যেন ঈশ্বর না ভালোবাসুকের জন্য। এই, সময় হলেছে-এদিকে/ দুঃজনের যে আগে এসে,/ সেই আগে স্বর্গে যাওয়ার অধিকারী। কৃষি হলো সর্বোত্তম ব্রত,/ জগৎ, তা সৃষ্টিশীল ও উৎপাদক। যে ব্রত পালন করে তা,/ যে ব্রত প্রার্থনা করে,/ ব্রত যেতে অনেক বেশি দুলাভন। মানুষের জন্যই হলো কাজের ধন্য নিয়ে উঠিয়ে ধরে কর,/ বিশ্রামের ধারণাকে ধরতে পারার জন্য নয়। কতক্ষণ দিনের আলো আছে,/ কাজ করে যাও :/ আলো ফুরাবার আগেরাত্রি তোমার অগোচরেই,/ যে কেন সময় তোমায় ডাক করে নিতে পারে।

কর্ম ও কর্তব্য নিষ্ঠায় এত প্রাণের মহান আত্মা জনপ্রিয়তার সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করে। তা ছিল মানুষের পালনীয় সামাজিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের কৃষিকর্মে ধারণাকে ছড়িয়ে দিতে আত্মনিয়োগ করার শক্তির প্রমাণ। তাঁর একটি বাণী : পথ যে বাঁধন করে,/ উৎপাদন করে ফুল ও ফল,/ বাণী নিজন করে শুষ্ক মৃত্তিকার,/ সে অহোরাত্রি প্রবাহে লাভের যোগ্য।

জনপ্রিয়তার সম্পূর্ণতার পরিচয় নির্দেশ করে যেতেন কবিগুরু যা ছিল—সাধনা, নিজনাকে মনে, কৃষিকর্ম, যেন প্রতিপালন ও জাতিক কৃষিতে ধারণা অর্জন। পালনীয় স্বর্গে ছোকরা কবিতা ও হিতাকাঙ্ক্ষিত ঈশ্বরানের সন্ধান পাওয়া যায় না। কর্মসাধনায় ও অধিক মানুষীকরণে মানুষের কাছাকাছিতে ও মহত্তের উপর বাস্তবিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এ বর্ণে। বলা হয়েছে অন্যথায় ঘরে বসে ব্রতধারণ থেকে সমাজের দারিদ্র্য ও বাস্তবিক। আত্মোন্নয়নে কৃষি নির্ভর ঈঙ্গিতের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হলেও পরবর্তী কবিতায় বাসনার বাণিজ্যে আর্থিক সমৃদ্ধির কথাও বলা হয়েছে। তবে কৃষক কৃষি সম্পূর্ণ নির্ভিন্ন। অন্যের উপর নির্ভরশীল প্রবৃত্তিটি ও অধীনের প্রতি বিশেষ মনুষ্যত্ব ও পালনীয়তার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে জনপ্রিয়তার কবিতায়। তাঁর একটি বাণী : ছোকো, বলিকা প্রতিদানে নিশ্চয় সন্ধান করতে হবে, দেখতে হবে তা পালনীয় নাকি? তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন—একদেশে এক ঘর কাপড় দান করবার জন্য করে তাদের দেশে তা নিয়ে যেতে বিক্রয়ের জন্য দেখতে তার মূল্য কম হওয়া (Drasm)। সে মূল্যেই তা বিক্রয় করলে ঘরে হয়েছে তোমার পরিশ্রমিক ও তোমার মেনিয়াক পরিচয় বৈধিক ব্যবস্থা করা। বাণী যা হউক তা তোমার দিয়ে হবে পরিশ্রম ঘরে। তোমাই হল বড় কার্য।

প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার তাঁর কোন পরিবর্তন তেমন পছন্দ করেন না। তার একটি হল সম্প্রদায় বহির্ভূত বিবাহ। বর্তমানে তাদের সন্তান-সন্ততিদের উচ্চশিক্ষায় আগ্রহে ও বৃত্তির সন্ধানে অহিনের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই তাদের সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কও স্থাপিত হচ্ছে। কিন্তু এখন বিবাহ তাদের সমাজে সমাদৃত হয় না। পালী সম্প্রদায়ের কোন পুরুষ অন্য ধর্মাবলম্বী কোন মহিলা পরিগ্রহণ করলে পরিবারেকে এ বিবাহ সমাজে স্বীকৃতি পায়, কিন্তু স্ত্রী কোনদিনই ওই সম্প্রদায়ের সমাজাচার মর্যাদা লাভ করে না। কোন পালী তাদের অন্য সম্প্রদায়ের পুরুষকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করলে, বিবাহিতের জন্য তিনি সন্তান-সন্ততি সহ তার মূল ধর্ম ও সমাজ থেকে হারিয়ে যান। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত সিহসটি আর বি টাটা একজন পালী মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁর অসার অনুপ্রাণ পালনের মাধ্যমে তিনি তাঁর কলেজ ট্রাস্টে নিজেদের সমাজের প্রচলন চেষ্টা করলে বিষয়টি নিয়ে তুমুল প্রতিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। সিহসটা জেহাঙ্গীর-এর পালীবাসী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। The controversy came to an end on March 2, 1905, at a general meeting (Anjuman) of the Bombay parsees when the over whelming majority declared itself in three resolutions against accping women from outside of the communaly married to parsees, children of these mamiagaes or voluntary converts as parsees. This ruling, on the basis of which only that person is a parsee whose parents are both parsees.

ষোড়শ শতাব্দীর শুরুতে সমুদ্র বন্দর হিসেবে একচেটিয়া সুবাটি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করল। মোগল সাম্রাজ্যে ইউরোপীয়দের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো সুরাটি বিশিষ্টতা অর্জন করলে সেখানে পালীদের আগমন বৃদ্ধি পেল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে তা এক বিশেষ পালী উপনিবেশ রূপে প্রতিষ্ঠা পেল। ইউরোপীয় বণিকরা পালী দালালদের মাধ্যমে সুরাটের পণ্যদ্রব্যগুলির সঙ্গে তাদের যোগাযোগ পরিচালনা করত। পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজের ও ইংরেজের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সমূহ তাদের দালাল বা প্রতিনিধি হিসেবে পালীদের নিযুক্তি দিলের পছন্দ করত। এই সময়ের একজনের পালীদের মধ্যে মহত্ত্ব মনোহর (১৬০৪—১৭২১ খৃঃ) ছিলেন এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি প্রায় দুই দশক ধরে ছিলেন পর্তুগীজ বণিকদের দালাল ও তাদের নিযুক্ত পর্তুগীজ দালালের রাজনৈতিক প্রতিনিধি। একই সময়ে তিনি আবার ইংরেজের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিরও প্রতিনিধি ছিলেন। তারই

> .....ইরাণাগত পার্সিরা নিজস্ব সামাজিক ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও ভারতবর্ষের সার্বিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে নানা উদ্যোগে অংশগ্রহণ করে দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও মান বর্ধন করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে।.....

[illegible] ইংরেজ কোম্পানি সুরাটে তাদের কুঠী স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৬০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি ঔরঙ্গজেবের দরবারে ইংরেজ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বিশেষভাবে আলাপ করে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। তার পুত্র সৌম্যদর্শী জাহাঙ্গীর মাত্র ষোলো বছর বয়সে পার্সি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রথম ভারতীয় যিনি ১৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানির ডাইরেক্টরদের সঙ্গীদের এক অনুষ্ঠানপত্র পেশ করার জন্য লন্ডন গিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, তাদের ব্যবসায়ের কাজে তারা গোড়া থেকেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ইউরোপীয়দের সর্বাগ্রে এসে তাঁরা বাণিজ্য কুঠির নানা কলকৌশল সর্বাগ্রে আয়ত্ত করে নিজেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রভূত উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় চার্লস এর সঙ্গে পর্তুগালের রাজকুমারী ক্যাথরিনের বিবাহ সম্পর্ক হলির ফলে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাই যৌতুকস্বরূপ ইংরেজের অধিকারে এল। ফলে সুরাট বিদেশীদের ব্যবসায় কেন্দ্র হিসেবে প্রাধান্য হারাল। ইংরেজ পশ্চিম উপকূলে বোম্বাইতে তাদের প্রধান বন্দর হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল। অবশ্য তার পূর্বেই কিছু পার্সি বোম্বাই এসে গিয়েছিলেন। তাদের প্রথম ছিলেন বোমানজী নানাভাই। এরপর ইংরেজের শাসনাধীনে বোম্বাইতে তাদের অভিগমন শুরু হল আরও বেশি সংখ্যায়। তারা পুরনো পেশোয়াদের ইংরেজের শাসনে বোম্বাই অঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের মুখ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে। ইংরেজদেরও উৎসাহ ছিল এ কাজ পরিচালনে। প্রশাসনের ছিল তাদের মূলধনের সংরক্ষণের জন্য 'বন্দর' নির্মাণ করতে জমির কম অভাব।

বোম্বাই নগরীর নবরূপায়ণের কথা বলতে সুরাট থেকে পার্সিদের অভিগমন ঘটেছিল এখানে মূলত আর্থিক কারণে। এটাদের উদ্যমে সিংহভাগই বোম্বাই নগরীতে নিবেদিত। কিন্তু তাদের সুরাট তাদের পক্ষতে অন্য কারণও ছিল। তার প্রধান ছিল ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে সুরাটের ঘূর্ণিঝড়। এ ছাড়াও ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে সুরাটে যেটা তাদের বিকাশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে, তা হল ইংরেজ ও পার্সিদের মধ্যে বিবাদ। ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে সুরাটের ইংরেজ কালেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট পার্সি ধর্মগুরু দস্তুর বেহরামজী রানিনাকে অপমান করেন। ফলে পার্সিরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ইংরেজ সরকার ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা পার্সিদের মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি বিরূপতা সৃষ্টি করে। ফলে তারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগ্রামে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের সময় পার্সিরা ইংরেজদের সাহায্য করেছিল। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বোম্বাইতে পার্সি ধর্মগুরু দস্তুর বেহরামজী সঞ্জানা ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে পার্সিরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের সংগ্রামে সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের সময়

ভারতবর্ষের দারিদ্র—helot system of administration organised for the exclusive advantage of Privileged minority and existing to great dishonour of the British name. ভারতবর্ষের কবিতা, বিশেষত প্রাচীন কৃষ্টিকের অভিব্যক্তিতে প্রথম আলো বিশেষে তিনি ইংরেজের গোচরাধে ধরিয়া করেছেন। এ কবিতাগুলি কালে বিশেষে তথ্যপূর্ণ তিনি আরও দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে কবি করেছিলেন—শাসন ব্যবস্থার ভারতীয়করণ করতে হবে আর তা করতে হলে আই সি এস প্রতিযোগিতা বয়সসীমা বৃদ্ধি ও ইংরেজের সঙ্গে সমান সুযোগ এই পরীক্ষা ভারতবর্ষেও গ্রহণ করতে হবে। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবনতি সম্বন্ধে ইংরেজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি কয়েক সংখ্যা পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। এদের দুটি ছিল আফগান-বার্মিজ ও আফগান-অফগান যুদ্ধ এবং তিনিদের দুটি। এ-যুদ্ধের ফলে ইংরেজ তার রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষের সম্পদের উপর নির্ভর করেছিল। ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষার জন্য এই সময়ে আর্থিক অনুসন্ধানের নিমিত্ত কমিটির নাম পার্লামেন্টারি কমিটি ও অধিবেশনে তিনি তাঁর অভিমত স্পষ্ট প্রকাশ করেছিলেন। এবং কমিটি/অধিবেশন ছিল—সিলেক্ট কমিটি অন ইন্ডিয়ান ফাইনান্স-১৮৮৩, ইন্ডিয়ান ফেমিন অধিবেশন-১৮৮৬, শাস্ত্রির লাটীয় অধিবেশন ১৮৮৪, রয়াল কমিশন অন ইন্ডিয়ান এক্সপেনডিচার ১৮৯৮ এবং ইন্ডিয়ান কারেন্সি কমিটি। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তা বৃটিশ পার্লামেন্ট কেন্দ্রস্থলে টেনে নিয়ে আসা প্রয়োজন। তাই লক্ষণীয়, পার্লামেন্টারি তিনি ভারতবর্ষের স্বার্থ সম্বন্ধীয় বিষয়ের প্রস্তাব বৃটিশ পার্লামেন্টের সভ্য হিসেবে পেশ করেছিলেন। উপরন্তু বিশেষে অনুরূপ নানা জনমতের স্থানীয় ইংরেজদের কাছে জানবার বাইরের জন্য তিনি ভারতবর্ষের স্বার্থ বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। জাতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পূর্বে তিনি লন্ডনে ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন গড়ে তুলেছিলেন একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাঁর এ কৃতিত্ব ছিল এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। পরে তিনি কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনে এ সংগঠন সম্বন্ধে তুলেছিলেন। তাঁর মি: হার্বার্ট স্পেন্সারের জন্য তিনি ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এক স্মরণীয় সম্পর্কিত রয়েছিল। এ কারণে তাঁর প্রতি সম্বন্ধ স্পেন্সারী তাঁকে 'প্রাউড এন্ড মাস অব ইন্ডিয়া' নামে কৃতির করেছিল। তাঁর নিজের সাম্রাজ্যের সাম্যবাদিক ব্যবহার নানা সমালোচনার বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার বিশেষ সাহায্যের আছে। 'রাত স্পেকটেটর' নামে একখানি পত্রিকাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপে তাঁর এক বলিষ্ঠ ছিলেন বিশেষ নাম মেহতা (১৮৪৪-১৯১৪ খৃঃ)। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি জাতীয় কংগ্রেসের মহাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি পেশায় ছিলেন ব্যারিস্টার। বাম্বাসাই নওরোজীর মতো তিনিও ছবে প্রাণে ছিলেন এক জাতীয়তাবাদী ভারতীয়। এক পত্রে পার্লামেন্ট সভ্যদের বক্তব্যের সমালোচনা বিরুদ্ধে তিনি লিখেছিলেন—To ask the Parsees to isolate themselves and their interest from those of the natives of this country is to Preach something not only selfish but a great deal of more short-sighted and unwise...it would be only to reduce as to insignificance.... ২৯.১২.১৮৯০ তারিখে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবেও তাঁর বক্তৃতায় একাধিক ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা ব্যক্ত করে বলেছিলেন...To my mind, a Parsee is a better and truer Parsee as a Mohamedan or a Hindu is a better and truer Mohamedan or Hindu, the more he is attached to the land which gave him birth, the more he is bound in brotherly relation, and affection to all children of the soil, the more. জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন কৃতিত্বের পাশি সম্প্রদায়ের কৃতীয় প্রতিনিধি ছিলেন দীনশ এদুলজি ওয়াচা (১৮৪৪-১৯৩৬ খৃঃ)। এক বয়সীর পরিচয়ের দীনশ ' ওয়াচাকে এলফিনস্টোন কলেজের পড়ার সময় ঘনশ্যাম তা বন্ধ করে থাকে রাখবার যোগ দিয়ে ছিল। পরে তিনি টিচার্সের এক কলাকুশলে পরিদর্শনের সংগ্রাহী জ্ঞানলাভে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। ১৮৮৫-১৯২৩ খৃঃ পর্যন্ত তিনি বোম্বাই-এর কৃষির রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে শুরু করে সর্বভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। দাদাভাই নৌরোজির "নিষ্কাশন সিদ্ধান্ত"র তিনি ছিলেন সমর্থ প্রচারক। বোম্বাইয়ের আইন পরিষদে এবং কংগ্রেসের কমিশনের সম্মুখে কর্তৃত্ব তাঁর তিনি ইংরেজের অর্থনৈতিক-শোষণের বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকার সময় পর্যন্ত (১৮৮৪-১৯১৩ খৃঃ) তিনি ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের সমর্থক এক সহিত জাতীয় নেতা। তাঁর দিন ইংরেজির বন্ধুত্বের রাজনৈতিক জীবনে তিনি খুবেদের জাতির সমস্যা সম্বন্ধেই তাঁর বেশির ভাগ বক্তব্য প্রচার করেন।

বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী, অনুষ্ঠ শ্রেণীর এ জাতীয়তাবোধের প্রথমে পাশি সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ সেটাদের অবদানের জাতীয় রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সার্থ হয়েছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদেরকে জড়িয়ে নেয়েছিল জাতীয়তাবোধের জন্য কিন্তু অনেকেই আবার উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়েন নি। তাই অনেকেই প্রথম জাতীয় আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন তবে ইকন খুলিয়ে ছিল ইংরেজ সরকার। তাদের নরোজির এ আন্দোলনকে হিন্দুদের আন্দোলন বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। অন্যান্য প্রথম বিরোধিতার পরিপ্রেক্ষিতে রাজভক্ত নৌরোজি, ভিলেক আয় মেহতা ও দীনশ ওয়াচা ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

দেশের মধ্যে ধর্মঘটনোর জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস প্রস্তুত করা হয়েছিল। The news of Muncharjee Bhownegree's defeat will be received with feigned satisfaction by the entire Public. He has always danced to the tune of the Anglo Indian Patrons and has lost no opportunity to strike a blow at India's Political advancement. Sir Muncherji's unpopularity in India can be gauged from the fact that the Bengalees recently burnt his effigy out of indignation at his attitude towards the Bengal Partition.

বৃটিশ পার্লামেন্টে বিদায় অভিনন্দন প্রদান ছিল প্রথম ভিন্ন ধরনের সংবর্ধনা যে তিনজন ভারতীয় ইংরেজ জনসাধারণ দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, উনি তিনজনই ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। দাদাভাই নৌরোজী ছিলেন তাঁদের প্রথম। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি বৃটিশের শিল্পায়ন পদ্ধতির সমালোচনা করেছিলেন। প্রথমবার পার্লামেন্টের পর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করলে রক্ষণশীল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড সেলিসবেরী মন্তব্য করেছিলেন যে একজন কৃষ্ণকায় ব্রিটিশ ইংরেজের রক্ষণশীলতাকে অপদস্থ করার কোন অধিকার থাকতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর এ মন্তব্যের বিরুদ্ধে তখন সেদিন ইংরেজের পত্রিকাগুলিতেও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে মাত্র পাঁচ ভোটের ব্যবধানে লালবাগ ডিনবার্গ কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন। পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য ছিলেন বুদ্ধজয়ী এবং ভাওনাগরী। তিনি বৃটেনের ভারতের রাজ্যে রাজকুমারের প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনে বাস করছিলেন। রক্ষণশীল দলের প্রার্থী রূপে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন ১৮৯৩—১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন ভারতের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সমালোচক। রক্ষণশীল ভারতীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের ভাবমূর্তিক্ষয়ের প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর প্রচারে। ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদের (বোম্বাই) পার্লামেন্টে আর্থিক প্রশাসনের একজন প্রবক্তা ছিলেন তিনি যে সময়ে ইংরেজ পার্লামেন্ট তাঁর শ্রেণীভুক্ত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে উদারনৈতিক চেতনা শিখরে পৌঁছতে সক্ষম। ব্রাহ্মণের জাতি বিরোধিতা তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি কয়েকজন ও সংবাদপত্রগুলির কাছের সমালোচনার পাত্র হন। এ কারণে পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের বৃটিশ সমস্যা গাবি করেছিলেন তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। তিনি ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভব করার পক্ষপাতী ছিলেন। বক্তব্যের জন্য তিনি ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর পরাজয়ের কারণের 'ভারতী' সংবাদপত্রে

বৃটিশ সংসদে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রথম ভারতীয় সদস্য ছিলেন দাদাভাই নৌরোজী। তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সংসদে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রার্থী রূপে তিনি বৃটিশের শিল্পায়ন পদ্ধতির সমালোচনা করেছিলেন। প্রথমবার পরাজয়ের পর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করলে রক্ষণশীল বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড সেলিসবেরী মন্তব্য করেছিলেন যে একজন কৃষ্ণকায় ব্রিটিশ ইংরেজের রক্ষণশীলতাকে অপদস্থ করার কোন অধিকার থাকতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর এ মন্তব্যের বিরুদ্ধে তখন সেদিন ইংরেজের পত্রিকাগুলিতেও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। উক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে মাত্র পাঁচ ভোটের ব্যবধানে লালবাগ ডিনবার্গ কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিলেন। পার্লামেন্টের অন্যতম সদস্য ছিলেন বুদ্ধজয়ী এবং ভাওনাগরী। তিনি বৃটেনের ভারতের রাজ্যে রাজকুমারের প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনে বাস করছিলেন। রক্ষণশীল দলের প্রার্থী রূপে তিনি পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন ১৮৯৩—১৯০৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন ভারতের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সমালোচক। রক্ষণশীল ভারতীয় পার্লামেন্ট সদস্যদের ভাবমূর্তিক্ষয়ের প্রতিফলন ঘটেছিল তাঁর প্রচারে। ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদের (বোম্বাই) পার্লামেন্টে আর্থিক প্রশাসনের একজন প্রবক্তা ছিলেন তিনি যে সময়ে ইংরেজ পার্লামেন্ট তাঁর শ্রেণীভুক্ত মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে উদারনৈতিক চেতনা শিখরে পৌঁছতে সক্ষম। ব্রাহ্মণের জাতি বিরোধিতা তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি কয়েকজন ও সংবাদপত্রগুলির কাছের সমালোচনার পাত্র হন। এ কারণে পার্লামেন্টে ভারতবর্ষের বৃটিশ সমস্যা গাবি করেছিলেন তিনি ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করছেন না। তিনি ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন অনুভব করার পক্ষপাতী ছিলেন। বক্তব্যের জন্য তিনি ইংরেজদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর পরাজয়ের কারণের 'ভারতী' সংবাদপত্রে

ব্রিটিশ কংগ্রেসে ভারতীয় সদস্যদের নিয়ে একটি সমাজতান্ত্রিক ধারণা। ভৌগোলিক সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসীয় ই সময়ে যোগদানের ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে কংগ্রেসের যোগদানটি কাজে লাগিয়েছিলেন কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি। তার পুরোভাগে ছিলেন জওহরলাল নেহরু, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ, অচ্যুত পট্টবর্ধন, ফরওয়ার্ড ব্লকের সেক্রেটারি, এম এন রায়ের দলী এবং পরবর্তী সময়ে দুঁজন বিখ্যাত ব্যক্তি মিনু মাসানী ও এস এম বাটলিওয়ালা। বাটলিওয়ালা এবং নাম্বুদ্রিপাদ সংবাদপত্রের ভারতবর্ষের কমুনিস্ট আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

পাশ্চাত্যের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রশ্নকে বিশ্বজনমতের তুলে ধরে এক আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার প্রয়াসে পারী সম্মেলনের এক তেজস্বিনী মহিলা প্রতিনিধি মাদাম কামা—এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি বোম্বাইয়ের এক ধনী পার্শী পরিবারের কন্যা ছিলেন। তাঁর সংগ্রাম বহু বছর ধরে অব্যাহত থাকে তিনি ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রচারকার্য চালানোর জন্য ঘোরাফেরা শুরু করেন। ভারতবর্ষের বিপ্লবপন্থী শ্রেণীর প্রতি সহানুভূতিমূলক প্রচারের ফলে তিনি ইউরোপে বিভিন্ন বিপ্লবপন্থীদের কার্যকলাপের কেন্দ্রবিন্দুরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। প্যারিসে নিযুক্ত নানাদেশের বিপ্লবপন্থীদের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। অবশেষে অস্ত্র ছিনিয়ে জন্য তিনি গোপনস্থানে অস্ত্র চালান যোগাযোগ করেছেন সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ভারত, পাকিস্তান

গুরুর সহায় এক লেখক হিসাবে (আগস্ট ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে) তাঁকে সম্বন্ধে বলা হয়েছিল she was at that time one of the recognised leaders of the revolutionary in Paris and was said to be regarded by the Hindu, as a reincarnation of some deity, presumably Kali. ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে তিনি আবেগপূর্ণ ভাষায় ভারতবর্ষে ইংরেজের বৈরাচারী শাসনের কঠোর সমালোচনা করে বক্তৃতা দিয়ে সভা আলোড়িত করেছিলেন। ঐ কংগ্রেসেই লেনিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই কংগ্রেসেই তিনি ভারতবর্ষের তিনের রচিত জাতীয় পতাকা সর্বপ্রথম পাশ্চাত্যের মাটীতে উত্তোলন করেছিলেন যা পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা রূপের পূর্বাভাস হয়েছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লবের পর তিনি রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য প্রস্তাবিত হয়েছিলেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গমন করেছিলেন। তখনই তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের মর্মকথাগুলোর আমরা উল্লেখ করে প্রকাশিত। এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন We are in slavery and I am in America for the sole purpose of giving a thorough expose of the British oppression ..the people of India had culture, the Poorest Peasants had stored in their memories all great spiritual truths of the Mahabharata and the Ramayana, and felt that it was inconsistent to force christianity upon a harmless and deeply spiritual people at the point of bayonet. বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায়, বহুবাদের বিনায়ক দামোদর-এই ঘরে ভারতবর্ষের বিপ্লববাদীদের সঙ্গেও তিনি তাঁর যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন এবং তাঁর বিপ্লবাত্মক প্রবন্ধ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হত। ইংরেজ সরকার তাঁর এসব কার্যকলাপে বিরক্ত হয়ে ফরাসী সরকারের নিকট তাঁর বহিষ্কারের দাবী জানিয়েছিল। এর ফলে প্রচারপত্রে তাঁর ছদ্মবেশে তাঁর প্রকৃতির অর্থ—তা ছিল তার দেহে ঘোরাতে ফিরে—ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিল। তিনি বলেছেন যে ঐ সময় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি বিপ্লবাত্মক প্রচারের প্রয়োজনে জেনেভা থেকে দু'খানি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন—একটির নাম তলোয়ার, অপরটির নাম বন্দেমাতরম। ফরাসী টর্পেডো পরিচালির দল দিয়ে এ দেশগুলি ভারতে পাঠান হত। তিনি ছিলেন ইংরেজি লিখনে সুপণ্ডিত। এর ফলে ইংরেজ ইংরেজদের দেশের মানুষ তাঁর লেখা পড়তে পার

করেন। তারপর ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে একুশ বছরের টাটা বৃহত্তর বিশ্বে এক নতুনতর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ক্ষেত্রটের নেপিয়ার এর মেয়েতে তখন প্রচলিত আফিম-বিক্রয় বন্ধ। তখনে অর্থনৈতিক বাণিজ্যিক প্রয়োজনীয় প্রয়োজন ছিল তিনি অনুভব করেন। তারপরেই তিনি নাগপুরে এক বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ সময়ে উদ্যোগ হয় ১ ১-১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে। ঐ বিষয়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বিশ্লেষণের তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রাধিকারে দেখানো হয়েছে। তাই এ দিক এবারের দিন কাজে আসবার হল। তারপর শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করলেন। তার প্রথম উপলব্ধি ইস্পাত শিল্প, বিদ্যুৎ ও উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষা ও অনুসন্ধান সুযোগ। এ বিষয়ে তিনি পরিচয়ভাবে ঠিক করলেন। খুব কাজে তিনি অর্থনৈতিক প্রয়োজনে তিন প্রদেশ নির্বাচিত করেন। তাঁর এ প্রদেশের সুযোগে তিনি শাসকদের কাছে অনুরোধ করে শিল্প খোলার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁদের দেশের ইস্পাত কারখানা, কয়লার খনি, ও অন্যান্য শিল্প পরিদর্শন করে তিনি তাঁর অনেককে শিল্প-সাধনার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার মানসিক প্রস্তুতি নিলেন। জর্জ ওয়াশিংটন রাইস তাঁকে লোহার কলকারখানা পরিদর্শন করে তা থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন যাবতীয় পরিকল্পনা করতেও পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর বিদেশ ভ্রমণকালে বিদেশ থেকে অনেক বই সংগ্রহ করে তিনি স্বদেশে এনে তা প্রেরণা করেছিলেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি জাপান গিয়েছিলেন। এখানকার দেশের শিল্প তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল। তিনি জাপান থেকে বিশেষজ্ঞ আনিয়ে দেশের ছাত্রের অধ্যয়নের জন্য ঘটিলুরে এক কেন্দ্র স্থাপন করলেন। কিন্তু অকালে মৃত্যু তাঁদেরকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণে জন্য ও পরীক্ষার সুযোগ করতে দেয়নি। তাঁর জাপান যাত্রার জামশেদজী নসীর বিশেষে গেছেছিলেন তারতবর্ষের নবযুগের আর এক শ্রষ্টা স্বামী বিবেকানন্দকে। তাঁদিকী তখন জাপান হয়ে চিকাগোর পথে যাত্রী ছিলেন ঐ জাহাজে। ঐ সময় জামশেদজী টাটা তাঁর সঙ্গে দেশের জন্য সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁরই উল্লেখ করে তিনি স্বামীজীকে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬-১১-১৮৯৮ তারিখে এক পত্রে লিখেছিলেন,...I Very much recall at this moment your views on the growth of the ascetic spirit in India...I recall this ideas in connection with my scheme of a research institute of science for India ...it seems to me that no better use can be made of the ascetic spirit than establishment of monasteries or residential halls for men dominated by the spirit where they should live with ordinary decency and devote their time to the cultivation of science—natural and humanistic. এরপরেই জামশেদজী তাঁর পরিকল্পিত বাঙ্গালোরে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স গড়ে তিনি। জামশেদজীর সেই চিঠি তাঁর ইস্পাত কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইংলন্ডে বসবার সময় কর্জ কার্জন মেরিডিনের কাছে তাঁর পরিকল্পনার বিষয়ে আলাপ করলে তিনি তাঁকে উৎসাহ দিলেন। তখন থেকে তিনি দেশের মানসিক দৃঢ়তাকে ইস্পাত শিল্প সম্বন্ধে প্রয়োজন জ্ঞান লাভ করার জন্য শিক্ষিতদের এই বিষয়ে কারুশিল্পী কুলিয়াম কেরোলির সঙ্গে দেখা করলে এ ব্যাপারে তিনি তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালাবার জন্য লর্ড সেলি-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে তার সিকটে প্রস্তুত দিলেন। সেসিল জামশেদজীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎকারের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখে গেছেন I was dumb founded, naturally. But you do'nt know what character and force radiated from Tata's face. And kindliness too. 'Well', I said, 'yes', I would go. তখনও ইস্পাত কারখানার জন্য তাঁর নির্বাচন সম্পূর্ণ হয়নি। কিন্তু দেশটির ভবিষ্যতকর্মী জামশেদজীর আগ্রহে তাঁদের মধ্যে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে মিশন থেকে পুত্র দোরাবজীকে লিখিত চিঠিতে এক বলবার কিছু কথার অবতারণা করেন Be sure to lay wide streets planted with shady trees, every other of a quick growing Variety. Be sure that there is plenty of space for lawns and gardens. Reserve large areas for football, hockey and Park, Earmark areas for Hindu temples, Mohammedan mosque and Christian Churches. তাঁর বয়স তখন শেষ ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে, তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পরে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে-এ জেলাপ্রধান ইংরাজদের জন্য বাদানিয়ে (Badnaubeim) শহরে পাহাড়ের উপর বাংলো নির্মাণ করলেন। তিনি তাঁর পুত্র ও আত্মীয় পরিজনদের তাঁর আরও সাথ এখানে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন If you cannot make it greater, at least Preserve it. Do not let things slide. Go on doing my work and increasing it but if you cannot, do not lose what we have already done. সুযোগ্য বংশধরগণ তাঁর কাজের শুধু রক্ষাই করে যেতে পারেন নি, তাঁরা তাঁর শিল্প বাণিজ্যে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় এগিয়ে গেছেন। কয়েকটা জলপ্রপাতের সৃষ্টিকর্তা যে জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা জামশেদজী টাটার মনে স্থান পেয়েছিল তার রূপায়িত হয়েছিল ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে যা টাটা হাইড্রো ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড নামে। টাটাদের প্রতিষ্ঠানে প্রকৃতি কাজ করে আরও সহজ সাধ্য হয়েছে ঠিকই। তাদের খনিতে বিজ্ঞানের, তাদের পরিচালন কর্তৃপক্ষ কখনোই প্রযুক্তির আধুনিক করে কর্মচারিদের বঞ্চিত করতে সংকোচ নয়। জামশেদজী টাটার নিজের জন্য জাতীয় শিল্প তাদেরকে বিদ্যুৎ করে তার শিক্ষিত পরিচালনে কলকারখানা ব্যবস্থিতভাবে গড়ে তুলতে পেরেই ছিল এক অসাধারণ শিল্প সংগঠক। তাদের

সালনে মহিলা মেধের ইতীয় লহকে প্রতিষ্ঠির হওয়ার আগের পূর্বে ইংরেজ প্রাণের অন্তর্নিহিত কলাকৌশল লক্ষ্য করে অনেক আগে প্রহণ করেছিলেন যা তার দ্বিতীয় ছবির কলাকৌশল ইতিহাসে এক ইতিহাস গড়ে। তার মধ্যেকটি দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ:

	ইংরেজ শাসকদের ভারতীয় প্রশাসন	ভারতীয় শাসকদের ভারতীয় প্রশাসন
১। আই ম্যাস্টার অর্ডিনেন্স	১৯১৯	১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ-আগে
২। সিডিল সার্ভে রিফিংগ	১৯১৯	১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দ-আগে
৩। প্রাদেশিক সরকার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা	১৯১৯	১৯৩৮
৪। সংখ্যালঘু ছুটি	১৯২০	১৯৩৮
৫। রেলওয়ে সিস্টেম (নি এক)	১৯২৩	১৯৩৮
৬। পোলাস	১৯২৪	১৯৩৮

এর মিশ্রে তাদের ভারতবর্ষে ও ভারতের বাইরে দুটো ব্যাপক প্রতিষ্ঠানের সংগঠন করেন। তার মধ্যে তিনটি সংস্থা বাস্তব, ঘটনাটিই বিজ্ঞান ও সাধারণ ইতিহাসে পূর্বেই জায়গা করে নিয়েছে। ভোটের ব্যাপারে চার্চিলের এক বিশ্বের উদ্যোগ যা শুরু করেছিলেন যার অবসানটি এক নিয়ে প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নিজ দেশের জন্য তিনি এক বিদেশী অধুনিক মনের কথা মিশ্রে বিশ্লেষিলেন যেমনটি এর এক ইতিহাসিক ভোটের। এখানে ভ-ইউরোপীয়দের প্রহরণ ছিল বিভিন্ন দৃষ্টি ও ধারা অনুযায়ী ইউরোপীয় ভারতবাস আগে তার জন্য স্থান উন্মুক্ত ছিল। তাদেরই পরিবে তিনি এক অভিনব ভোটের নির্দেশনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর এ প্রতিষ্ঠা এর শেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভোটের নির্দেশনে হয়েছে। তা পড়ে তুলতে তিনি লিখেছে তাদের নিজ অধুনিক দেশ থেকে পাশ্চাত্য ভারতীয়দের আলাদা সম্প্রদায় গড়ার ও আলাদাভাবে সমৃদ্ধ। তা বিশ্লেষিতীদের জন্য তিনি ইংরেজদের জেলখানার আদালতী করেছেন। ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জীবনকালেই আন্তর্জাতিক সুশিক্ষিত হয়ে সংস্থার জন্য নিজস্ব অভিনিধি নিয়ে আন্তর্জাতিক ভোটের শুরু উদ্যোগ হল। ভোটার পরিবের মধ্যে সালন নিয়ে প্রথম ভোটের শেষ বৈশ্বিক আলোকসজ্জা। নিজিয়ার পরিচিতের বিজ্ঞানে মধ্যে ভারতীয় ভোটের ইতিহাসে বিজ্ঞানে মধ্যে অবদান অনস্বীকার্য। ভোটারিতে অর্থাৎ ইতি ইনস্টিটিউট অব কালচারেলিজ নিশ্চয় এ ধরনের ভোট ভিন্নিধর্মের অধুনিকতার ভেন্স এ সংস্থার উদ্যোগ নিয়েছে। পরবর্তী বিজ্ঞানে অন্তর্ভুক্ত ভোটের ক্ষেত্রে ১৯ শ্রেণী আন্তর্জাতীয় ভাষা এ ১৯ ভোটের নিয়ে ভাষ্যে ভারতের শ্রেণীর সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বভিত্তিটী খুব সংক্ষেপে ভূমিকা ভোটের ভোটারি-এর পার্টি।

ভারতের জাতীয়তাবাদের এ ভারতের নিয়ে সংস্থাতের ভোন অবকাশ নেই। অথচ বিদেশী অভিজ্ঞতা বলবতই ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য প্রণালী মনোশিক্ষায় ইংরেজের একান্ত অনুভবে এ ভক্ত হয়ে তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি ও ভোগবিলাসী জীবনধারণ জন্য এ দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে ইংরেজের বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। পার্থীর তা অনুমান নি। তবু এমন ভোটারি এ ভারতবর্ষের ঘর ভাঙার ভারতীয়দের পাশাপাশি ই সম্প্রদায়ের নিয়ে অনুভবের অন্য ভারতীয় ভোটারে এ ভোন নিয়েছিল ইংরেজ আগে। তাদের মনে ইংরেজ প্রীতি বড় বেশী ভারতী ছিল। ভূমিকের ভাষায় They adopted the European image and Prejudices of India and comparing them with their own culture, political and economic superiority, consciously regarded the Indian society as degenerated and in the European sense in need of reform from head to foot. তাদের অনেকেই ই নিয়ে পাশ্চাত্যের ভারতীয় সমাজ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে নিজেদেরকে ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে দূরে রেখে চলতেন। তাদের অনেকে আবার নিজেদেরকে পরিচয় ভোটারের ভারতীয় বলেও মনে করতেন। তাদের একজন লেখী ভোট ১৮৮৩ খৃঃ প্রকাশিত অনুভবিলেন of oriental peoples, only the Parsees could associate socially with the English at the same level. এ অনোরাবলায় পার্সীদের ইংরেজ সমাজে ব্যবহারের বিদেশী এক উৎকৃষ্টতার জন্মটি মূল্য আমা দিত। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয়তাবাদী মিজিয়কে নাইট উপাধিতে ভূষিত করে তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন They my children's children, shall be taught that fidelity to the British Crown is their first duty, loyalty their first virtue. আমাদের তাদের এ মনোভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে কলকাতা মিউনিসিপাল ১৩.১২.১৮৮৮ তারিখে উপাধ্যায়কে এক পত্রে লিখেছিলেন,...I have been much distressed about the views some Parsees are taking that we should dissociate from the Hindus and Mohamedans. Nothing could be more suicidal. We are India's and India is our mother country, and we can only sink or swim with, and as Indian's. If we break with the Indian's, our fate will be that of a crow in Peacock's feathers. The English will in no time pluck out those feathers.

৭

ভারতবর্ষের ভাষায় পরিচয় করে তার অনেকটি এ ভোটারি নাগরিকেই কলকাতিত্ব হয়ে থাকার ফলে ই সকল অনেকি ভাষের প্রকাশ অনেকেরে। অনুরূপ ইংরেজ সম্প্রদায়ের

শুরু হয়েছিল ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে দাদাভাই বেহরামজী বালাজীর এ নগরীতে আগমণের মধ্য দিয়ে। তিনি এসেছিলেন সুরাটের নিকটবর্তী ভগবানপন্ডী নামে জায়গা থেকে।....

.....কলকাতা পর্বের শুরু হয়েছিল ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে দাদাভাই বেহরামজী বালাজীর এ নগরীতে আগমণের মধ্য দিয়ে। তিনি এসেছিলেন সুরাটের নিকটবর্তী ভগবানপন্ডী নামে জায়গা থেকে।...

শুরু হয়েছিল। তাই কলকাতাকে কেউ হিংসুক কাছতে পারে নি। আর্মেনীয়া বণিক ইস্টিয়াপীয় জাতির অন্যতম কিন্তু তাদের উদ্যমে বলপূর্বক নিয়ে যাওয়ার মাধ্যম কারিগরী দক্ষতায়নে অংশগ্রহিতে যায়েছে। প্রোটেস্টেন্ট এর তাদনায় ক্রাক-ইসলাম শহরে জন্মগ্রহণকারীদের প্রচার কিছু লক্ষ্য করা যায়। তারা মাতৃভূমি আর্মেনিয়ের ঐতিহ্য ওপাদুনিয়ে হয়েছিল আরবনাথের নামে তাকে তারা ধরে রেখে ও মর্যাদা প্রাপ্তি এক শতাব্দিমান উন্নয়ন হয়ে। ষোড়শ শতাব্দীতে আর্মেনী বণিকদের প্রথম আগমন ঘটেছিল কলকাতা ও তদ্পার্শ্ববর্তীবী অঞ্চলগুলির মাঝিয়া কেন্দ্রগুলিতে। আনুমানিকভাবেই তারা এসেছিলেন ইরান থেকে। এদের আর্মেনী বণিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে একজন পাশী প্রথম অঞ্চলগুলি আসেন তৎকালীন বাঙ্গালার রাজধানী মুর্শিদাবাদে। ইহাদের কলকাতা পর্বের শুরু হয়েছিল ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে দাদাভাই বেহরামজী বালাজীর এ নগরীতে আগমণের মধ্য দিয়ে। তিনি এসেছিলেন সুরাটের নিকটবর্তী ভগবানপন্ডী নামে জায়গা থেকে। প্রধানত 'ফ্রম রিফেরেন্টস, ফ্রম ইনফেরেন্টস' কলকাতা নগরীর পত্তন হয় নি। পূর্বাঞ্চলের হুগলী নদী তীরবর্তী এ কটিন পরিবেশে দাদাভাই বেহরামজী বালাজী ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। ঐ সময়ে এ অঞ্চলের ইস্টি ইন্ডিয়া কোম্পানির স্বার্থ দেখাশোনার জন্য জন কার্টিয়ার (১৭৬৯-১৭৭২ খৃঃ) গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিচারালী হয়েছিলেন এ তিনটী কেন্দ্রে। বিচারালী বাবসায়ীদের শেষ নামে অভিহিত করা হত। ধন-সম্পদের প্রাচুর্য থেকে তিনিও পরিচিত হয়েছেন বালাজী শেষ নামে। তিনি অবশ্যই কলকাতায় নিজের পরীক্ষের জন্যে আসি পরিবার। এ পরিবারেরই অন্যতম এক সদস্য ছিলেন জন্মগ্রহণী বাঙ্গালী বালাজী। কলকাতার বণিক সমাজে তিনি জন্মগ্রহণী বাবু নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম কলকাতায় এসে আসার যোগাযা দিয়ে যান। পরে ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে নিজের স্থান। তিনি এখানে এসে জন্মগ্রহণ পরিবারের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। তাঁর ছিল এক বিশাল ব্যবসায়িক সৌধস্থ। তিনি চীন দেশের সঙ্গে আফিম-এর ব্যবসাও করতেন এবং তা পরিচালনা করতেন নিজের জাহাজে। তিনি বিভিন্নমুখী বিচুর পোতাশ্রয় (ডকস্) তৈরী করে ছাড়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠানের চীন ব্যবসার জাহাজ তৈরী হত। বাণিজ্য পোত ও চীন প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন বিধুরে তিনি ছিলেন একজন তত্ত্বাবধি। চীন দেশে ব্রিশ জাহাজগুলি চালুদেরও ছিলেন তখনো যথেষ্ট উৎসাহিত। তাহাড়া ঐশ্বর্যশালী জন্য অঞ্চলগুলি-এর সঙ্গেও তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তিনি কলকাতায় প্রথম অভিজাতিক নির্মাণ করেছিলেন আজকের ২৫ নং এজরা স্ট্রিটের উপর। এ বাড়িতেই উদ্বোধন হয়েছিল ১৪-৯-১৮৩৯ তারিখে। তাঁর পরের বাড়ি নাম পাশী হল স্ট্রিট। এ বাড়িটি ভিক্টোরিয়া বন্ধ। এখানে রক্ষিত ছিল কলকাতায় পাশীদের সেকাল সমাজের প্রাচীন মূল-পত্রিকা আদি। তিনিই কলকাতায় তাদের মৃতদের সৎকারের জন্য সর্বপ্রথম টাওয়ার অব সাইলেন্স (Dakhma) নির্মাণ করিয়েছিলেন ১৮২৪ খৃঃ। এর বহু বছর দিয়ে পরে ১৯১৮ খৃঃ মেসোপটেমিয়ের তৈরী করা এর দ্বিতীয় বাড়ি এ অঞ্চলও বাবহার করা হয়। অঞ্চলের বাঙ্গালাদের উদ্যোগে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠায় জমিদার তিনি বিশাল করিয়েছিলেন এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা ইহার বাবহারের জন্য। তা থেকেই এ অঞ্চলের নাম হয় পার্শী বাগান। বিশ্বের প্রথমোক্ত উচ্চয় পাশের পার্শী বাগান স্ট্রিট ইত্যে স্মৃতি আজও বয়ে বেড়াচ্ছে। হিন্দু ও মুসলমানদের মত পার্শী জাতীদের এ সময়ে কলকাতায় সমুহ সেরা ইতি বিরুদ্ধ ছিল। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছান ১৮০৮-১৮৫৮ তারিখে তা এর বিশেষ কারণ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল সমকালের বর্ণনা পত্রিকায় তার উপাদানগুলি এরূপ হয়েছিল, ...কলকাতা এসে পার্শী হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে ইন্দুসমাজ মহাসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছে। ইন্দুসমাজ যেখানে নাম কলকিতকরণ করে সেখানে প্রকাশ করিতেছে এ দুঃখ-দুর্দশাতে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতেছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে ১৮৫১ সালের আদমশুমারে হিন্দুরা জন্মভূমিক ধর্মে কলিকাতাবাসের জন্য ও ১৮৫৮ খ্রিঃ পরিবর্তনের পুরীতক-পরিবর্তনের জন্য যে সাধারণ রাজার ঘোষণা হয়েছিল তাতে তিনি প্রীত হিয়েছিলেন। ১৮৬৫ খ্রিঃ বাঙ্গালোরে তার স্মৃতি তরঙ্গিত ঘোষণা হলে তাতেও তিনি ১০০০ টাকা প্রীতি দিয়েছিলেন। অঞ্চলের ইত্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ইংরেজ স্বজন সরকার তাঁকে আইনসভার সাভিস্যেটর পদে নিযুক্ত করেছিল। কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৭২ খ্রিঃ। এ অঞ্চলের আর এক বিশিষ্ট ইংরেজি সম্পাদক ছিলেন শেঠ জোরাস্টার বালাজি।

পরবর্তীকালে যে সব পার্শীরা ইংরিজির সন্ধানে কলকাতায় এসেছিলেন তাদের অনেকে জন্মগ্রহণ বাঙ্গালার বাবসায়ে নিযুক্ত হন, জন্মগ্রহণ করে, পাটের ব্যবসায় ও চায়ে ইংরিজির প্রতিষ্ঠানে যারে তুলেছিলেন। তারা এদের ব্যবসায়ের জন্য প্রচুর ধন ও মনের অধিকারী হয়েছিলেন কলকাতার সমাজে।

P, 10, 802

কলকাতার পার্শী সম্প্রদায়ের এমন এক পরিচয়ের ছিলেন মেহেরজী। তাদের নিজ উদ্যোগ ছিল কলকাতার কল। এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য সন্তান ছিলেন শেঠ জামসেটজী জেজীভয়। তিনি বাস করতেন ৪৮ নম্বর জানসিং স্ট্রিটের উপর নির্মিত অট্টালিকায়। এ সূত্রেই ১৮৪০ খ্রিঃ তিনি এক লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা ছিল তাদের পরিবারিক উপাসনাগৃহ। প্রথা মুতাবিক পার পিতৃ পত্নী জেসেবাই ও সুযোগ্য পুত্র শেঠ জমসেটজী জি জেজীভয়, স্যার জামসেটজী, শেঠ জামসেটজীর স্মৃতিতে তিনটি ছাদবিশিষ্ট সৌধের এক বৃহদাকার নগরীর বিটিশ অংশে মসজিদ বা আতস জালাবার প্রতিষ্ঠা করলেন। মসজিদটির অবস্থান বউবাজার স্ট্রিটের উপর কলকাতার দিকে কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার থেকে বেরিয়ে যাওয়া ৯১ নম্বর মেজার্স স্ট্রিটের জমি খণ্ডে। এ মসজিদের উপরিভাগে গাঁথিয়ে আছে মসজিদসংলগ্ন অন্যত্র আর এক ঐতিহাসিক স্মৃতি ধারণকারী আসমান-এর ঘড়ি। এ ঘড়ি মসজিদের প্রথম উদ্বোধন অনুষ্ঠিত ১৮-১০-১৯১২ তারিখে। এর সংক্ষিপ্ত নাম মেহেরা দি অসমিয়াটি। মসজিদের প্রবেশ দ্বারের শীর্ষে মসজিদের প্রকৃত নাম উৎকীর্ণ অক্ষরে লক্ষ্য করা যায় "এরদেশ ফুলজীভাই বাহিনজী মেহেরা জমসেটজীর আনুকূল্যে আতস জালাবার ১৯১২।" এ মসজিদটির পরিচালনার ভার পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত এক অছি সমিতির হাতে। আসল সাজসরঞ্জাম মসজিদ, জালজিন ও নিকটবর্তী এক নির্দিষ্ট জলাশয়ের সঙ্গে সংযোজিত। আতস জালাবের জলাশয়টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মেহেরে মেরা মসজিদটির অধিকার রাখি করেছে। প্রবেশদ্বার পেরিয়ে জল দিকে প্রশস্ত চত্বর ও সঙ্গে অতিথি ঘর। চত্বরের উপরে অধিবাসিত। বাইরের দিক দিয়ে সিঁড়ির মেহেরাবের সিঁড়ি ঘরে ওপরে জাওয়ার ব্যবস্থা। ওখানে সুরক্ষিত আছে পবিত্র অগ্নি যা দিনের আলো অগ্নিশিখাকে পবিত্র করার জন্য সারাদিন প্রজ্বলিত এক জন্য আলো রাখা হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ সুবের অভিপ্রেতরূপ নয়।

কলকাতার পার্শী মসজিদরূপে সিঁড়ির স্থাপি ছিলেন মেহেরজানজী। তিনি এসেছিলেন ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। তারপর এলেন তারই এক ভাই ফরদুনজী। তাঁর ছেলে ও ভাইপো ছাড়াও ৪ ভাইপো ও ভাইপোর ছেলে মিলে ১৮ জন অন্তত ব্যবসায়ে যোগ দিয়ে প্রচুর সম্পদ অর্জন করেন। তাঁদের পার্শীসুলভ ঔদার্যে তাঁরা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। ফরদুনজী ১৮৩৩ খ্রিঃ মারা যান। তাঁর একটি স্মৃতিফলক আছে সেন্ট জনস চার্চে।

মহাশয়ের কলকাতায় বসতি নিয়ে ছড়ানো সংস্কৃতির অনুসন্ধিৎসু মানুষদের জন্য। তাঁর একটি 'হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া' ও রয়েছে। তাঁর একটি ছবি আছে এক পার্শী শিক্ষালয়ে যেখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে, ও কি ই। তাঁকে এক সময় বলা হত লিং অব ইন্ডিয়ান ডিপ্লোমা ইন্ডাস্ট্রি। এক ইংরেজ অনুবাদী মানুষ যেমনটি ই সম্ভবত একজনই বিদেশে এ ধরনের চেষ্টার ছিল। পার্শী সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় কলকাতার জন্য তিনি কলকাতায় একটানা দুবার দুটি বিদ্যা করিয়েছিলেন। কলকাতার সংস্কৃতির এক বিশেষ অধ্যায়ে লালন করে আছে তাঁর ইতিহাসিক কৃতিত্বের স্মরণিকা। তাঁর এ স্মৃতি আজও ওদের এলাকা জন্য কলকাতাবাসী এ সম্পর্কে এই বিষয়ের কিছু জন্য করিনি। আমরা তবে তাদের শেষকার ছাপলিপিতে স্মরণে এই বিষয়ের কাজ যেখেছি ছাপলিপি।

কলকাতার মেহেরি ইতিহাসে খুঁজিয়ে মেহেরি এক ছাপলিপি সম্পর্কে মাধ্যমে ১৭৭৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় পৌঁছেন পার্শী সুরি মুলেছিলেন। তার তিন একন বছর পরে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে একজন ব্রাহ্মণীয় পৌঁছেন হিসাবে সর্বপ্রথমে নিযুক্ত হয়েছিলেন কলকাতায় এক পার্শী উপযোগী পুরুষ ছাপলিপি কলকাতা। মূলতঃ তাঁরই উদ্যোগে ৩৭ নম্বর পৌঁছেন এবং এর পৌঁছেন ছাপলিপি সম্প্রদায় মহাশয়ের ঔরসি করেছিল তাদের কলকাতার নামকরণে অন্তর্ভুক্ত অর্থপৌঁছে। ৫১-১০-১৮৮৭ তারিখে এক আদালতে তারা ঐ মহাশয় কলকাতায় নিজের পার্শীয় স্থাপন করেছিলেন কালকাটা জোরাস্ট্রিয়ান কমুনিটিজ রিলিজিয়াস অ্যান্ড চ্যারিটি ফান্ড বা কালকাটা মহাশয় নামে সাধারণভাবে প্রচলিত।

১৮৮৭ খ্রিঃ ৩৪ নম্বরের পার্শী মেহেরজী ছিলেন ৪৯ বি, পর্যন্ত। তিনি প্রতিষ্ঠা এজেন্সিজের প্রথম বিদ্যার বিজ্ঞানের মধ্যে 'মেহেরজী' অনুষ্ঠানী তাঁদের মেহে আছে। নতুন বছরের ১ তারিখে তিনি তাঁর ও কর্মচারে অভিবাদী হয়েছিলেন ইন্ডিয়ানদিন। এরা সম্প্রদায়িক ব্যবসায়ের প্রথম ও প্রধান মহিলাদের মুক্ত ছিলেন। তাঁর এরা মহাশয় কলকাতায় ছিলেন। তিনি ও মহাশয় কলকাতায় বহুসংখ্যক সন্তানের 'মেহেরজী' ও 'মেহেরজী মহাশয়' পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এরাই অনেকে পুনঃ মেহেরা বহুবচনে ও ঐতিহ্যগত প্রথার মতিন হয়ে ধরে মেহেরজী।

এসবের প্রথম ইন্ড-ফ্রান্সের যৌথ ব্যবসায়ে ইন্ডাস্ট্রের সূচনা হয়েছিল ও ব্যবসায়ের মেহে কয়েকটি ব্যাপারসহীর প্রতিষ্ঠান। এরপ ইন্ডাস্ট্রের মধ্যে ছিল ইন্ডিয়া মাত্র ও মধ্যে সাথে মেহে ১৮৯৯ ব্যবসায় পরিচালক।

আধুনিক কলকাতার ইতিহাসে পার্শী ব্যবসায়ে মেহে ইন্ডাস্ট্রী এলগার্ডএজেন্স নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৫৩-১-১৮৮৭ তারিখে তাঁর জন্ম। কলকাতায় তিনি মৈত্রিক ব্যবসায় মেহে। লিন্ড্রোজের তৈরিতে কারখানার তত্ত্বাবধান করেন। তিন-চার বছর পরেই তাঁর প্রতিভার যথেষ্ট মেহেপাটির মোড়া ঐন্দ্রজালের মেহেপা বিশ্বত্ত বিশ্বাস ঐন্দ্রা পার্শীর নামে পরা হত। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তি। পরিচয় সম্পর্কে জীবন তাপসের নথা নিয়ে ঐন্দ্র-ঐন্দ্রনা রচনা করে গেছে তাঁর জীবনের মূল গ্রন্থে। ৪২ নম্বর মৌলবী মেহেরিয়ে পুরটি ছিল তাঁর কর্মস্থলী। ১৯৪৭ সালে এক লাখ পত্র সম্পাদন করে ইন্ডাস্ট্রী তাঁর ব্যবসায়ীদের অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্পত্তি কলকাতায় নিজের পার্শীদের দান করে যান। ১-৪-১৯৭১ তারিখে তাঁর কলকাতায় মৃত্যু হয়। কলকাতায় পার্শীদের নিজস্ব মেমর সম্পর্কে অন্ত ছিল না। তিনদিন ধরে তাঁর অন্তরঙ্গদের কাছে আসছিলেন তারা। ইন্ডাস্ট্রীর ৪২ নম্বর মৌলবী মেহেরে অতি অনেক উপর পড়ে উঠেছে সুদৃশ্য বহুতল ভবন। তারই নিচের তলায় নির্মিত হয়েছে তাদের বহু আকর্ষণীয়ত

পড়েছেন তখন। এ সুযোগে সংগীতজ্ঞদের অভিনীত তাদের জনপ্রিয় কয়েকটি রেকর্ডের অনুষ্ঠানটির ঘিরিলিনে যারা গানটি তাদের শুনুন। গুরুত্ব ঐতিহ্যের যাতায়াতের পথ ধরে বেঁচে থাকে অনেক কালের সমৃদ্ধতর থেকেছে এমনটি সংস্কৃতির শোনাবার জন্যে কোনো ওর কিছু ইতিহাস ছিঁড়ে রেখে পড়বে। তাই ৫৬ জন, শ্রোতা কি বাজনা উপর যোগাই করা হয় নিশ্চিত ভাবে পোল না। মনে হল সম্পর্কটি টিকিয়ে ৭৫ জনটুকু ও শর্তে অভিন্ন এক পোরফরমে। অথবা তাদের কেউ এ বিষয়ে আমাদে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারলেন না।

৩

তাদের অবসরবিনোদ জীবনে কলকাতার পার্শী সম্প্রদায় ইংরেজ গায়কদের বিকল্প উপাদান প্রতিযোগ জন্য নিজ নিজ বুদ্ধিতে সাহেবদের উদ্ভাবিত্বের (পৌত্তলিকদের)। ঔপনিবেশিক কলকাতার ব্যাবসায়িকতা বা ইংরেজ শাসনের শ্রীবৃদ্ধিসাধন হওয়ায় কারণে ঐকা পূর্বীর জনসাধারণের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন না। শেষ স্বাধীন ভাবে কলকাতার ঐশ্বর্য সমৃদ্ধতর হয়ে শহরটিজন সামরিকভাবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা আসত্ত্ব। তাদের ইংরাজে তেমনভাবে ভাঁটা পড়েছিল। তবুও তাঁরা কলকাতাকে মনের টানে আঁকড়ে রয়ে একদল আছেন এ কলনবর্ষীদের তার সুখ-দুঃখ, সুখের-অনুকরণের লক্ষ নিয়ে। তবে পূর্বের সেই বৈচিত্র্যেজ্জ্বল ইতিহাস এখন তাদের নিকট এক স্মৃতি হয়ে। কলকাতার সে সুখ পার্শীর বিভঙ্গিতে তারা বিশ্লেষণের স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ করে এক মুহূর্তেলী উজ্জ্বল সমন্বয়পেক্ষীয় তা যা প্রয়োজন তা সাই বাদে নিয়েছিলেন একদা। অতীতের স্বাদের রূপে তা এখনও নীহারিত আছে। কলকাতা ভবনানে আজকের গুরু নানক হোতের উপর বসিয়ে তাদের পার্শী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৮ খ্রিঃ। লাভ পূর্ব ভারতে এটি তাদের সর্বপ্রথম স্কুল। তাদের নানা সামাজিক অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক নৈশভোজের কেন্দ্রস্থল হিসেবেও তা ব্যবহার হয়ে থাকে। ২৬ জন প্রযুক্ত সভায় ছিটে সভাসেটী নিয়িয়েস-এ তাদের

সম্পূর্ণ সমৃদ্ধতর শর্তে ৬৫ ভাঁটায় পারসের জন্য পড়ে হোক সাহেবেরা বিভিন্নকাল বাসস্থান ট্রাস্টিটিয়ে তাদের সম্মেলের প্রতি দর্শিত্ব বাসস্থানে এক উপায়ন। এ বাড়িতেই সমৃদ্ধের প্রমুখ সম্পাদনের যে ফল দুতের উদ্দেশ্য প্রার্থনা করা। তাদের অভিজাতের সম্পর্কিত সংগঠনে তাদের উদ্যোগে ১১২৯ খ্রিঃ ফ্রান্সিস প্রতিষ্ঠিত বা প্রথমটি সম্প্রদায়টিকের ট্রি ভবন। এর উদ্দেশ্য ব্যাবসাদের ও তাদের সম্পর্কটি তাদেরে নিয়োগে প্রথমে ইংরেজিদের অনেকের ইতিহাস কথা সাহায্যের ৪৫ বছিয়ে দেওয়া। যে যেসব সাহায্যের পার্শী ঘোষিত এ সংস্থার সেবা ৬৫ঘর যোগ্য। জাতিগোষ্ঠীর পার্শী সম্প্রদায় ও শিক্ষা সম্প্রদায়ভুক্ত পারসেদের অধিবাসী ইংরেজে নিজেই মৌত্তেজ এক বিশেষ উৎসব। যা ভুল করেছেন উৎসব। এ উৎসবের পুরুষ নাম ভুল জরথুস্ত্রী মৌত্তেজ, যা ভুল পারসা ভুখণ্ডে হলে অসংখ্য সুন্দর ঘটনাস্থান থেকে। তবুও এ উৎসব পার্শী যা পারসেদের মুসলমান উৎসবেরই শর্তে এক আনন্দের উৎসব। পারসেদের ইতিহাসের এক বিশেষ ঘটনা মৌত্তেজ এ প্রসঙ্গে উল্লেখিত। তাদ অভিবাসীরা অনেকেই ৭৩০ খ্রিঃ আনুমানিক ইসলামের আগমনের ফলে থেকে মুক্তি পাবার। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেও তারা নিজস্ব সংস্কৃতি বিসর্জন দেননি। তারা হিসেবে তারা ফার্সী ভাষা করে ভাষাটি গ্রহণ করেননি। মৌত্তেজ উৎসব ও ধর্মনিরপেক্ষের মেষ শাহনামার ছাড়িয়ে উৎসব। এ উৎসব কলকাতার আগমন মুসলমান করে, দিনাং ভারতে নিজ অনুকূলে। পারসেদের এ উৎসবের মুসলমান ফার্সী-পুরুষের অনেকের দুঃ ভারতে করে পূর্বে। তখন পারসের রাজত্ব জরথুস্ত্রের পেশাদারীয় ধর্মের সমর্থন ছিলেন। ঐ দিনই তিনি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। মৌত্তেজ শব্দটি সংস্কৃত এ ফার্সীর এক অদ্ভুত সমন্বয়। এর সংস্কৃত শব্দ হচ্ছে অর্থ নতুন বাস অন্যদের ২৩ যেমন আমরা বলি ২৩জোয়ান। মোক অর্থ দিন বাং উৎস ফার্সী যা একই অর্থে হিন্দী, উর্দু ও বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতবর্ষের পার্শীরা অতি আনন্দ উল্লাসে এ উৎসব পালন করে থাকেন। উৎসবের

আগমনের প্রথম উপকরণ সেদিন জাতীয় পুরাণী ভিত্তি ও পরিধানের বৃদ্ধদের হাতে তৈরি ফোন সঞ্চার ভিত্তি হয়। ঐ সময় নিউইয়র্কে সুলভ তাদের পার্টীর আয়োজন উকে বেরোয়। তাঁরা নিজেদের মধ্যে নানা উপহারের আদান-প্রদান করে থাকেন। এসব উপহারে সেখা থাকে অভিনন্দন, আশীর্বাদ, আনন্দবার্তা—উপহার প্রাপকের জন্য সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রার্থনা করেন। এদিনে তারা বাসে বাসে উপস্থিত হয় অগ্নিমন্দিরে। নানা মনোরঞ্জন অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেন তারা। মৌত্তেজ উৎসবের অঙ্গ হিসেবে মনোরঞ্জনের নিমিত্ত কলকাতার পার্শীরা ১৯০৭ খ্রিঃ গড়ে তুলেছিলেন যা আজকাটা পার্শী অ্যামেচার ড্রামেটিক ক্লাব। কলকাতার তাদের যোগাযোগে বন্ধনের জন্য বিশেষের মুখপত্র ইউরিয়ন জরাস্ট্রিয়ন এখনও প্রকাশিত হয় যার নাম 'জরথুস্ত্রি' ও 'জরথুস্ত্র মেজার'।

তাদেরবর্ষের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশঃহ্রাসের বয়। তার নানা কারণ। প্রথমের ঐতিহাসিক কারণটি হল ১৭৭৭ খ্রিঃ তাদের পারসেদে জনগণিবার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। ইট্ট নামের জীবনযাত্রা, স্ত্রী স্বাধীনতা, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ও বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ যেটু নিত্য জন্মের হার খুবই কম তাদের পরিবারে। মোজাইয়ের পার্শী পারসেদের সম্পাদক আপুন এবং মেপাইয়ের বন্ধুর অনুপায়ে যদ্ পূর্ব থেকেই একটি অথবা দুটি সন্তান নিয়ে নিতিতে পারিবারই পার্শীদের সমাজে স্বাভাবিক নিয়ম। তাই আনুপাতিক হারে তাদের জনসংখ্যা হ্রাস কলকাতাসহ ভারতবর্ষের সব জায়গাতেই লক্ষ করা যায়। শেষ স্বাধীন হওয়ার পরে কলকাতার তাদের অবস্থানে নিশ্চয়ে অনেকেরই প্রথমে নিরুল হয়ে পড়েছিলেন। কলকাতা থেকে তারা অনেকেই ঘর ঘর আত্মীয়-স্বজনের জন্যাকাঙ্ক্ষি, ব্যাবসায় ও বৃত্তি অবলম্বনের জন্য কেউবা নবদিল্লিতে চলে গিয়েছিলেন। অনেকে ভেবেছিলেন স্বাধীন ভারতবর্ষে তাদের আর কোনও ভবিষ্যৎ নেই। তাই ইংরেজেরা বিশেষতঃ ইংলান্ড, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায়

যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে গিয়েও মিলিয়নিয়ার হয়েছেন। পরবর্তী পর্বে উপকরণটির ব্যবহারবিধিও তারা এখানে শুরু করেছেন। কলকাতায় পার্লারও তারা প্রতিষ্ঠিত করেছি। বিশ্বজিৎ ও টাপারী দুজনে দুবাইয়ে এখন অনেকেই সাধারণে অপেক্ষা করে আছেন বিদেশ যাত্রার জন্য। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৯৮৫ খ্রিঃ কলকাতার তাদের জনসংখ্যা ছিল ১২২০ যা বিগত ছিল ৪৪৮টি পরিবারের মধ্যে। বর্তমানে এ দেশগুলোর তাদের জনসংখ্যা প্রায় ৭৪০ জন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখা গেল তারা অনেকেই ভালো আছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৪৩টি হিন্দু পরিবারের সঙ্গে বিয়ে সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এখন বিদেশে তাদের প্রতিষ্ঠানের জনসিদ্ধান্তের কোনও পরিবর্তন হয়নি। এর কারণ হিসেবে একজন বললেন তারা সব কাজেই সফলতাকে গ্রহণ করেন, তাই ধর্মান্তরকরণ তাদের ধর্মে ও সমাজে নিষিদ্ধ। তাদের সমাজে বালককে টাকুক দেওয়ার কোনও প্রথা নেই। কোন পথে তার পরবর্তী নির্ধারণ করতে নিয়ে ঘড়িতার অভিভাবকের নির্দেশ প্রস্তুত দিলে তিনি প্রথমেই বস্তু জায়গায় অর্থিক কারবার পরিমাপ করবেন। যদি তাদের ভোজনালয়ের তুলনায় কম হয় তবে তার উন্নয় হবে অন্যত্র খেয়ের সমান ভোজনায় করতে পারলেই সে তার পরি প্রার্থী হতে পারবে। নারী শিক্ষা, নারী স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতার ব্যাপারে আজ এঁরা এখন প্রায় সব সময়েই নিয়ে আছ সম্প্রদায়ের দিয়ে নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হলেও তাদের বিবাহানুষ্ঠানের একটি অন্য দিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আশীর্বাদের একটি বস্তু পড়ার খুব সংস্কৃত ভাষায়। মৃত্যুর পর প্রার্থীর হলে প্রার্থনা ও তার পেছে কলকাতের নৈবদ্য নিয়ে শেষ হয় পারলৌকিক ক্রিয়া। জানা গেল কলকাতায় তাদের পুরোহিতদের বড় অভাবনা। তারা আসেন বোম্বাই থেকে। তাদের অবশ্য খুব ভোগেন। জনসিদ্ধান্তের ঠিক নিয়ে তারা খুবই সৌয়। অবশ্য অবশ্য গেল কলকাতা জাতীয় অন্যান্যদল তাদের থেকে তার ঠিক আজির উপরের উপরের সেই-পিছে ডাইরিক্ট নিয়ে উপনিবেশের জন্য একটি ভোট

আসন খুব চাঁদা। জিজ্ঞাসায় জানা গেল তা পরিষ্কৃত সূত্র, তাদের ট্রাস্টিমণ্ডলের দ্বারা তৈরি। বালাবন্ধুর লক্ষ্য অর্থেই পূর্বোক্তের এদের খুব কারণ নিজের পরিষ্কৃত উপনীত তৈরি করেছেন। আজ অবশ্য সে প্রথা নেই। জানা গিয়ে আগ্রিবেশিতে ও পার্লারের প্রবেশ নিয়েছে কারণ হয়েছে বিবাহ হতে অতি অপরিচিতের হৈচৈ বন্ধুবিহিত হয়ে। তবুও আশা ছিল অন্তর খুব থেকে প্রতিষ্ঠিত এ দরজা পরিষ্কৃত্বজাতী অনন্তস্থানের এদিকে আসার প্রথা জানাব। প্রায় পঞ্চাশ বছর না। পুরোহিতের প্রায় পরিষ্কৃত পেয়েছে সংক্ষিপ্ত আকার বিবাদ বিদেশ বৈবাহ বৈবাহ। এ তাদের অর্থের নির্দেশ, খুব থেকেও তাঁকে দর্শন করতে পারছে না অন্য ধর্মের লোকেরা। আমার উপরে এঁরা নিষিদ্ধ প্রথম বাণী পর্যন্ত স্পর্শ করতে দেওয়া হয় না।

ঘটনার কলকাতায় পুরিচিতদের নিকের তাদের তিনিই একজন হলেন সুপরিচিত সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতশিল্পী শ্রী ঠি বালকাল। তাঁর এখন বয়স হয়েছে। সুদূর মরীচে কলকাতায় এসেছিলেন বোম্বাই থেকে, আর যাননি। কলকাতাই তাঁর কার্যক্ষেত্রের কর্মক্ষেত্র। বাবসায়ী জগতে তিনি এক অতি সম্মানিত আসন লাভ করে থাক করছেন নিজের ব্যবসায়ী সাম্রাজ্য, অনুরূপ কর্ম লেখ-এ, এরেলিনি (আজ সুযোগ অধিক) ক্রোমহলের সহিমর্টে। তাঁকে পুরুষশ্রীন-রহস্যময় দেখেছি, তাদেরি তাঁর ব্যবসায় করা। দেখা করে তাঁর জানার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। সেদিন তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হলাম, সেদিন তাঁর স্ত্রীর অসুস্থতা হেতু তিনি তাঁকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন বলে তাঁর স্বজন সাক্ষাৎকারী আমায় বললেন। পার্সী সম্প্রদায়ের আরও একজন কলকাতার ব্যবসায়ী নিবাসী হলেন ডেকরেটিভ সাপ্তাহিক বা মেয়ো-সম্পাদন পত্রিকার সম্পাদক শ্রী পি আর ইরানী। তাঁর বিভিন্ন আপোষিকতার আদর্শ আমাদের মর্মস্পর্শ করেছে। আর একজন কলকাতাবাসীর নামও আমরা অবশ্যই স্মরণ করব এ প্রসঙ্গে, তাঁরা তিনি পিলিমির ইন্ডিয়ান কমার্স-এর অধিনায়ক হিসেবে কাটিয়ে গেছেন কলকাতার সেই উইলিয়ম দুর্গে এবং ১৯৭১-এর যুদ্ধে তিনি তাদেরি প্রেসিডেন্সীয় সার্টিফিকেট হিসেবে অপারেশন সাহিত্যানের সম্পর্কে সংযোগ উদ্যোগ বিশেষভাবে তাঁর নেতৃত্বের দ্বারা। অবশ্য জীবনে বয়স তিনি বোম্বাই বসবাসে, তবুও তাদের তাঁর স্মৃতি রোজদুর বয়ে কলকাতায় পার্সী সম্প্রদায়ের গড় করছে রিয়ে—তিনি হলেন তিন বাপাস মাস মানেকশ।

কলকাতায় আজ সংখ্যায় এত খুবই কম। নানা বৈশিষ্ট্যে তবু কোলাবাগানের বড় বড়িয়ে আছেন সুখ-দুঃখে। তারা একে অন্যের সঙ্গে সংকটে হলে বিপদ সম্মেলনে আলিঙ্গন করেন 'সাহেবজী' বলে। একদের নিজেই তারা নিজ নিজ কর্মে স্বাতন্ত্র্যিক নিষ্ঠার কলকাতায় আর্থিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরিয়ে রাখতে। তাদের তাঁদের পূর্বপুরুষ আর্থিক সামর্থ্য আজ আর নেই। কলকাতার তাদের সংখ্যা ক্রমিকহারে এখন সাম্প্রতিকীতি আর ছাট পরিবারে ছোট-বড় ব্যবসায় পেশায় নিযুক্ত রয়েছেন। তাঁদের এ মানসিকতার বাধা করতে গিয়ে এক পার্সী মহিলার তাঁর এক প্রবন্ধে বলেছেন (যিনি এক এক হিসাবমেক—এ ক্ষেত্র আর যা তোল আর না পার্সীক ছিল আসলটা) They continue to bear even today the love for Calcutta and to be a part and parcel of its prosperity as well as miseries and they feel continuously attracted by the prospect of discovering "the secret behind the smell." পার্সিদের, বিশেষতঃ কলকাতার এ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কলকাতার রাজনীতিতে স্বাতন্ত্র্যিক কারণেই সক্রিয়তার অভাব নেই। ইতিহাসের আকর কালো প্রবল অবোধ্যেন তাদের জীবন ঐতিহ্য কিন্তু তারা ইতিহাস হয়ে যাননি, আমার সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠীর পরিবেশনীতে যান করেন তারা বিসর্জন দেন নি তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য। কলকাতার সমান জীবনধারায় তারা এ সম্প্রদায়ের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—ঠিক কতো বর্ণাঢ্যতার ঐকতান তাদের সুর সৃষ্টিতায় একটি ভারত বয়ে যায়।

রুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে
কলকাতা পৌরসংস্থার প্রকাশিত বই পড়ুন ও পড়ান

ছোটদের জন্য

আমাদের বিদ্যাসাগর

আমাদের সুভাষচন্দ্র

শিক্ষাবিদের জন্য

মুক্তির সংগ্রামে ও কলকাতার দান

C. V. Raman Birth Centenary Issue

Anthology Number 1924-1947

Netaji Birthday Com. Vol. Cent. eve-tribute

C. M. Gazette-Netaji Centenary Issue

Mayors of Calcutta

Calcutta-a Glimpse

Calcutta-a set of Pictures

Calcutta at a Glance

C. M. C. Year Book

Compendium on Assessment & Collection

Building Permit Manual ২০০.০০

কলকাতা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে পুরতথ্যসমৃদ্ধ পুরসভা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং
রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সারা বছর পাবেন।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

১, মহা স্ট্রিট, ৩য় বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০ ০৬৭

সামান্য কিছু সতর্কতা

ম্যালেরিয়া

তাড়াতে পারে

- জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করান ও পুরোমাত্রায় ওষুধ খান
- ম্যালেরিয়ার মশা কেবল পরিষ্কার জলে জন্মায়—খোলা চৌবাচ্চা, হাঁড়ি-কলসি বা ড্রামে ধরা জল সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন পরিষ্কার করুন
- বর্ষার জল বাড়ির ছাদে বা আনাচে-কানাচে জমতে দেবেন না
- জলের ট্যাঙ্ক ঢেকে রাখুন যাতে মশা ঢুকতে না পারে
- শোয়ার সময় অবশ্যই মশারি টাঙান

॥ ম্যালেরিয়া জীবন নেয় সাবধানের মার নেই ॥

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসভা

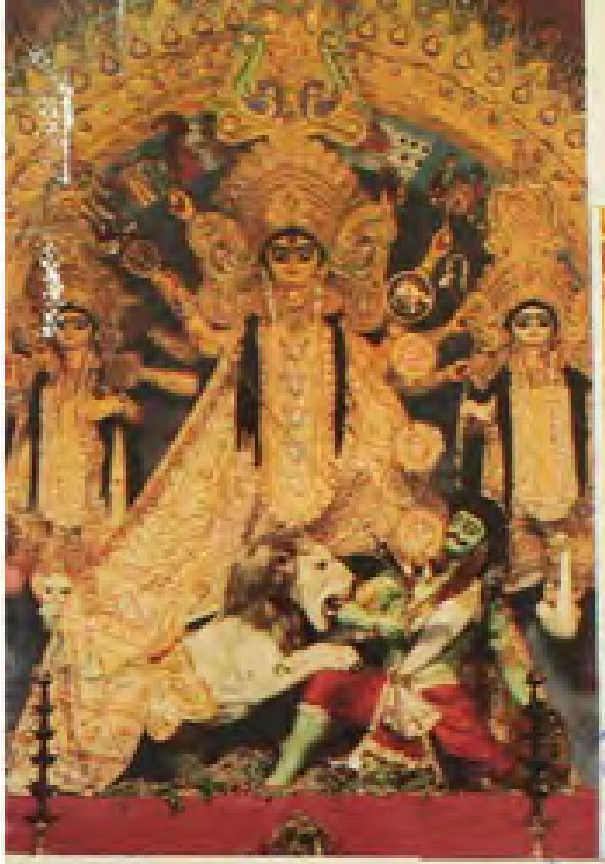

কলকাতা পুরশ্রী

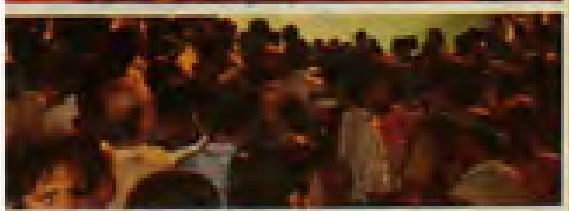

বন্যাদুর্গত মানুষের সাহায্যে
মেয়রের ত্রাণ তহবিলে
মুক্ত হস্তে দান করুন

মেয়রস রিলিফ ফাণ্ড
কলিকাতা পৌর সংস্থা
৪ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

কলকাতা পুরশ্রী

৭ম সংখ্যা ☐ ১৫ বর্ষ ☐ ২৭ অক্টোবর, ২০০৩

বাঙালির জীবনে বছরে মাত্র তেরো পার্বণ হলেও দুর্গাপুজার স্থান অনন্য। কলকাতার ইতিহাসের সঙ্গে দুর্গাপুজার ইতিহাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। এই সংখ্যায় তিনটি লেখার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে কলকাতার দুর্গাপুজার বৈশিষ্ট্য।

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয় ☐ ২

সপ্তমে বাজার দুর্গোৎসব / ব্রজগোপাল মণ্ডল ☐ ৩

কলকাতার 'বাবু'দের দুর্গোৎসব / কালিদাস হালদার ☐ ৬

শরৎোৎসবের মূলসুর/ পলাশ আঢ্য ☐ ১১

শেষ্টরা বীরেন্দ্রনাথ শাসমল ☐ ১২

পৌরসংস্থার গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণে আধুনিক ব্যবস্থা এখনই চাই / শ্রীলেখেশী গুহোরিয় ☐ ১৩

তেরো তেরো টাকা খরচ করে বৈদ্যুতি জলপ্রকল্পের উদ্দেশ্য সার্থক করে তুলতে চাই আমাদের নাগরিকবৃন্দের ঘরোয়া আলোচনা/ শোভন চট্টোপাধ্যায় ☐ ১৫

নতুন পৌরবোর্ড চায়, নাগরিকরা অন্তত তথ্যের নাগরিকদের কাছেই যাবে পৌরসভার দায়বদ্ধতার / অরুণেশ খাস ☐ ১৭

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রাপ্য ৬৭ কোটি টাকা / রামরঞ্জন গুপ্ত ☐ ১৯

পৌরব্যবস্থাগুলিকে লাভজনক করতে চাই / শামসুজ্জামান আনসারি ☐ ২০

ফেরা-পাখী ও পৌরসভা / অশোক সেনগুপ্ত ☐ ২১

পৌরসভা সংবাদ ☐ ২৩

প্রচ্ছদ চিত্র ☐ পলাশ আঢ্য

সহযোগী অরুণকুমার সাহা

মূল্য ১ টাকা

সম্পাদক অমলেন্দু ভট্টাচার্য

'কলিকাতা পৌরসংস্থার মাসিক মুখপত্র পুরশ্রী, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, ১ ইম স্ট্রিট, ৪র্থ নিউইয়ার্স (৪র্থ তলা), কলকাতা-১০০ ০০১ হইতে অমল মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং অনুশ্রী আর্টস্ প্রসেসিং লিমিটেড কর্তৃক ১৮৬, বিবেকানন্দ মুখার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-১০০ ০১২ হইতে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

প্রকৃতিতে এবারের আগমনীর সুর
বিষাদময়। পশ্চিমবাংলার উপরাঞ্চলে
শতশত গৃহহীন, নিরন্ন মানুষের দুঃখে যখন
চারপাশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে তখনই
আবার উৎসবের ডাকে কাঠি পড়েছে।
দুর্গাপুজোয় বাঙালি মেতে উঠেছে এটাই
সাধ্যে। কলকাতায় পুজো নিয়ে মাতামাতি
কিছু কম ছিল না। আমাদের এই সংখ্যায়
তাই তিনটি লেখার মধ্য দিয়ে রাখলা তথা
কলকাতায় দুর্গোৎসবের পুরনো ও নতুন
চেহারাকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

শত সংখ্যার মত এই সংখ্যাতেও
বাকী মেয়র পরিষদ সদস্যেরা কিভাবে
কাজ করতে চান, বা কি সমস্যার
মুখোমুখি হতে হচ্ছে সেই কথা
জানিয়েছেন তাঁদের লেখায়।

সাবেক বাংলার দুর্গোৎসব

ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল

হাজারটি বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলার মানুষ দুর্গাপুজো করছে। পলাশির যুদ্ধে হারার পর কলিন ক্লাইভ মিরজাফরকে মসনদে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। তখন ১৭৫৭ সাল। তবু ক্লাইভ শঙ্কিত। কেননা গুপ্তচরেরা খবর এনেছে সেনাপতির মনে ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দল। এ ভয় তাদের ছাড়া আর কারো মনে নেই। তবু ক্লাইভ মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে রাখা হয়তো অপরিহার্য মনে করেছেন। কিন্তু হিন্দুদের এই ভাবে দুর্বল করা যায়। মূর্তিটা সিরাজদ্দৌলা। পাছে অভিশাপে ফল ফলে সেই ভয়ে তখন ক্লাইভ, মীরজাফরের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছেন। ক্লাইভকে নবকৃষ্ণই বলেছিল, চিন্তার কোনো কারণ নেই। হিন্দুদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। এই পুজো আসি একবার বেশ জাঁকিয়েই করায়। সাগরি শুধু পুজো দেখতে আসবেন। খুশি হবে হিন্দুরা।

হয়ও তাই। ক্লাইভ। আর তার খুশামোদকারী অভিজাত নবকৃষ্ণ হলেন মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব। সিরাজের মৃত্যুর খোশখবরের ভাগ পেলেন তিনি। তবু মুখবদলে তক্ষুণি নবকৃষ্ণ দেবের শোভাবাজারের রাজবাড়িতে দেবী দুর্গার আরাধনা। রাজবাড়ির কর্তাদের বংশধরদের জবানী, তাদের পরিবারের দুর্গাপুজোর প্রবর্তন ১৭৫৭ সালে হলেও ১৮০৫ সালে এইরকম ঐতিহাসিক গুরুত্বের মধ্যে দিয়ে নতুনভাবে পুজোর সূচনাই উল্লেখযোগ্য। রাজা নবকৃষ্ণ দেবের আমল থেকে যে ধাঁচে প্রতিমা গড়া শুরু হয়েছিল আজও তা হুবহু আসছে।

কলকাতার পেশে তখনকার দিনের রাজা, মহারাজা, জমিদারদের দুর্গাপুজোর ইতিহাস কমবেশি এইরকম ছিল। কোথাও লোকের বলদর্পী হয়ে দুর্গাপুজোকে রাজনৈতিক ইংরেজদের স্বার্থে কাজে লাগানোর প্রচেষ্টা। কোথাও নিজের মানুষদের ইংরেজদের হাতে তুলে দেওয়ার নেহাতে ব্যবসা, এবং সেই সুবাদে পাওয়া ইনামে ঘটা করে পুজোর প্রচলন ঘটিয়ে জনসমক্ষে বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু বেদ-পুরাণে বর্ণিত এই দুর্গাপুজোর কারণ সম্পর্কে কী কিছু পাওয়া যায়? বৈদিক যুগে প্রথম দেবীর আরাধনা হয়েছিল আর্য ঋষিদের প্রাণে, জ্ঞানে, গানে, উৎসবে। হাজারদিনের কঠিন তপস্যায় আর যজ্ঞে ঋষিকুল সেদিন মুক্তির পেয়েছিলেন, এই আকাশ, জল, মৃত্তি, তেজ, মরুৎ, পাহাড়, পাহাড়, পশুপাখি, কীট-পতঙ্গসমৃদ্ধ অনন্ত সৌন্দর্যে ভরা প্রকৃতি তার সৃষ্টি, তার দান ; সেই মহাশক্তিকে। পুরাণে আছে, দেবীর অভিষেকে সৃষ্টির আদিতে মহাপ্রলয় ঘটেছিল। বল হয়েছিল অত্যাচারী দুই অসুর মধু ও কৈটভ। আর এই দুই বিশাল দৈত্যের পচিত্রে মহাকালরাত্রির অপরূপ রূপে পৃথিবীর সৃষ্টি। দেবীর দ্বিতীয় অভিষেক জয়ন্তীতে, দেবতাদের বিপদ-উদ্ধারে। বল হয়েছিল শুম্ভ, নিশুম্ভ। দেবীর চতুর্থ অভিষেক রাজা সুরথ ও বৈশ্য সমাধির পূজায় মানুষের পরিচয়ে। অর্থাৎ অন্তরকে পাপে ভরা শত্রুকে প্রতিহিংসা জানাই খুব খুব ভরে এবং আজও এই বৈজ্ঞানিক আধুনিক যুগেও চলছে তার আয়োজন। অর্থাৎ এই শারদোৎসব। অবশ্য উক্ত রাজা-মহারাজাদের দুর্গোৎসবের ইতিহাসে এসবের অনুভূতি কতটুকু। তবু রাজা-মহারাজাদের প্রতি, তাঁদের সেই অতীত দিনের উৎসবের প্রতি আজও মানুষের অপার কৌতূহল। কারণ হয়ত তাঁদের উৎসবে আন্তরিকতার প্রচুরতা আর অতিনিবদ্ধ ছিল বলেই।

সে-সময় পেরোপলকার রাজবাড়ির দুর্গাপুজোয় যেন্ত্র আর নিখুঁত আয়োজন ছিল। দেবীর বরণের জন্য তৈরি হয়েছিল বিশাল সোনার সিংহাসন। সর্বত্রে আছে সোনা-রুপোর কাজ। আশ্বিনের নবমী থেকে দুর্গানবমী পর্যন্ত এক পক্ষকাল ধরে পুজো চলার সময় প্রতিদিনই নয়, পুজো আছে বারোমাসের আসর বসত। ভোগের প্রকার ভোগে রাজবাড়ির নিজস্ব রান্নাশালে আজ হয়ে। আয়োজনের সেই আড়ম্বর আজ নেই। রাজবাড়িতে দেবীর অবতেহণের ব্যবস্থা ছিল না। তাই পাল্কি, পল্কা, ঘোড়ায়, সেটিতেলি প্রভৃতি হয়েকরকম মিটিয়োগে দেবীবরণ প্রথা ছিল। এক একটি মিটিয়োগের প্রয়োজনই ছিল প্রায় ২০-২৫ জোড়ার মতো। পুজোর দিনগুলোতে সারা রাজবাড়ি আলোর রোশনাই আর আতরের গন্ধে ম-ম করত। আমন্ত্রিত হতেন সে-সময়ের বিশিষ্ট ইংরেজ রাজপুরুষেরা, রাজা, মহারাজা, জমিদার এবং জ্ঞানীগুণীজন। শেষ পর্যন্ত কি মজার দুর্গাপুজোর আয়োজন-মেমসাহেবদের এত ভিড় হতে লাগল যে অধুনা সি-আই-টি রোডে লর্ডসিভিল পাশে বিশাল অট্টালিকায় তাদের আসা এবং আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হত। এইসব অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য নবকৃষ্ণ দেব অতিথি নয়নের আসর বসাতেন। তখনকার দিনে পাঁচশ টাকা খরচ করে তিনি একবার কলকাতা থেকে বাঈজি এনে একবার নাচগানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন সে রাজাও নেই, নেই সে উৎসবও। রাজবাড়ির বর্তমান প্রজন্মের কাছে দেবীর এখন পঞ্চকন্যার মতো। তবে এলাকায়

প্রথা অনুযায়ী পূজা হয়। রথের দিন ঠাকুরবাড়ির সামনে প্রতিমার কাঠামো পূজা আর ঠাকুর গড়া শুরু হয়। এখনই চালচিত্রের মধ্যে থাকেন দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কার্তিক, গণেশ। নিয়মের পরিবর্তন হয় মহালয়ার আগের দিন। জানা যায়, সেদিনকে সাজানো হয় অন্যদের সঙ্গে। একসময় এই সাজ আসত মাটি আর্যালি থেকে। এখন আসে কৃষ্ণনগর থেকে। পূজার তদিন আগে, হাঁড়ি কুমড়ো, রাজার আর বলি দেওয়া হয়। এরপর নীলকণ্ঠ পাখি অথবা আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয় নীল রঙের ছিন্ন-বস্ত্রখণ্ড।

এই নবকৃষ্ণ দেবের দুর্গাপূজার প্রায় সমসাময়িক কিংবা তার থেকেও পুরনো হল কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির দুর্গোৎসব। ১৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজা রুদ্র রায় পরিবারে দুর্গাপূজার প্রচলন করেন। এর প্রায় অর্ধশতাব্দী পর ঠিক কাছাকাছি সময়কালীন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পূজার রূপ, রীতিনীতি বদলান। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত দুর্গা প্রতিমার নাম দেন রাজ-রাজেশ্বরী। ছোট অবয়বগুলি নিয়ে গিয়ে আবেষ্টিত এই দেবী মূর্তিকে সাজিয়ে। এই রাজ-রাজেশ্বরী পূজা হয় পুরাণে বর্ণিত কালোষ প্রথম মূর্তিপূজার আয়োজক রাজা কালকারাবলের দুর্গাপূজার রীতিতে।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির নিয়মানুযায়ী সেই সময় উৎপাতনের দিন ঢোলশহরির আওয়াজে দুর্গার পটি বিসর্জন হত। সেই অনুষ্ঠানে শ্রীরামচন্দ্র হয়ে এবং সেই দিন থেকেই শুরু হত তাঁর পূজাপদ অনুষ্ঠান। শিল্পীরা প্রতিমার পায়ের তলায় ১৭৮ তম পাঁচখানি দিতে। বাড়িবাড়িতে পূজাপদ ১৬৮টি ঘরে থাকত। ১৬৮টি দীপ জ্বালা হত। ঢোলশহরি বেজে ওঠা হয়ে পঞ্চপূজা। এরপর একদল সাধুসন্তের মতোই সাধুক ভক্তরে বাগবাজারের হিরণ্ময়ীতে যেতেন। সন্ধিপূজা-কাল ঠিক দিনের পূজায় ঢোলবাদ্যের ছয়টি কাঠামো দেওয়া হত। পূজার শাঁখ বাজে মূল সাজের হল এটাই একটি অনুষ্ঠানমালা মন্ত্রকে দেখতে হয়। অনুষ্ঠানমূলক আছে হাঁড়ি, ঘোড়া, ষাঁড়, পাঁঠা-মোষ, জলভরা জালি, আগুন, পতাকা, ঢাকুর, ঘাস, পাঁচ আলো প্রায় কুড়ি রকম উপকরণ। এখন প্রবেশ এইসব আর সম্ভব হয় না। পরিবর্তে রাজপরিবারের বর্তমান সদস্যরা স্পর্শ করেন এই সব জীবজন্তুর প্রতীক-মূর্তি। ঢোল-বাদ্যে নিয়ন্ত্রণের দিন ১০৮ জন বেহারা রাজ-রাজেশ্বরীকে কাঁধে করে নিয়ে আসত প্রতিমা নদীর তীরে বিসর্জনের জন্য। সঙ্গে আসতেন স্বয়ং মহারাজা পাইক-বরকন্দাজ সহযোগে। এগুলোই বাজনদার, আতশবাজিবাজির, হাঁড়ি-ঘোড়ার নাচে আর কৃষ্ণনগর জেগে উঠত। প্রতিমা নিরঞ্জনের পর রাজা ফিরিয়ে নিতেন দুটি নীলকণ্ঠ পাখি। এই পাখি রাজবাড়িতে গিয়ে জানিয়ে দিত নির্বিঘ্নে প্রতিমা নিরঞ্জনের কথা। তবে থেকে রানিমা এবং রাজবাড়ির অন্যান্য মহিলারা নিমন্ত্রিত হতেন। আজ এখন, ১৬৮টা ঘরে থাকে না। হাঁড়ি-ঘোড়া নাচে না। নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ে না। আজকে রাজবাড়ির পূজা শুধুই অতীতের স্মরণের প্রয়াস মাত্র।

সাবর্ণ চৌধুরীদের দুর্গাপূজার সূচনা হয় ওই একই সময়ে। এখন নিত্য পূজার বয়স পাঁচাল ৫৯০ বছর। ১৬৯০ সালে রাজা প্রতাপাদিত্য লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারকে মুখপা, ঘাসপুর, খৈয়ান, কলকাতা আর হেটোপটের জমিদারি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়েছিলেন রায়চৌধুরী উপাধিও। তবে এরও আগে সম্ভবত ১৪১০ সালে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার তাঁর বাড়িতে দুর্গাপূজা শুরু করেন। সেই পূজাই পরবর্তীকালে সাবর্ণ চৌধুরীদের পূজা হিসাবে বিখ্যাত হয়েছে।

বেহালা বড়িশার সখেরবাজার থেকে একটা সরু রাস্তা সোজা দক্ষিণ মুখো বাঁক নিয়ে যেখানে গিয়ে থেমেছে সেখানেই প্রাসাদ-সদৃশ বিশাল সৌধের অট্টালিকায় প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এখনও দুর্গাপূজা হয়ে চলেছে। স্থানীয় লোকে বলে— মটোরাজার পূজা। এই অট্টালিকার আর একটি ইতিহাস হল, এখানে বসেই ১৬৯৮ সালের ১০ জুন গোবিন্দপুর, সুতানুটি, কলকাতা—তিনটি গ্রাম ইংরেজদের বিক্রি করা হয় মাত্র ১৩০০ টাকায়।

রায়চৌধুরী বাড়ির পূজা হয় দুর্গাতিথি-তত্ত্বচিন্তা মতে। একটি ধরনের বৃহৎ ষড়ভুজা চালচিত্রে বরাবরই পোটোরা বাড়িতে এসে ঠাকুর তৈরি করে। আর পূজার ঠিক আগের নবমী থেকে শুরু হয়ে যায় ঘোলন। সেই দিন থেকেই এ পরিবারে পূজার আয়োজন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূর্ব বিধিমতো পূজা

হয়। পূজা-প্রসঙ্গের আলোচনা ঐতিহ্যগতভাবে পরিবারভিত্তিক হয়। এই দিক দিয়ে যায় না হেমন্তের আগমন। তবে জমিদারবাড়ির সেই জমজমা আজ আর নেই। তবুও পূজার ক্ষেত্রে অনেকটা আছে।

হাওড়া জেলার আমুল রাজবাড়ির পূজার বয়স ২৪০ বছর ছাড়িয়ে গেল এবার নিয়ে। এই দুর্গাপূজা আজও ঐতিহ্যমণ্ডিত হয়ে আছে। এই পূজার সূচনা হয় রাজা রায়চরণের আমলে। রায়চরণের পিতা রামদুলাল রায় ছিলেন লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান। পলাশির যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সাহেবদের কাছে ইংরেজরা রায়চরণকে অনেক রাজ্যাংশ দিয়ে প্রীতি দান করেন এবং তাঁর পুত্র রায়চরণকে বাহাদুর 'রাজা' উপাধি দান করেন সনদটি পাঠ আলেখ ১৭৬৬ সালে। উপাধি পাওয়ার পর রায়চরণ ছিল করেন তিনি রাজবাড়ি করবেন। কিন্তু রাজপুরোহিত তাঁর অভিপ্রায়ের কথা শুনে জানিয়ে দেন যে, দুর্গা প্রকার অঙ্গের বোনেটাই করার অধিকার তাঁর নেই। কেননা বিশ্বজিৎ এবং রাজসূয় যজ্ঞ তিনিই করতে পারেন, তিনি অন্য লক্ষ্য রাজার রাজত্ব জয় করে সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর অশ্বমেধ যজ্ঞ তো ক্ষত্রিয়রাই রাজা ছাড়া করতেই পারেন না। সর্বশেষ গোমেধ যজ্ঞ আইনত নিষিদ্ধ। এরপর রাজপুরোহিত জানান, রাজা যদি দুর্গাপূজা করেন তবে তাঁর দ্বারা যজ্ঞের সূফল পাবেন। রাজপুরোহিতের কথায় রাজা রাজি হয়ে গেলেন। ১৭৮৫ সালে আমুল রাজবাড়িতে প্রথম দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হল ১৭ লক্ষ টাকা খরচ করে। অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন সারা বাংলায় আলোড়ন তুলেছিল। সেই সময় থেকে আজও পূজা হয়ে চলেছে।

সে সময় আমুল রাজবাড়ির পূজায় এতই খ্যাতি ছিল যে লর্ড কর্নওয়ালিস, লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড হেস্টিংস, লর্ড ক্লাইভ প্রমুখ ইংরেজ প্রশাসকেরা এখানে পূজা দেখতে আসতেন। সেকালের জনপ্রিয় পত্রিকা 'সমাচার দর্পণ' সূত্রে জানা যায়, কলকাতার চার-পাঁচ জায়গায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিশাল সমারোহ হওয়া সত্ত্বেও গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস আমুল রাজবাড়িতে সপরিবারে সপ্তমীর দিনে সন্ধিক্ষণ উপস্থিত ছিলেন এবং সারারাত বহুরূপী বাইজির নাচ-গানের অনুষ্ঠান উপভোগ করে বিজয়ার দিন ভোরবেলা কলকাতা ফিরে যান।

রাজা রাজনারায়ণের আমলে দুর্গাপূজার দিনগুলিতে অতিথি-ভোজনের জন্য আয়োজন করা হত ১৪৩ মণ পানতুয়া, ১০০ মণ সন্দেশ ও ১২০ মণ দইচিড়ে। প্রতিদিনই আসতেন প্রায় ছয়-সাত হাজার মানুষ। প্রতিমা তৈরি হত ১০৮ মণ খড়মাটি দিয়ে। উপচৌরাশের দিন ভোগপ্রসাদের আয়োজন শুরু হত, মূর্তি গড়ার কাজ। ষষ্ঠীপক্ষের চৌদ্দ দিন আগে আসার ভোগপ্রসাদের আয়োজন শুরু হত বেদীর বোধন। পূজার ১০৮টি ছাগ এবং ৯টি মহিষ বলি দেওয়ার রীতি ছিল। আর এখন রাজবাড়ির কর্তৃপক্ষ সংখ্যায় ৮টি ছাগবলির ব্যবস্থা করলেই হিমসিম খাচ্ছেন। রাজনারায়ণের সময় সন্ধিপূজার প্রধান নৈবেদ্যতে থাকত ১০ মণ আতপ চাল, ১ মণ গুড়ালের একটি রাবড়ি, এ ছাড়াও আরও ২০০ রকমের নৈবেদ্য থাকত। রাতে দেবীর ভোগ হত লাবড়া খিচুড়ি, ১ মণ ঘীয়ের লাবেস এবং ১ মণ রসগোল্লা দিয়ে। সন্ধিপূজার শুরুতে রাজবাড়ি থেকে বেরান রাজা হত। সে-সময় রাজপরিবারের মহিলারা ছিলেন পুরোপুরি পর্দানশিন। পূজামণ্ডপের পাশে একটা ঘেরা জায়গা থেকে তাঁরা পূজা দেখতেন। দুর্গা-মুখার্জী ফ্যামিলির পরিচিতা জানি দুর্গামুখার্জী যে পথ দিয়ে পূজামণ্ডপে যেতেন, সেই পথটির দুপাশে উঁচু করে ঘিরে দেওয়া হত।

এই সব রাজবাড়ির দুর্গোৎসবের পাশাপাশি জমজমাট ছিল বাংলার বিভিন্ন স্থানে আরও বেশ কিছু বনেদি পরিবারের পূজার সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন, মুর্শিদাবাদ জেলায় দুর্গোৎসবের সূচনা হয়েছিল সেপ্ত ঘর্গী জাহাঙ্গীরনগর সময় থেকে। এখানে আজও পাঁচখুপি গ্রামের পূজা উল্লেখযোগ্য। এই গ্রামে মোট আটটি পারিবারিক পূজা হয়। এখানে বিজয়ার নিয়মটি খুব অন্যরকম, কেননা ওই দিন এখানে কুমারীপূজা দেখার কথা। আগের সময় থেকে প্রতিমাগুলি আলো বাজনা-সহকারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। বিসর্জন হয় মধ্যরাত্রিতে ভাগীরথী নদীতে।

বীরভূম জেলার সুরুলের গড়জগন্নাথবাড়ির পূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বোলপুর-সিউড়ি বাসরুটের উপর এই গ্রাম। বিশ শতাব্দীর শুরুতে রবীন্দ্রনাথ এখানে এঁর পত্নী সাগরবের কাছে যান। জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্ধমানের বাঁজা নদীতে ডুবে প্রতিমা করে সরকার গ্রামের উৎসাহী ব্যক্তি ব্রজনাথ সরকার প্রচুর অর্থ দান করেন।

মেদিনীপুরে রাজবাড়ির পূজা ছিল বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। কিন্তু পারিবারিক পূজার ইতিহাসও প্রায় ৩৫০ বছরের। ছোট-বড় জমিদারেরা তাঁদের অট্টালিকাতে দুর্গোৎসব করতেন অনেকেই। যেমন, কেলোমালের ঘোষেদের দুর্গোৎসব। সেখানে একসা নব্বই মহিষ বলি হত। বিশাল সেই পূজার দালান আজও আছে। পূজাও আছে, কিন্তু মোষবলি আর হয় না।

উত্তর চব্বিশ পরগনার দুর্গাপূজার ইতিহাসও প্রায় ৩৫০ বছরের। ঐতিহাসিকদের বিবরণ সূত্রে জানা যায়, জোব চার্নক কলকাতার পত্তন করার প্রায় ৫০ বছর পর কাশীপুরের পত্তন হয়েছিল। ১৭৫০ সালে ইংরেজ সাহেবদের নজরে পড়ে কাশীপুর। তার পূজার প্রচলন আরও আগে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মোতাবেক শঙ্কর চক্রবর্তীর বড়তলেতে রানীমণি প্রথম কাশীপুরে দুর্গাপূজা করেন। সেই পূজা আজও নিয়ম মেনে হয়ে আসছে। এই জেলার সীমান্ত শহর বনগাঁর পূজাও বেশ জাঁকজমকপূর্ণ।

শীতকের এপারে যখন দুর্গাপূজার এত আয়োজন, তখন আলাদিকভাবেই কৌতূহল জাগে, ওপারে আমাদেরই এক সমৃদ্ধের রাষ্ট্র বাংলাদেশে পূজার আদৌ কেমন ? বলা বাহুল্য, বাংলাদেশের দুর্গাপূজা কম জাকজমকের নয়। পূজার প্রতিমা

এলাকার পূজামণ্ডপগুলিতে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। চলে প্রসাদভোগ বণ্টনও। এমনকি রক্তদান শিবিরও। সব মিলিয়ে দুর্গাপূজার দিনগুলিতে আনন্দে মেতে ওঠে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। এখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ঐতিহ্যমণ্ডিত পূজা হল বাকরাবাদী ঢাকার ঐশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণের পূজা। মন্দিরের সার্বজনীন পূজা কমিটির উদ্যোগে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে অঞ্জলি প্রদান, প্রসাদ বিতরণ ছাড়াও মূল সংগীতানুষ্ঠান, আরতি প্রতিযোগিতা, বোঙ্গার রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে।

এছাড়া ঝালকাঠি এবং এখানকার রামকৃষ্ণ মিশনের পূজা। এই পূজার মূল আকর্ষণ অষ্টমী তিথিতে কুমারী-পূজা। এ দেখতে এত ভিড় হয় যে, মিশন সংলগ্ন হাইস্কুল, মহিলা কলেজ প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া শহরের জনপ্রিয় পূজাগুলির মধ্যে আছে সিদ্ধেশ্বরী সার্বজনীন দুর্গোৎসব, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজী জন্মাষ্টমী ও শ্যামলা কমিটির উদ্যোগে দোলের দোল অনুষ্ঠান দেখার মতো। এইসব পূজামণ্ডপগুলিতে বাংলাদেশের মন্ত্রিমন্ত্রীগণ ও বিদেশি অতিথিরাও উপস্থিত থাকেন। তবে শুধু ঢাকা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাই নয়, দুর্গাপূজা এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বেশ ছড়িয়েছে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় সংবাদপত্র ইত্তেফাকসূত্রে জানা যায়, নারায়ণগঞ্জ জেলায় বর্তমানে ১৪টির মতো পূজা হয়। এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জ শহরে হয় ২৪টি পূজা। গাজিপুর জেলায় ২টি সৌখিনভাবে ও ৫টি খানা মিলিয়ে মোট পূজার সংখ্যা ১৩৯টি। খুলনা মহানগরীতে দুর্গাপূজার সংখ্যা ৪৭টি। বরিশালে পূজার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এখানে মোট ২১৫টি পূজার সন্ধান পাওয়া গেছে। এর ঠিক পরই আছে সিরাজগঞ্জ জেলা। এখানে বর্তমানে ২০৯টি পূজা হয়। অবশ্য এ থেকে দুর্গাপূজার প্রসারতা বা সাম্প্রতিক কোনও ধারণা নেই। কেননা এতে তো আলো-কাঁটা সীমানা বা অন্যান্য খোলাবে কোনও উপায় নেই। তাছাড়া উপায় আমার রাজা কংসনারায়ণ, যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন করেন, তিনি বর্তমান বাংলাদেশেরই লোক ছিলেন। তাঁর রাজা ছিল ডাকশাই জেলার তাহেরপুরে। বলাবে থেকে সেদিক দিয়ের এর ওজন কম নয়।

যাই হোক, এবার আবার একটু মূলের পূজায় ফেরা যাক এবং সেই সঙ্গে একটি স্বতন্ত্র ধরনের পূজার কথায় আসা যাক। সে হল বহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের পূজা। মিশনের পূজা হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতিনীতিতে। নিবেদের পত্রিকা মতে। এই পত্রিকার বিধি আমাদের পঞ্জিকানাল অ্যাস্ট্রোনমি মেটায়। অবশ্য সাধারণ দুর্গোৎসবের এক মাস আগেই কখনও কখনও মিশনের পূজা হয়ে যায়। পূজার ব্যাপারে দেশ-বিদেশের মিশন কেন্দ্রগুলিতে একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়। মিশনে পূজার সূচনা ১৯৩১ সালে যেসুর মঠ রামকৃষ্ণ মিশনে। স্বয়ং বিবেকানন্দ এই পূজার উদ্যোক্তা ছিলেন। বহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৪৪ সালের ১ সেপ্টেম্বর। মিশনের স্বামী, শিষ্যরা সকলেই পূজার আগে যেন। সাধনে মিলে তাদের ভোগ রান্না করেন। বেলুর মঠে কুমারীপূজা হয় এবং এই পূজা দেখার বেশ ভিড়ও হয়।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার দুর্গাপূজার ইতিহাস সেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর পরিমণ্ডলের সমর্থনের। ১৮৯২ সালে স্বামীজি সদ্য জয়নগর-মজিলপুরে আসেন। তিনি এখানে পূজার সূচনা করেন। সেই পূজা অব্যাহত হয়ে আসছে। প্রথমে ঘিরে ধরলা। সেটি শেষিয়ে ফুলমাখানো, দেবীমন্ত্রক, শিষ্যের মন্দির। এরপর হ্রাসিলন এবং বেলতলা। বেলতলার উপরের ঘরে বসিয়ে থাকতেন। এই পরিবারের যোগেন্দ্রনাথ সরকার ধনির বন্ধু ছিলেন তিনি। এই জেলার গাজীপুরে যেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন পূজার কটা দিন তিনি এখানেই কাটাতেন। জানা যায়, এখানে এই পূজা দেখতে দেখতেই তিনি বন্দেমাতরম লেখার প্রেরণা পেয়েছিলেন।

সেই সব দিন আর নেই। দেখতে দেখতে সময় গড়িয়ে গেছে এক শতাব্দী থেকে আর এক শতাব্দীতে। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাপূজাও এসে গেছে নানা পরিবর্তনের জোয়ার।

একদিন কলকাতার কলকাতা ছিল রাজ-রাজড়াদের একচেটিয়া। এই কারণে 'আঢ্যের-নিরাকুলশনী' 'বারোয়ারিতলিনী' হলেও, পুরোহিতের অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা, উপপুরোহিতের অনুরোধে সরস্বতী পূজা করলেও সেকালে দুর্গাপূজায় মেতে উঠতেন। তাঁরাই বারোয়ারি পূজার প্রচলন করেছিলেন। বারোজন ইয়ার (বন্ধু) মিলে শুরু করেছিলেন বলেই তা বারোইয়ারি। ১৭৯০ সালে শুরুপাড়ার এই বারোয়ারি পূজার সূচনা হয়েছিল।

কিন্তু সে-সময়কার বারোইয়ারি পূজা শতাব্দীকালের নতুন নামে নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। বারোইয়ারি থেকে বারোয়ারি। আর বারোয়ারি থেকেই এলো সার্বজনীন পূজা। আজ থেকে ৭৫ বছর আগে ১৯২৫ সালে বিপ্লবী অরবিন্দপ্রকাশ বসু কলকাতায় প্রথম সার্বজনীন দুর্গোৎসবের সূচনা করেছিলেন। সেই থেকে আজকের সার্বজনীন পূজার জয়রথ চলে আসছে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে দুর্গোৎসবের প্রকল্পনায়ে প্রভাবিত করেছিল। 'মা কি ছিলেন, মা কি হইয়াছেন'—ঋষি সাহিত্যিকের এই উপলব্ধি সে কারণেই। সাহিত্যে দুর্গাপূজার উল্লেখ আছে নতুন নয়। রামায়ণে অকালবোধনের আছে, দেবী দুর্গাপূজাই। আছে আধুনিককালের সাহিত্যেও তার নিদর্শন মেলে। শুধু সাহিত্যই বা কেন, চলচ্চিত্রে শিল্প, অঙ্কন শিল্প, ভাস্কর্য শিল্প—সব ক্ষেত্রেই তার নিদর্শন বিরল নয়। বর্তমানকালে দুর্গাপূজা জনজীবনে এক নতুন মাত্রা যোজনা করেছে। এই পূজা শুধুমাত্র হিন্দুদের পূজা হয়ে থাকেনি, আজ তা সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক জ্বলন্ত ও জীবন্ত উদাহরণ হিসেবে উদ্ভাসিত হয়েছে। পূজার চারটি দিন হিন্দুদের নয়, মুসলমানদের নয়, বৌদ্ধ-ক্রিশ্চান-জৈনদেরও নয়, সবার মিলিত সৌহার্দ্যের দিন, ভ্রাতৃত্বের দিন হয়ে উঠেছে। এখানেই এই পূজার সার্বজনীনতা।

কলকাতার 'বাবু'দের দুর্গোৎসব

কালিদাস হাজরা

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বদলাই এটাই নিয়ম, তাইই সে প্রগতিশীল হয়ে ওঠে; কিন্তু মানুষ যদিই প্রগতিশীল হোক না কেন, সে অতীত বা পুরাতনকে ভুলতে পারে না। কারণ, অতীত বা পুরাতনকে নিয়েই বর্তমানকে ভালোবাসে সে।

তাই পুরনো কলকাতাকে জানতে ও চিনতে আমাদের এখন বারবার পিছন ফিরে তাকাতে হয়।

হিকি সাহেবের কলকাতা, সমাচার দর্পণ পত্রিকা এবং পাইকপাড়ার রাজা ১ম প্রতাপচাঁদ সিংহের (১৮১৮-১৮৮৩) "আলালের ঘরের দুলাল" এমন অনেক লেখাতে তৎকালীন সামাজিক চিত্র যেমন পাই, তেমনি—কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) প্রসিদ্ধ বাক্য যদি বলা—"হুতোম প্যাঁচার নক্সা", তার মধ্যে পাই—পুরনো কলকাতার ধনী নগরিক ও সাধারণ সমাজ কী পরিমাণে মদ্যপায়ি ছিল, সেসময়ের দুর্গোৎসব উৎসবে কতটা উন্মাদিত হত, উৎসব অনুষ্ঠানে প্রধান ব্যাপার কত অশ্লীলতাদোষে অনুষ্ঠিত হত, শিক্ষিত যুবক, ছোর, ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব, বারবধূ, গড়ুর, গায়ন, নোল, দুর্গোৎসব, ঠাকুরেবাবু, মোসাহেব পরিবৃত রাজের মুখ, অর্থাৎ ছবিসহ, শহরের হিপারী, কেরানি, দোকানী, মুটিয়ে, পুরুতঠাকুর, ঘুড়ো পর্যন্ত নতুন বাগর প্রভৃতি কলকাতার ছবি আমরা জানতে পারি।

২

সেই কলকাতা মহানগরীর বর্তমান বয়স ৩১০ বছর চলছে। কলকাতা মহানগরীর গৌরব কাহিনী নানামুখী হলেও কেউ বলে—মুমূর্ষু নগরী, কেউ বলে—বর্ষীয়ান জরা নগরী, কেউ বলে—হিংসিল নগরী, আবার কেউ বলে—উৎসব নগরী, কেউ বলে—বহুযুগে নগরী।

ঠিক তেমনি, উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার কথা, কলকাতার ব্যবসার বাণিজ্যে একচেটিয়া ফেন্টুসের বোলবোলা। তৎকালীন সময়ে ফেন্টুসের দুর্গোৎসব ভারতের রাজধানী কলকাতাতে (১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী) সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেনের সুযোগে এবং ইংরেজ বণিকদের অনুকূলে, তাদের ইংরেজ সরকারের তাঁবেদারি করে, এবং চাকরিসূত্রে কলকাতায় এক নতুন ধনী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, তাদেরই কলকাতার "বেঙ্গলি" নামে পরিচিত ছিলেন। আজও তাই সকলের মুখে মুখে কলকাতার বাবু শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে রয়েছে।

এলে এই সময় ছাপের (ফেন্টুসের) নিচে (পুরনো) কলকাতার সমাজকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল তৎকালীন সমাজ।

দুর্গোৎসব ছিল ফেন্টুসের প্রধান অঙ্গ। অর্থাৎ দুর্গোৎসবই ছিল ধনী সম্প্রদায়ের প্রধান অঙ্গরাগ, যে কয় অর্থ খরচ করতে পারেন তার বেশিরভাগ এলে। তার প্রমাণ এক সময় কলকাতায় ফেন্টুসের মধ্যে অর্থাৎ গোবীমোহন দেবের সঙ্গে রামচন্দ্র মিত্রের দুর্গাপূজা নিয়ে ঐতিহাসিক বিরাট প্রতিযোগিতা গড়ে উঠেছিল।

এ প্রসঙ্গে দুর্গোৎসব উপলক্ষে মদ্যের-মেয়েমানুষের অর্থাৎ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের আনাগোনার কথা উল্লেখ করেছেন কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব ও প্রাণ রংপরবরা। সবচেয়ে উল্লেখ ছিল—ফেন্টুসের দুর্গোৎসবে নাচেওয়ালিদের চালচলন। তাই কলকাতায় ফেন্টুসের দুর্গোৎসব নিয়ে সংবাদপত্রগুলি ছিল সদা জাগ্রত।

১৭৫৬ সাল।

লর্ড ক্লাইভের পায়ের তলায়। ক্লাইভের খুশী ছিলেন মহারাজ নবকৃষ্ণ। তাঁর বাড়ি যেন অমরাবতীসদৃশ রাজপ্রাসাদ। নগরের অধিবাসীরা তখন পাড়ি জমিয়ে নবকৃষ্ণের বাড়ি আসতেন দুর্গাপূজা দেখতে। এ প্রসঙ্গে নবকৃষ্ণের অমন্ত্রণপত্রের (চিঠি) কথা আজও স্মরণীয়। তিনি তাঁর এক বন্ধুকে পুজো দেখার জন্য চিঠি লিখেছিলেন—"এবার পুজোর সময় লর্ড ক্লাইভ অনুগ্রহপূর্বক আমার বাড়িতে প্রতিমা দর্শন করিতে আসিবেন। ইহাঁর সহিত ফোর্টস্থিত অন্য কয়জন ব্যক্তিও উপস্থিত থাকিবেন।"

আসলে সম্বৎসরের প্রধান আকর্ষণ ছিল দুর্গাপুজো উপলক্ষে রোশনাই দেখা, নবকৃষ্ণের ছিল অঢেল টাকা। তাই দেশ-দেশান্তর থেকে নিয়ে আসতেন উল্লিখিত যৌবনা ও সুঠাম তনু, সুকণ্ঠী বাঈজীদের। তাদের নিক্কণে কম্পিতে পায়ের নূপুরে ছন্দ-মুখরিত হবে উঠত উৎসবের রাত্রি। অপর দিকে গানের তালে তালে তারা অঙ্গভঙ্গি ও ভাবভঙ্গি দিয়ে ফোর্টস্থিত সাহেব-মেম সাহেব ও তাঁদের বীবা (মেম)। নবকৃষ্ণের এই সমাবেশের পটভূমি ছিল বেশ কয়েক পুরুষ।

যেমন ১৮১৬ এবং ১৮১৯ সালের ইংরেজি সংবাদপত্রের কথা উল্লেখ করা যায়—পুজোয় অনুষ্ঠানসূচিতে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং নিজামতের অনুষ্ঠান তালিকায় বাঈজীদের নাম থাকত। উল্লেখযোগ্যদের নাম—রাইজী মিঠী, বেগম-জান, হীরাজান, হিরন, আলমজন ও হীরা বুলবুল।

এ প্রসঙ্গে ১৮১৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর—"কোলকাটা জার্নাল" পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছিল, এবার শারদীয়া পুজোয় শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ সুকণ্ঠী ও সুহাসিনী বাঈজী বুলবুলের অনবদ্য নৃত্য ও গীত। অতীতে এই উল্লিখ যৌবনা সুকণ্ঠী গায়িকার গান শোনার সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে, তিনিই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন—আমরা আশা করছি এই আসরে বুলবুলের সঙ্গে মিঠী ও আলমজন উপস্থিত থাকবেন।

এবার আসা যাক ইংরেজ মহিলা মারানি পার্কসের কথায়। তিনি ব্যবসা উপলক্ষে এসে প্রায় দু'বছর ছিলেন (১৮২৪ থেকে ১৮২৬)। ১৮২৫ সালে তাঁর বিবরণ থেকে পুরনো কলকাতার পুজো সম্পর্কে নিম্নে ঘটনা জানা যায়—তাঁর বিবরণীতে সেকালের দুর্গাপুজোয় কলকাতার বড় লোকদের বাড়িতে বাঈজী নাচ-গানের কথাও উল্লেখ করেছেন। মিসেস পার্কস এক ফোর্টস্থ বাড়ি দুর্গাপুজা দেখতে গিয়ে বিবরণ দিয়েছেন—"দেবীমূর্তির পূর্ণ বর্ণনা ও মণ্ডপের পাশে প্রচুর খাদ্য ভাণ্ডারের কথা, যার ফলে ফোর্টের রাজকীয় পরিচয় ফুটে উঠেছিল।"

কলকাতেল সাহেব তাঁর বিবরণীতে প্রকাশ করেছেন—"দুর্গা প্রতিমার সাজটি সেকালেরীতে একত্রে দেখা যায়।" তিনি প্রকাশ করেছেন ফোর্টের পূজার সময় যে সব ইউরোপীয়রা নিমন্ত্রিত হতেন, তাঁদের কাছে ফোর্টের কুল, ফল দিয়ে অভ্যর্থনা জানাতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিরাট ভোজ বসতো, তার সঙ্গে নাচ-গানের আসর বসত।"

শুধু তাই নয়, পুরানো কলকাতার ফোর্টস্থিত মাড়ওয়ারের রাজধানীর রাজপুরোহিতের জমিদার "দেওয়ান গোপ" তাঁর বাড়ির দুর্গোৎসবের নিমন্ত্রিতদের অভ্যর্থনের জানাবার জন্য লিখেছিলেন, আমরা টেরা দিয়েছিলেন। আসল কথা হল—এলাকাতার কাছ প্রসাদার বাড়ে যা বোঝায়, তা হল—এই সময় বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিরা অর্থাৎ East India Company-র কর্মকর্তারা এদেশীয় উৎসব বা পূজা অনুষ্ঠানে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। পুজার সময় তোপধ্বনি করা East India Company-র সেনাদের। ইংরেজীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যেবার বিপক্ষে পড়লেই তোপধ্বনি পক্ষ থেকে সাহেবরাও পূজা দিয়ে আসতেন দুর্গা মন্ডপে।

৩

১৭৫৭ সাল।

ঘটে গেল ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধ। পলাশীর যুদ্ধে জয়-লাভের ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর আনুষ্ঠানিক ভিত্তির সূচনা হয়। অবশ্যম্ভাবী হল ভারতবর্ষ।

ঐতিহাসিক পলাশী যুদ্ধের অব্যবহিত যে পুজোতে ইংরেজরা মহাধুমধামের আসর বসাতে শুরু করল, সেটা ছিল কলকাতায় বৃদ্ধে শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের রাজবাড়ির পুজো।

ইংরেজদের তাঁবেদারি করে এই সময় নবকৃষ্ণ দেব যেমন মহারাজ খেতাব পেয়েছিলেন, তেমনই রাজকীয় সম্মান রাখতে অকাতরে অর্থব্যয় করতেন।

ইংরেজ অনুগ্রহপুষ্ট নবকৃষ্ণ দেবের দুর্গোৎসবে লর্ড ক্লাইভ থেকে শুরু করে বড় সাহেব-মেম, ইংরেজ রাজকর্মচারীদের আগমন হত। তাঁর মৃত্যুর পরও এই ঐতিহ্য বজায় ছিল।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সাহেবরা কোনও বাড়ির বা কোনও ফোর্টদের দুর্গোৎসবে যোগ দিচ্ছেন, কোনও বাড়িতে গিয়ে খানা-পিনা করছেন তার ওপরই ফোর্টদের বা দুর্গোৎসবের সামাজিক প্রতিপত্তি নির্ভর করত সেকালে।

মহারাজা নবকৃষ্ণের জীবনচরিত থেকে জানা যায় নানা বিষয়। তাঁর আধ্যাত্মিক কাজের মধ্যে দুর্গোৎসব ছিল প্রধান। তাই দুর্গোৎসবের সময় আরা কলকাতার লোক নাকি তাঁর পুজোর উৎসব দেখার জন্য কাতারে কাতারে হাজির হতেন। তাঁর বাড়ির এলাকা লোকে-লোকারণ্য হয়ে উঠত। তাতে বিপুল রাজবাড়ির শোভা বৃদ্ধি পেত। ফলে কালে-কালে লোকের মুখে মুখে এই রাজবাড়ির নামই হয়ে যায় 'শোভাবাজার', একটি নাম আজ কলকাতার ইতিহাসে স্থায়ী আসন ও নাম গ্রহণ করেছে।

জীবনকৃষ্ণ মিত্র তাঁর সুরধনী কাব্যে শোভাবাজারের রাজবাড়ির দুর্গোৎসবের বর্ণনা রেখে গেছেন

"এই দেখ রাজবাটী রম্য অট্টালিকা,
দুর্গোৎসবে সাহেবিনী সদলে নায়িকা,

ঝুলিয়েছে ঝাড়বুকে বাতি—পরিকল্পনা,
পুলিশেরও চক্ষুস্থির লোভা অনোহর,

বিরাজ খানে দুর্গা হেন বিরিঞ্চিতন

নাচিয়েছে নর্তকী ঘুরি কাঁপাইয়ে কর,
বহুল সাবাস বাজে ঢোল অনোহর।"

মুহাম্মদীর জমিদার, শোভাবাজারের রাজাদের সব আয়োজনেই ছিল অতীতের ছবিটা, তাই রাজবাড়ির সরিষপুজো শুরু হলেই আমন্ত্রণ জানা হত, সেই ষোলশতাব্দি থেকে তবেই কলকাতায় অন্যান্যে বাড়ির পুজো আরম্ভ হত।

রাজা নবকৃষ্ণ দেবের দুর্গোৎসবের একেবারে আদি-অকৃত্রিম রূপে ইংরেজরা অবাক হয়েছেন, ইংরেজ সাধারণ অধীনস্থরাও, এমন কি রাজকর্মচারীরা, পাশক শ্রেণীরাও তাঁরা করে বলেছেন (১৯৫৭ সাল) 'পলাশীর যুদ্ধের জয়ের সৃষ্টি উৎসব'।

ঠিক এরকম পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে, পলাশীর ভারতবর্ষে ইংরেজ নব-দীক্ষিত এলিটদের আলাদার, আলাদার কলকাতার সমাজজীবনে প্রভাবিত হয়েছিল। তার মধ্যে বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়, ইংরেজি আদবকায়দা ও সুযোগ মিশ্রণে বাঙালীর সংস্কৃতির পরিবেষণা। তার প্রমাণ, ১৭৯২ সালে রাজা সুখময় রায় তাঁর বাড়ির দুর্গোৎসবে এই বিদেশি সংস্কৃতির ও নাচের আয়োজন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, লন-সাজিয়ের আতিশয্য, ইংরেজি আদবায় খানা-পিনার প্রচুর্য, তার সঙ্গে প্রায় ও পাশকাতের সংমিশ্রণে নাচ-গানের আতিশয্য বজায় থাকত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আড়ম্বর ও বিলাসিতার মধ্যে পূজাপাঠ, অনুষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের নিষ্ঠা অনেক সময় হারিয়ে যেত।

৪

কথায় আছে, ইতিহাস নীরব নয়, সে কথা কয়। সেই ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যাবে, এক সময়ে দুর্গাপুজো ছিল রাজ-রাজাদেরও, জমিদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারণ পুজোয় প্রচুর ব্যয়ের উপকরণ, নানা নিয়ম-আচার, নিষ্ঠা, লোকলস্কর, আর্থিক, একমাত্র রাজাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

আরও ১৮ ও ১৯ শতকে East India Company-র সঙ্গে ব্যবসায়িক বা অন্যান্য যোগসূত্রে বণিক সম্প্রদায়ের জন্ম হয়েছিল। এই সব ধনী লোকেরা দুর্গোৎসবকে নিয়ে রাজিগত প্রতিযোগিতা শুরু করে দেন। কিন্তু তাদের আর্থিক অবস্থানের ভীত ছিল না।

এরপর পলাশ যুদ্ধের দিন।

উনিশ শতকের প্রথম ভাগে এই সব বাবুদের প্রতি East India Company-র সহযোগিতার অভাব দেখা দিল। ফলে দুর্গোৎসবে ভাঁটা পড়তে থাকে কলকাতাতেও। এর পেছনে অবশ্য নানা কারণ থাকলেও ভারতীয় লোকদের, অর্থাৎ বেশীর ভাগ লোকের মধ্যে সামাজিক মেলামেশার ব্যবধান বিলাতিয়ানে দেখা দিয়েছিল। যত সময়ের সঙ্গে মেলামেশার ব্যবধান বেড়েছে, ঔপনিবেশিকতা উটোর তত বেড়েছে।

অবশ্য আর একদিকে তখন শহরে বনেদী পরিবারগুলির বাড়িতে বিজয়ে পুজোগুলি দুর্বল হওয়ার কারণ ঘটে।

যাঁরে যাঁরে বিভিন্নপুরের ভূঁইকৈলাস রাজবাড়ির পুজো, ঠনঠনিয়ার পুজো, পটলডাঙার মল্লিক পরিবার ও জগন্নাথপ্রসাদ মুখার্জি লেনের, শঙ্খারিটোলা লেনের বাগবাজার বসুদের, কলুটোলার সুবর্ণ বণিক সমাজের পারিবারিক পুজো, বড়বাজারের মল্লিক বংশের, লাহা পরিবারের পুজো, কলুটোলার মতিলাল শীলের পুজো, উনইনে দত্তবাড়ির জাহিরানাথ মহর পুজো, (তিনি নাকানা কেন্দুলি থেকে কোম্পানির দেওয়ান হয়েছিলেন।) হোগলকুড়িয়ার মিত্র পরিবারের পুজো, মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের অন্নপূর্ণা সোনের পুত্র ছেষ্ট সোনের পুজো, আলীবাগান শিবের পুজো, বীরমনীদের পুজো, কুমারটুলির বজ্রাকরদের সোনের পুজো, বোলপটার বসু পরিবারের পুজো, মেছুয়াবাজার রায় পরিবারের পুজো, হাটখোলায় দত্তবাড়ির দেওয়ান জগৎরাম বাবুর পুজো, পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ বংশের পুজো প্রভৃতি একক বনেদী পরিবারের বাবু উৎসবে ধীরে ধীরে ভাঁটা পড়তে থাকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তখন সর্বজনীন দুর্গোৎসবের সূচনা হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে হুগলি জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ার বারোয়ারি ইয়ার বা বন্ধু মিলে বাড়ির দুর্গা-দালানের পুজোকে বাইরে নিয়ে এসে নতুনভাবে দুর্গার আরাধনা শুরু করেন। এটা প্রথম বারোয়ারি পুজো।

১৮৪০ সালে 'ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া' নামক একটি পত্রিকার মে মাসের সংখ্যায় প্রকাশিত হয় যে, 'বছর তিরিশেক আগে গুপ্তিপাড়া বারোয়ারি পুজা আরম্ভ হয়।' এই সূত্র ধরে বলা যায়, ১৭৯০ সালে বারোয়ারি পুজোর যাত্রাপথ শুরু।

এই ঘটনার প্রায় ১৫০ বছর পর কলকাতায় প্রকৃত সর্বজনীন পুজোর সূত্রপাত। এর মূল উদ্দেশ্য—জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী, নির্ধনবিশেষের সকল মানুষকে একটি মঞ্চতলে এনে সেখানকার আরাধনা করার সুযোগ।

ধীরে ধীরে কলকাতার বুকে সর্বজনীন দুর্গোৎসবের ছিত্র ফুটে উঠতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বজনীন দুর্গাপুজোয় নতুন রূপ পেল কলকাতায়।

সেই Tradition আজও চলছে।

তবুও যেমন কলকাতা মহানগরীর লোকসংখ্যা, তেমনই কমছে পুজোর সংখ্যাও। চলতি বছরের এক সমীক্ষায় প্রকাশ, কলকাতা পুলিশ এলাকার গতবারের মতো এবারও ১১০৭টি পুজো মণ্ডপ নিয়ে তৈরি হয়েছে নজর। ফলে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশবাহিনীকে ছিড় সামলাতে হিমশিম খেতে হয়। ফলে নানা বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। তাই বলি, কলকাতা, কলকাতাতেই আছে।

শারদোৎসবের মূলসুর

পলাশ মিত্র

বাঙালী জনজীবনে আজ শারদোৎসব এক অনন্য প্রতিষ্ঠা সুপ্রতিষ্ঠিত। আঙ্গিকগত, সংগঠনিক, প্রযুক্তিগত কোন প্রকরণই তাকে এতটুকু বিচ্যুত করেনি। সুপ্রাচীন বৈদিকযুগেও শারদোৎসবের মহুল শোনা যায়। যদিও তখন বাঙালী জনজীবনের আজকের মৃত্তিকুল বিষয়টি বাস্তবায়িত হয়ে। এখনও পর্যন্ত কোন প্রাচীন মুদ্রা বা খোদ আমাদের এ ধরনের মূর্তিনির্মাণের লক্ষণ দেখা যায়নি। অথচ বৈদিক আমলে মূর্তিপূজা না থাকলেও শরৎজাগরণের এই উৎসব হয়তো প্রচলিত ছিল। বৈদিকযুগে আশ্বিন ও কার্তিক মাসকে বলা হত 'ইষ' এবং 'উর্জ'। বাজসেনীয় সংহিতায় এর উল্লেখ রয়েছে। জ্যোতিভূষণ চাকী একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে শরৎোৎসবের অঙ্গে যেহেতু সম্পর্কিত ছিলেন, পাকস্থলী বাসেই তার পরিচয়। তিনি আরও বলেছেন যে কল্পীত্রাণী অন্নপূর্ণা বা নবপত্রিকা এই শস্য পূজারই প্রতীক। প্রবীণ অন্নপূর্ণা মানের এই ইঙ্গিত।

অবশ্য শুধু আমাদের দেশেই নয়। সুপ্রাচীন সভ্যতার অন্যান্য দেশেও শস্য পূজার বিষয়টি যেন গুরুত্বই পেয়েছে। যেমন প্রাচীন মিশরে ওসিরিস বা প্রাচীন গ্রীক দেবতা ডায়নিসাসের বিষয়টি। পরবর্তীকালে খ্রিস্টিয় অনুসঙ্গে 'পুনরুজ্জীবন' সম্পর্কিত বিশ্বাসটিও এইদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পাশ্চাত্য জগতের সাধারণত এই শস্য উৎসব হয় নভম্বর মাসে। আমন ধান সহ অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী শীতের পর মাঠে-প্রান্তরে সবুজের ইঙ্গিত দেখা দিলেই অধিবাসীদের মনে উৎসবের হিল্লোল বয়ে যেত। অনেকের এখনও ধারণা পূজা প্রথমে প্রচলিত হলেও হয়তো অন্যান্যের দেশে শীত তত প্রবল ঋতু নয় বলেই বর্ষার শেষটার শরৎকালেই শ্যামলিমার উদ্ভাসিত শরৎ-প্রকৃতিতেই উৎসবের আয়োজন। ধর্ম অনুভূতি এল বাদুবের মানসিক বিষয়। কিন্তু উৎসব ? তা হল—নতুন প্রাণের খেলা, পুরাতনকে বর্জন করে নতুনকে আহ্বান করার ঋতুসম্পূর্ততা। তাই প্রাচীন গ্রীসের নাট্যোৎসবের মতই বাঙালীর কাছে শারদোৎসবেরও তাৎপর্যই এক অন্য মানের।

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাই বাঙালী মনোজগতকে চিত্রিত করেছেন এই বলে যে

...শরতের আগমনে, আনন্দ আমার।
শরতেলী শারদীয়া, প্রতিমা প্রকাশ।।

উৎসবের সৃষ্টিতত্ত্বটিতেও কিন্তু তিনি পূজার নামে এই শারদ শিল্পটিকে অবহেলা করতেও ছাড়েন নি। আমার সর্বস্বতা এবং পূজারীদের লোলুপতাকে স্বরণ করেছেন।

...নিষ্ঠা নাই, জ্ঞান নাই, শ্রদ্ধা নাই কিছু।
পাত্রীর নাম নাই, বাস নাই কিছু।।

সর্বশেষে আবার মাতৃমূর্তির কাছেই তাঁর আকুলতা।

এপ্রদিন মুখে বটে, হাসিবারে তারা।
এ বছর যেন বেশি, বিশ্বরীর ধারা ?

সেকালের ধর্ম সর্বস্বতাকে যেমন সৃজনশীল লোকেরা খুব বেশি আমল দেননি, ঠিক তেমনই আবার তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন এর সামাজিক গুরুত্বপূর্ণতাকেও। কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোমপ্যাঁচার নক্সা" থেকে উদ্ধৃতি দিলে বোঝা যাবে যে সেকালেও বারোয়ারি পূজার উদ্যোগ আয়োজন কতরকম কারণ নেওয়া হত।

"...আর একখানা একদল বারোইয়ারির পুজোয় অধ্যক্ষ শহরের সিদি বাবুদের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত, সিদি বাবু সে সময়ে আফিসে যেরুচ্ছিলেন, অধ্যক্ষরা চক-পাঁচ জনে উপরুপরি গিয়ে বলে 'ধর্মেছি', 'ধর্মেছি' বলে চেঁচাতে লাগলেন। বাবুর লোক ঘরে গ্যালো—সিদি বাবু অবাক—ব্যাপারখানা কি ? তখন একজন অধ্যক্ষ বল্লেন, মহাশয় ! আমাদের অমুক জায়গায় বারোইয়ারি পুজোয় মা ভগবতী সিদির উপর চড়ে কৈলাশ থেকে আসছিলেন, পাছে সিদির পা ভেঙ্গে যায়ে, সুতরাং তিনি আর আসতে পাচ্চেন না, সেইখানেই রয়েছেন, আমাদের স্বপ্ন দিয়েছেন, যে যদি আর কেন সিদির যোগাড় করতে পার, তা হলেই আমি যেতে পারি। কিন্তু মহাশয় ! আমরা আজ এক মাস নানা স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি, কোথাও আর সিদির দেখা পেলাম না। আজ ভাগ্যক্রমে আপনার দেখা পেয়েচি, কোন মতে ছেড়ে দোবো না—চলুন। কাজে কাজ হয়। তাই চলবির কলাবেন।' সিদিবাবু অধ্যক্ষদের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে বারোইয়ারি চিরস্থায়ী কিছু টাকা সাহায্য অনুমোদন।..."

সে এক অন্য সময়, অন্য আনন্দ, অন্য উপাসনা। আজও তাই আগমনেই এসবও পূজামণ্ডপে হয়। প্রভুর ভিড় করে, তার জেরে লোকজন সেলফ দেখতেও যেতে। শহরের বড় বড় বাবুরা গাড়ি চড়ে সঙ্গ দেখতে আসতেন। আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক রিপোর্টপত্রেরও কোন আভাস ছিল না।

ঠিক আজকের যুগে হয়তো এই স্থান পূরণ করছে পূজোয় ডিসকো থেকে বা বিভিন্ন বার-রেস্তোরাঁয় উপচানো ভিড়। বলাবাহুল্য হয়তো—যে এখন তো আজ বেরল, পিয়ারলেস পূজায় বিচিত্র রঙ্গমঞ্চের ডিল-এর আয়োজন করে। কিন্তু সেখানে প্রবেশ নিয়ন্ত্রিত হয়ে আজ পাসের মূল্যের সঙ্গে অনুপাতিক হয়ে।

তা, সেকালেও ধূলাবালি ওড়ার থেকে বাঁচতে দূরে এবং আমোদ-আহ্লাদে তো সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধই ছিল। তাদের কাজ ছিল মূলতঃ সেলাম দিয়ে বাজারে নিত্য নতুন গল্প উজাড় করা। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে আজকে যে ভূখণ্ডটির ঠেট উঠেছে, তার আওতা থেকে আমাদের এই পাড়াগেঁয়েরও রেহাই পড়েনি। নিত্যি টি ভি চ্যানেলগুলি তা সে সরকারি হোক বা বেসরকারিই হোক, পাড়া দিয়ে পুজো পরিক্রমা হাজির করছে আমাদেরই বাড়ির বৈঠকখানায়। মণ্ডপে, মণ্ডপে যোরার কষ্টকর নেই, হাজা জাগার ক্লান্তি নেই এমনকি নেই ভিড়ে হারিয়ে যাওয়ারও কোন বিপদের সুযোগ। এর ওপর আবার ওলালাম, এবারের এই সরকারের প্রথম পুজোতে তো একটা ওয়েবসাইট খুলেছে, সেখানে কোথায় টিপে অঞ্জলি অবধি দিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ভাবুন দেখি, অঞ্জলিটা দশভে আমরা কোথা থেকে কোথায় চলে এলাম। তবে হ্যাঁ, বাস্তবের প্রতিমাতে আর হয়তো দেখা যাবে না। পরিবর্তে ডিজিটাল স্ক্রীনে আঙুলের টুসকি মেরে আপনাকে আগামী গানের সুর দেখতে হচ্ছে। এটাই আধুনিকীকরণ।

মানতেই হবে, যে আজকের পুজোয় বৈচিত্র্য বাড়ছে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিনোদনকে পৌঁছে দিচ্ছে অনায়াসেই। সেকালের পুজোয় বিশেষত পাড়ার পাড়ায় বারোয়ারিতে যাত্রাগান ইত্যাদিতে অনেক সময়েই অশ্লীলতারও ঝলকানি অভিনেত্রী, অভিনেত্রীদের পাশাপাশি অবতীর্ণ হতেন। আজ বারোয়ারির জায়গা নিচ্ছে ফ্ল্যাট বাড়ি কালচার। সবই হচ্ছে তবে একটু নির্দিষ্ট দূরত্বে আর মেকী প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতায়, বলা বাহুল্য যে একে পুষ্ট করতে নেমে পড়েছে বিভিন্ন স্পনসরার। সংবেদশূন্য থেকে মনের প্রস্তুতকারক কেউই আজ পিছিয়ে নেই এই সুযোগে বাজারে নিজের প্রচারের ঢাক পিটিয়ে নিতে।

অথচ কলকাতার বারোয়ারি পুজোর রমরমা কিন্তু খুব বেশি দিনের নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বেশির ভাগ পুজো শুরু হয়েছে। যেমন ধরুন কলেজ স্কোয়ার এবার ৫৩ বছরে পড়ল ; সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার ৬৫ বছরে। আমার উত্তরের পুজোগুলো একটু বেশি পুরনো। সেখানে বাগবাজার সর্বজনীনের এবার ৮২ বছর বয়স হল, সেখানে দক্ষিণে একডালিয়া এভারগ্রীন মাত্র ৫৮ বছরের প্রৌঢ়।

আবার শহর যেমন পাড়া নিয়ে বেড়েছে তি পাই বি রোড বরাবর, কিংবা ই এম বাইপাসের কানাচে-কানাচে, তেমনই পুজোর উদ্যমনাও এখন লেকটাউন শ্রীভূমি থেকে দমদম পার্ক হয়ে উত্তরে এগোচ্ছে। পুজোমণ্ডপের আঙ্গিকেও লেগেছে নানান আধুনিকতার পরশ। অবশ্যই মাটির কলাকৌশলেরই আধিপত্য বেশি। তিন্তা ভাবনায় এখনও সেই সনাতনী ভাব অবনতির আধিক্যই প্রবল। কোথাও প্রবেশ ও আলোক সজ্জায় দেখান হচ্ছে 'ভবতু আবার জগৎ সভার শ্রেষ্ঠ আসন লভে'। কোথাও

'পথের পাঁচালির' কিছু দৃশ্য ক্যামেরা বন্দি করিয়ে নিচ্ছে পথচারীদের।

নিউ আলিপুরের মণ্ডপে প্রায়-বালোর এক শাল লাশের জলক যেমন লাগতে পারে, তেমনি চুরিতকী বাগানে গেলে হয়তো মনে হতে পারে কোন তিব্বতী গুম্ফায় ঢুকে পড়লাম।

তবে পুজো মানেই যেমন শুধু প্রতিমা, মণ্ডপ, ঢাকের আওয়াজ নয়। এর শুধু আচার, প্রথা মেনে চলার নিষ্ঠতা এর সঙ্গে প্রবল ভাবে মিশে রয়েছে উৎসবের মেজাজ। উৎসবে তাই মহালিসনের কাপটাই চড়া মেজাজে ভুলিয়ে জাতি-ধর্ম বা বর্ণ পরিচয়। এক অনাবিল আনন্দ স্রোতে আমরা মিশে যাই। তাই চলে আসা পুজা বার্ষিকীগুলোর পাশাপাশি এবার বেশি রঙ্গব্যঙ্গের এক মজাদার পত্রিকা সম্পাদনা করে ফেলেন শেখর আমেদ, কিংবা জয়। কুনীলের পাশাপাশি পুজো উদ্যোক্তাদের আর্থিক নিয়ে নিত্তর মাথা ঘামান জাদুল বাগচী। জাপেট কোম্পানির পুজা রিলিজে নূতন-নচিকেতার নতুন বাংলা গানের উদ্ভাবনের সাথে ঠোট মিলে যায় আজী কালের নচিকেতার।

আসলে এই হল আমাদের উৎসব। ধর্ম তার মতই পাশটাক অন্তরে সে এক অমলিন প্রাণশক্তি বয়ে নিয়ে চলেছে অনাদি সম্ভাবনার দিকে। এর কোন শুরু নেই কারণ উৎসব অমর।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ৪৪ বছর বয়সে বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের দেহকৃত্য সম্পন্ন হয়েছিল অত্যন্ত অসুবিধাজনক ভাবে। তাঁকে একটি চেয়ারে বসিয়ে সাত করা হয়। আসন শিব উঁচুতে রেখেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছিলেন তিনি। এই অভিনব বিষয়টি থেকেই দেশপ্রাণের চরিত্রবৈশিষ্ট্য বুঝে নেওয়া যায়।

১৮৮১ সালের ২৬ অক্টোবর মেদিনীপুরের চকীতোটা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বিশ্বেশ্বর ও মাতা অন্নপূর্ণা। গ্রামের পাঠশালা থেকে কাঁথি হাই স্কুল ও সুরেন্দ্রনাথ কলেজ হয়ে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়া অবধি বিস্তৃত তাঁর উজ্জ্বল ছাত্রজীবন। ১৯০৪ সালে বিলেত থেকে ফিরে হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যুবক শাসমল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সংস্পর্শে রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের মতো দেশবরেণ্য নেতাদের পাশাপাশি আপন বৈশিষ্ট্যে রাজ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রে তিনি অবিস্মরণীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

১৯১৩, ১৯২০ সালের প্রবল বন্যায় তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়। ১৯৩৩ সালের ভয়াবহ বন্যায় তিনি ত্রাণ সমিতির সম্পাদক হিসেবে আর্তের প্রত্যুষ্ঠায় যার প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। অথচ ১৯২০ সালেই তিনি মাসিক ১০/১৫ হাজার টাকা রোজগার করতেন আইন সূত্রে।

১৯২৩ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলা বোর্ডের এক অনেচ্ছীয় চেয়ারম্যান হন। ১৯২৫ সালে কৃষ্ণনগর কংগ্রেস সম্মেলনের সভাপতি হন। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আন্দোলনে নিয়ে পরিপ্রেক্ষিতে হয় আসের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় লেজনাথ বসু, অনন্ত সিংহ প্রমুখের ত্রাণকর্ম অনুষ্ঠান করান। একই বছর আইন অমান্য আন্দোলন চলাকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শঙ্কিত হয়ে তাঁর ওপর ১৪৪ ধারা জারি করে মু মাস জেলায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন।

১৯৩২ সালে মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাস হত্যা মামলায় আসামী পঙ্কজকে সমর্থন করে প্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ সালে তিনি কলিকাতা পৌরসংস্থার মেয়র ও সিলেকশন কমিটির সভাপতি হিসেবে দুর্গত নীতিজ্ঞান ও কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দেন।

দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের জন্মদিনে তাঁর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করছেন মেয়রপরিষদ সদস্যা মৃণালিনী মুখার্জি

তিনি ছিলেন প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক নেতা। বস্তুত তাঁরই উদ্যোগে ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হিন্দু-মুসলমান চুক্তির বলে কলিকাতা পৌরসংস্থায় ১৯৩৩ সালে, সর্বপ্রথম একজন মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হন। একই সালে ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের "সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারার" বিরুদ্ধাচরণ করে বর্ধমান বিভাগের শতকরা ৯৫ ভাগ ভোট পেয়ে বিপুলভাবে জয়ী হন।

আজকের ভারতবর্ষেও তাই তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েনি।

পৌরসংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণে আধুনিক ব্যবস্থা এখনই চাই

শ্রীনাসেবী পুরোহিত

উপশহরনাগরিক হিসেবে কাজের ভার পেয়ে প্রথমে আমার মনে হয়েছে একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র সংরক্ষণের কাজ কেমনভাবে করা প্রয়োজন, তা এতদিন হয়নি। প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশাসনিক এবং শিক্ষণ পদ্ধতির কিছু রদবদল দরকার। এর জন্য পর্যায়ক্রমে আমরা নানান ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছি। রেকর্ডস বিভাগের সমস্ত কাজকর্ম তিনটি জায়গা থেকে পরিচালনা করা হয়ে থাকে। একটি ভোরাপাড় বিভাগের পাশে, অপরটি রিক্রিয়েশন বিল্ডিংয়ের একতলায়। আরেকটি চার তলার প্রতিযোগী কমপ্লেক্সের পাশে যেখানে পি এন্ড সেন্সর থাকে। শেষটি লিটন্যাকেট অফিসের তৃতীয় তলায়। রেকর্ডস বিভাগের বিভাগীয় কাজের মধ্যে নাগরিকদের জন্ম, মৃত্যুর নথি, জন্ম নিবন্ধীকরণের তথ্য, লাইসেন্স বই, বাড়িঘরের নকশা ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। তবে বলা বাহুল্য, এই সমস্ত কাজের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও বিভাগীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখা একান্তই প্রয়োজন। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে এ কাজ হয়ে আসছে তাতে কারুরই মনোযোগ না দিলে ভবিষ্যতের পক্ষে কাজ করা মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। এত ঘুপচিযুক্ত রেকর্ডসের ভিড়ে যে কোনোরকম অগ্নিকাণ্ডই গোটা ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে পারে।

তাই সব কিছু পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে দপ্তরের কাজকে মসৃণতর করার জন্য। একটি ধ্বংসপ্রাপ্তি প্রক্রিয়া, অপরটি সংরক্ষণপ্রাপ্তি।

ধ্বংসপ্রাপ্তি প্রক্রিয়ায় আমার বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ আছে। যেমন বিভাগের অধীনে যে মোট পাঁচটি ঘর রয়েছে সেগুলি আলোক-প্রদীপ্ত এবং স্বাস্থ্যকর। এর ফলে যেমন বিভাগীয় কাজকর্মের গতি হবে, তেমনই পরিষ্কারের কর্মীদেরও মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রসন্নতি ঘটবে। ফলে প্রকারান্তরে তাঁদের বিভাগের কাজকর্মেরই অভিসারিত হবে। তাই নথিপত্র সংরক্ষণ, অযথাগুলির সংস্কারের দিকটায় নজর দিতে হবে।

নাগরিকদের জন্ম থেকে মৃত্যু,

> স্তূপীকৃত রেকর্ডের ভিড়ে যে কোনোরকম অগ্নিকাণ্ডই গোটা ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে পারে

পৌরসংস্থার এই মূল্যবান নজিরগুলির মধ্যে রেকর্ডস বিভাগের গুরুত্ব অপরিসীম। জন্ম ও মৃত্যু এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সমস্ত নথি এখানে সংরক্ষিত করা হয়। দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহারের ফলে খাতার বেশিরভাগটাই জীর্ণ হয়ে আসছে। এগুলির অপিলকে বাঁধাই ও সংরক্ষণ প্রয়োজন। প্রায় ২০০০ বেজিস্টার বাঁধাইয়ের জন্য অন্তত দু বছর সময় প্রয়োজন। সময়টাই এ মুহূর্তে সঙ্কট না হলেও, প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুসারে এই কাজটিকে এড়িয়ে যাওয়া অনুচিত হবে।

দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পগুলির মধ্যে প্রথমেই নজর দেওয়া উচিত বিভাগের আধুনিকীকরণের দিকে। একদিকে নাগরিকদের প্রত্যেক ব্যবহারে, ফলে বিভাগের অন্যান্য উন্নয়ন অপেক্ষা মূল আমাদের নাগরিক পরিষেবার উন্নতিকল্পে কাজ করার স্বার্থে আধুনিকতম উপায়ে আমাদের কাজ করা প্রয়োজন। এ কারণে, রেকর্ডস বিভাগকে পুরোপুরি কম্পিউটারাইজড করার দিকে আমাদের এগোতেই হবে। কম্পিউটার আমাদের তা যেমন বিভিন্ন রেকর্ড সংরক্ষণের কাজকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলবে, তেমনই প্রয়োজনভিত্তিক আমাদের ক্ষিপ্রতার এগিয়ে আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে এক ক্লিকমাত্র সন্ধানের পরিবেশ বজায় রাখা। অতীত এ কাজে, আমাদের বিপুল হাতের সাহায্য করেছে—তবুও আধুনিকীকরণের এই প্রকল্পগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া মোটেও উচিত হবে না।

এক্ষেত্রে আরও বলা দরকার যে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই একসঙ্গে জন্ম-মৃত্যুর সার্টিফিকেট নেওয়ার সময়ে প্রথমে রেকর্ডস বিভাগে এসে নথি মিলিয়ে তারপর দ্বিতলে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হয়। ফলে বিষয়টি অনেক সময়েই জটিল এবং সময়সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। যদি এক্ষেত্রে একজানলা পদ্ধতি (one window system) ব্যবহার করা যায় তাহলে সার্টিফিকেট গ্রহীতার এবং পৌরসংস্থা উভয়ের কাজেই সুবিধা হবে। ইনস্টিটিউট অব আরবান ম্যানেজমেন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে, ৩৯টি বার্থিপত্র সার্টুলিয়ার মেয়াদে অবস্থিতে। এর ফলে ১৮,৫০০ কর্মস্থটি এলাকার সংস্থার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। ১৯৯৯ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর প্রদত্ত বর্ষণে এখানে স্থির কম্পিউটার শিক্ষা কেন্দ্রটির প্রারম্ভের ঘটি হয়। বর্তমানে শিক্ষাকেন্দ্রটি উপরতলে স্থানান্তরিত হলেও নীচের আংশটিকে পুনর্নির্মাণ করে সমস্যার সরকারি দপ্তর ও সংস্থাকে আরও বিস্তৃত দেওয়া যেতে পারে। অবস্থানগত কারণে এর চাহিদা প্রবল হবে বলে আশা করা যায়। নীচের অন্যান্য অংশের গ্যারাজ ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ইনস্টিটিউটের মূলত বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদানে যুক্ত। এইসব কার্যাদি পরিচালনার জন্য পৌরসংস্থার বিভিন্ন আধিকারিক, কর্মচারী বিভাগ পরিশ্রম করে চলেছেন।

যেমন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করে বহু সংখ্যক কর্মচারী পৌরসংস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে নাগরিক পরিষেবায় নেই জানবার অভিজ্ঞতা মুহূর্তকালনে দৈনিক প্রয়োগ করে থাকেন। এখন এই কম্পিউটার কেন্দ্রটি থেকে পরীক্ষাগুলো অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জন্যান্য আরও পৌরসংস্থাগুলিকেও ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির জন্য ওয়েবসাইট প্রভৃতি ফাইলিংয়ের স্বীকৃতি লাভ। তাহলে কম্পিউটারের বিভিন্ন লেভেলের পরীক্ষায় এখন থেকে পরীক্ষার্থীরা নিজের সুযোগ পাবেন।

> *গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ চালু করা ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই*

কলিকাতা পৌরসংস্থায় অতীত ঐতিহ্যমণ্ডিত কথা ভাবার থেকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠান ভবিষ্যতে বিভিন্ন বইয়ের সংস্থাগুলোর সামনে খুলে দেওয়া যেতে পারে। সামান্যতম উদ্যোগ না থেকেও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাটুকু আনা গেলেও এ কাজটা পৌরসংস্থার আয়ত্তাধীনে করবে।

'ভারিশ এ মুখোপাধ্যায়' যে শিক্ষাক্রমটি পুর্বে চালু ছিল তা কিছুকাল পূর্বে বন্ধ করা হয়েছে। এটি পুনরায় চালু করা গেলে একটিমাত্রায় পৌরসংস্থা লাভবান হতে পারে।

মোট কথা কলকাতা পৌরসংস্থার গুরুত্বপূর্ণ নথি সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ চালু করা ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই। পুরকর্মী ও অফিসারদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও কম্পিউটার প্রশিক্ষণকে টেনে আনতে হবে। সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় এর কতটা কতদিনে বাস্তবায়িত হবে এই মুহূর্তে সঠিকভাবে তা বলা না গেলেও এটি বলার পরিষ্কার এই দুটি বিষয়ের ওপর আমি সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছি।

> *কম্পিউটার আনলে তা বিভিন্ন রেকর্ড সংরক্ষণের কাজকে বিজ্ঞানভিত্তিক করে তুলবে*

কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি জলপ্রকল্পের উদ্দেশ্য সার্থক করে তুলতে চাই সাধারণ নাগরিকবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

শোভন চট্টোপাধ্যায়

মেয়র পরিষদ সদস্য হওয়ার আগে ছিলাম কাউন্সিলার। পরে বোরো কমিটির চেয়ারম্যান। চেয়ারম্যান ও পৌরপিতা হিসাবে কাজ করার সময় বিশেষভাবে লক্ষ করেছি, জলের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগসূত্র প্রতিটি দিনের। প্রতিটি ঘণ্টার। প্রতিটি সেকেন্ডে—প্রতিটি মুহূর্তের। এই বিশেষ দিকটা আমাকে বিশেষ নাড়া দিয়েছে বর্তমান পুরবোর্ডে জল সরবরাহ কমিটির পাওয়ার পরে।

আমার মনে হয়েছে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে—চাহিদা ও উৎপাদনের সম্পর্ক কোনমতেই এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। দেখলাম দুটিই পরস্পরের পরিপূরক। কিন্তু দুঃখের ঘটনা হল, উৎপাদনের বিষয়টি মাথায় রেখে তেতাল্লিশ পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত ছিল তা হয়নি। আবার যেটুকু উৎপাদিত জল তা সরবরাহ করার জন্য যত বুস্টিং স্টেশন থাকা দরকার তা নেই। ফলে সুষ্ঠুভাবে জল সরবরাহই করা যাচ্ছিল না।

নতুন বোর্ড গঠন হওয়ার পর ঠিক হয়েছে, পলতা-গার্ডেনরীচ থেকে মোটামুটি ১৩ কোটি গ্যালন জল কলকাতার মানুষের জন্য দৈনন্দিন সরবরাহ করার চেষ্টা হবে। এর মধ্যে ৪ কোটি গ্যালন জল সরবরাহের জন্য পলতাতে নতুন প্রকল্পের কাজকর্ম চলছে।

উচ্চ চাপে জল সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য কালিঘাট বুস্টিং স্টেশন-এ নতুন প্রজেক্ট-এর কাজও চলছে। পার্ক স্ট্রীটের, রহমান আলি পার্ক থেকেও উচ্চচাপে জল সরবরাহ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে সতর্ক নজর রাখা হয়েছে। বর্তমানে মহানগরের অধিকাংশ বাসস্থানী, ব্যবসাকেন্দ্র, শিল্পাঞ্চল, বাজার, বিনোদনকেন্দ্র বুস্টিং স্টেশনগুলির কাজ ব্যবস্থিত অঞ্চলে জল ক্লোরিনযুক্ত ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

> *উচ্চচাপে জল সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্য কালিঘাট বুস্টিং স্টেশনে নতুন প্রজেক্টের কাজ চলছে*

বলতে দ্বিধা নেই, অনাগত নাগরিকদের পানীয় জলের সমস্যা মেটানোর বৃহৎ পরিকল্পনাগুলি ১৯৯৭-৯৯ সালেই শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা হয়নি। ফলে সমস্যা বেড়েছে। পরিকল্পনা খাতে খরচেই পরিমাণ বেড়ে গেছে। তবে হাজার পরিবর্তন হলেও রাজস্বের পরিবর্তন তো হয় না।

নাগরিকদের স্বার্থও উপেক্ষা করার সম্ভাবনা রয়। তাই আগে দুটি পরিকল্পনাকে চূড়ান্তভাবে এক্সিকিউট করার জন্য নতুন বোর্ড গঠনপ্রক্রিয়া শুরু করেছে।

বন্ধুরা জানে আমি দেওয়ালে মাথা কুটছি, কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে উৎপাদিত শতভাগ জল সম্পর্কে পানি সরবরাহকে বৃদ্ধি করতে কিংবা মোট ইতিহাসে ব্যর্থ। মূল ব্যাপারে, জলের মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে অযোগ্যদের চালানো কোন মতেই উচিত নয়। এই জন্য আমরা বেআইনীভাবে নেওয়া প্রতিটি জলের কানেকশন কেটে দেবার ব্যবস্থা নিয়েছি। যার ফলে সরকারি

> আমরা বেআইনীভাবে নেওয়া প্রতিটি জলের কানেকশন কেটে দেবার ব্যবস্থা নিয়েছি

প্রতিষ্ঠান প্রকৃতি ক্ষেত্রে পৌরসভার নলীয় জলসরবরাহ নিয়োগ অনুযায়ী যে জলের ক্ষেত্রে মেজারিং ডিভাইস লাগিয়ে পৌরসভা এখন থেকে কেটে দিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, ডোমেস্টিক পারপাসে নেওয়া জলের কানেকশন থেকে কমার্শিয়াল কানেকশনের কাজ হচ্ছে—এমন ক্ষেত্রে কন্ট্রাক্টরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জলের লাইন নির্বিচারে কেটে দিতে।

> বিনা পয়সায় জল পাওয়ার প্রবণতা থেকে জলের অপচয় করার যৌক্তিকও আমার দৃষ্টি এড়ায়নি

বিনা পয়সায় জল পাওয়ার প্রবণতা থেকে জলের অপচয় করার যৌক্তিকও আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। এ ব্যাপারে আমি চাই, প্রতিটি নাগরিকের ইনভলভমেন্ট। এটা বুঝুক, জল ফ্রিপতা করার নয়। একে যত্ন করে, রক্ষা করে ব্যবহারের দায়িত্ব জোরদার করাই মূল কাজ। পানির জল পরিশোধন করার সঙ্গে কোটি কোটি টাকা খরচের ব্যাপারটি যে জড়িত সাধারণ মানুষকে আমরা সর্বত্র তা জানাতে চাই। সাধারণ নাগরিকদের এ ব্যাপারে সচেতনতার আওতায় এনে তাদের প্রয়োজনে প্রতিটি কল কানেকশন নিশ্চিন্ত করা হবে না। তা যে টাকা/পাঁচ টাকা/কম টাকা যাই হোক না কেন এই প্রিভেনশন চার্জ করলে ফলে জল সম্পর্কিত ব্যাপারে সচেতনতা বাড়বে বই কমবে না। আমি চাই পানীয় জল সরবরাহ নিয়ে জনমতের অংশগ্রহণ।

এ ব্যাপারে ঠিক করেছি, কলকাতার প্রথম টিলি বাড়ি—অথচ 'অকুপেশন সার্টিফিকেট' পায়নি—এমন বাড়িতে জল বন্ধিলা করে করেন। এরপর যদি আরেকজন করেন জলের মিটার বসিয়ে এদের পানীয় জল সরবরাহ করবো।

পরিকল্পনায় রয়েছে, রাস্তার সিটির গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে, জনবহুল স্থানে এম টি ডি বুথের মত পুরনস্থার পানীয় জলের 'ড্রিঙ্কিং কর্নার' বসিয়ে নাগরিকদের সামান্য পয়সার বিনিময়ে জল সরবরাহ করবো। এই সব বুথে জনিযুক্তি প্রকল্পে কিছু বেকার যুবকের জন্যের করছেন

> জনবহুল স্থানে এম টি ডি বুথের মত পৌরসভার পানীয় জলের 'ড্রিঙ্কিং কর্নার' বসিয়ে নাগরিকদের সামান্য পয়সার বিনিময়ে জল সরবরাহ করবো

হবে। পৌরসংস্থারও আয় বাড়বে। প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জনিযুক্তি প্রকল্পে এগিয়ে আসা বেকারদের ব্যবসায়ে আর্থিক সাহায্যও করা হবে।

সিটির এলাকার 'স্ট্রীট ট্যাপ' গুলির মুখ যাতে চুরি না যায়, কেউ ভেঙে না ফেলে তার জন্য স্থানীয় ক্লাব সংগঠন/প্রতিষ্ঠানগুলিরও সহায়তা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে সমস্ত দলের কর্মীদের নিয়ে আজকালের মধ্যে খুব শীঘ্রই আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরু করতে চাই।

আমি মনে করি, জল সরবরাহ প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য কমিটিগুলি বিশেষজ্ঞের ওপর নির্ভরতাই যথেষ্ট নয়, এই সঙ্গে গ্রাহক সচেতনতার বাস্তব বোধের পরিচয়ও। এর অভাব ঘটার জন্য দেশ দেখে মানুষের বার বেরিয়ে আসার সময় এসেই রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে পৌরসংস্থার জল সরবরাহ বিভাগটি। এই বস্তুগত দিকেই আমাদের বামপন্থী সবাই তুলে ধরেছেন।

কিন্তু আমি চাই বিতর্ক হোক, কিন্তু তা জল সরবরাহ প্রকল্পের ব্যর্থতা নিয়ে নয়। বরং আলোচনা হোক এই বিভাগের সাফল্যের জানকাঠি নিয়ে। সেগুলিও কম, পরিসংখ্যান বিশ্লেষকরাই প্রেক্ষ এর শেষ বিন্দু। জলপ্রকল্পগুলি সার্থক করে তুলতে সাধারণ মানুষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

নতুন পৌরবোর্ড চায়, নাগরিকরা আসুন তবুও নাগরিকদের কাছেই যাবে পৌরসভার স্বাস্থ্য দপ্তর

জাভেদ খান

নতুন পৌরবোর্ডে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ভার নিয়ে যখন আসি বেশি, বসার ঘরটুকু ছাড়া আর কিছু নেই। নেই চেয়ার। নেই টেবিল। নেই কোন ফাইল আলমারি। চলছে টুকরো কাগজের ওপর অনুমোদনের যাবতীয় কাজ, সবটাই অগোছালো। টিলেঢালা ব্যাপার।

প্রথমেই মনে হল, কাজের ক্ষেত্রে কোনও প্রায়োরিটি বেসিসও এদের নেই। এই অবস্থায় কাজে বসে প্রথমেই ঠিক করি, ম্যালেরিয়া সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন, সজাগ করার কাজটা আগে করা দরকার। বৃষ্টিটা ছুতোই ম্যালেরিয়া রয়েছে। কলকাতায় একটু বেশি। তাই ম্যালেরিয়া নিয়ে কাজে নেমে পড়লাম। নাগরিকরা পৌরসভার কাছে চিকিৎসার ব্যাপারে যেমন আসছেন আসুন, তবে পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা শক্তিশালী করে তুলে পৌর দপ্তর নিজেরাই নাগরিকদের কাছে পৌঁছে যাবে, এই নতুন ধারণার কার্যকরী রূপে চালু হল মোবাইল ডিসপেনসারি। এই ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরিতে নাগরিকদের রক্ত পরীক্ষা করে বাড়িতে তার রিপোর্ট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে লায়ন্স ক্লাব, রোটারি ক্লাবগুলিও পুরসভার কর্মসূচিতে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়ে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছে। পুজোর সময় নাগরিকদের ঘরে ঘরে সচেতনতা করা হয়, বেজনা প্রচারপত্র বিলি হল। চলে রক্ত পরীক্ষার কাজও। এই সময় ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরিতে প্রায় ২২০ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। প্রায় ৮৪ জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ধরা পড়ে।

অন্যান্য রোগ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করার কিছু দেখি না। ম্যালেরিয়া হচ্ছে। রয়েছে এ কথায় ঘোষণা করার কিছু নেই। তবে একথা বলব, ম্যালেরিয়া নিয়ে সার্থক ভূমিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে গতবারের তুলনায় যোগের প্রকোপ এবার অনেক কম। গত অক্টোবর মাসে ২৮ জন ম্যালেরিয়া রোগে মারা যায়। এ বছর অক্টোবর মাসের ১৯ তারিখ পর্যন্ত মারা গেছেন ১৪ জন। এর মধ্যে ৯ জনই বাইরে থেকে আসা রোগী। বাকি পাঁচজনের মধ্যে ৪ জনেরই বয়স ৮৩/৮৪-র ওপর। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে কমবেশিভাবে জড়িয়ে থাকে ডেঙ্গুরও একটা ভাইরাস ঘটিত জ্বর। ডেঙ্গুপজিটিভদের এক তৃতীয়াংশ মারা যান নিজেদের চিকিৎসার বিভ্রাটে।

ম্যালেরিয়া নিয়ে প্রচারাভিযানে উৎসাহ নিয়ে পুজো কমিটিগুলির মধ্যে পুরস্কার বিতরণেরও সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে চেতনা জাগাতে লায়ন্স ক্লাব সহ বিভিন্ন এন জি ও সংস্থাগুলিকে সক্রিয় করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। এইসব সংস্থা এবং পৌরসভার কর্মীরা যৌথভাবে বিভিন্ন এলাকার পুকুরের কুচুরি পানা, ডাবরের টায়ার টিউব, ভাঙা হাঁড়ি-কলসি, ভাবের খোসা প্রভৃতি মশক উৎপাদনের আঁতুরঘরগুলি উৎপাটিত করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। আমরা ঠিক করেছি, আগামী ডিসেম্বরের পর বিভিন্ন ঘরোয়া নিমিত্ত ওয়ার্ডগুলির এক একটির প্রত্যেকটি বাড়ির আবাসিকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এইসব তথ্য স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোনও নীতি বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সময় কাজে লাগানো হবে। এরই সঙ্গে প্রত্যেককে

নেওয়া হবে রোগীর ছাড়া। এ কাজে C U D P-র প্রায় ২৫০ কর্মীর সহায়তা নেওয়া হবে। প্রয়োজনে বাড়তি লোক নিয়েও ঘরে ঘরে এই পরীক্ষা চালানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এছাড়া এরিয়াকে বিপদ থেকে পৌরসভার বিশেষ স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে উদ্যোগী হয়েছে। এজন্য তা খুঁজিয়ে নিয়ে সংযুক্ত এলাকাগুলিতে মোবাইল স্বাস্থ্যকেন্দ্র ক্লিনিক নিয়ে যাবার পরিকল্পনা নিচ্ছি। নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে এইসব ভ্রাম্যমাণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে এবং ওষুধও দেওয়া হবে। তবে সমীক্ষা হয়ে গিয়ে পরামর্শ দেওয়া হলে তা নয়, বেড ঃপরিবারের এই চিকিৎসার খুঁটি নিয়ে এবে অবশ্যই অংশগ্রহণকারী করা হবে।

এছাড়া ম্যালেরিয়া-টিউবারকিউলোসিস রোগীদের জন্য এক একটি নির্দিষ্ট রোগের হাসপাতাল চালু করার পরিকল্পনাও হয়েছে।

এলাকা ভিত্তিক পরীক্ষার ফল পাওয়ার, তাড়াতাড়ি কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে পরিবর্তনের একটা চেষ্টা ইতিমধ্যে চালু হয়েছে এবং তা থেকে ভাল ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আগে জয়রামবাবুদের ক্লিনিকে ওষুধ-ডাওয়া নিয়ে অনেক অভিযোগ ছিল। সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়ে দেখেছি এই অভিযোগের পরিমাণ কমে এসেছে। জয়রামবাবুরা সকাল আটটা থেকে দুপুর দেড়টা পর্যন্ত রোগীদের দেখাশোনা করছেন, ওষুধ কেনার ব্যবস্থাও মনটা ঠিক হয়নি, তবে আশা করি ঠিক হয়ে যাবে। সি ইউ সি সি কর্মীদেরও বলেছি সকাল ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত ডিউটি যেন ঠিকমত করে।

পানীয় জল নিয়ে কোনও কোনও মহল থেকে অভিযোগ আসে। কিন্তু আমরা বলছি ঘরে ঘরে কলের ট্রিটেড জল দিতে আমরা পরীক্ষাগারে নিয়মিত পরীক্ষা চালাই। ফলে আমেরিকা থেকে ফল মিল

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেয়েছি প্রায় ৬৭ কোটি টাকা

হুমায়ুন্দ গুপ্ত

কলকাতাকে সবুজ করে গড়ে তুলতে গত দু' দশক আমরা সচেষ্ট রয়েছি। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রী টি এন বালুর কাছে আমরা একটি দাবিপত্র দিয়ে এসেছি। আগামী ৯৫-৯৬ বছরের এই পরিকল্পনার মোট ৬৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে পেশ করা। প্রস্তাবে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে কলকাতার খোলা জায়গার পরিমাণ আরও বাড়ানোর জন্য। কলকাতা শহরে শতকরা ৪ ভাগ খোলা জায়গা রয়েছে। কলকাতায় সবুজ বাড়ানোর জন্য পার্কের সংখ্যা বাড়াতে হবে, খোলা জায়গা আরও বেশি বেশি করে চাই। এই জন্য আমাদের দাবিপত্রে পৃথকভাবে ৫০ কোটি টাকা রাখা আছে শুধু জমি কেনা বা জমি নেওয়ার জন্য। আমরা চাই, কলকাতার নাগরিকদের স্বার্থে খোলা জমির মালিকেরা আমাদের আহ্বানসত্ত্বেও যেন ক্রম মূল্যে জমি দিন যাতে সেই টাকিতে পার্ক তৈরি করে আমরা সেই অঞ্চলের মানুষদের সুস্থ, সুষমামুক্ত বসবাসোপযোগী পরিবেশ গড়ে তুলতে পারি।

কলকাতার পার্কগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে নানা ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম হয়। অনেকে ঘর বা ছাউনি বানান। এগুলি আমরা সমীক্ষা করে দেখছি। এটি আইন-শৃঙ্খলার বিষয়। আমার মনে হয়, জনচেতনা বাড়ানোর মাধ্যমে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতায় এই ধরনের অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করা যায়।

শহর ছুঁয়ে থাকবে। শুধু তালিকাতে আমরা সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়েছি। এই কারণে আমরা চেষ্টা করছি ১৪১টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতেই বিঘা বিঘা করে নতুন গাছ লাগাতে। ইতিমধ্যে ১৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ছটিটি ওয়ার্ডে গড়ে ৫০০টি করে গাছ লাগানো হয়েছে। রাস্তা এবং ফুটপাথ মেরামত করতে গেলে, স্টাম্প তোলা থেকে পোতা পর্যন্ত গাছ লাগানোর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছি।

কলকাতার যেসব পার্কগুলি আছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণে বর্তমানে যে অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। এর জন্য আমরা চেষ্টা করছি পার্কগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেবার। তাঁরা অর্থদানের রক্ষণাবেক্ষণই করবেন তবে কোনরকম পরিচালক ব্যবস্থার চলবে না। কলকাতায় পার্কের সংখ্যা কম থাকায় ছেলে-মেয়েরা খেলাধূলা করতে পারে না, পার্কগুলি ব্যবহারযোগ্য করে তাদের অন্ততঃ একটি করে ছুটির দিন করার চেষ্টাও করা হচ্ছে।

আমরা যে দাবিপত্র পেশ করেছি তাতে ৬৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে চাওয়া হয়েছে ১০ কোটি টাকা, পৌরসংস্থা দেবে ১৩ কোটি টাকা এবং বাকি ৪১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ ও বন দপ্তর দেবে। এজন্য তলবি আর্থিক বছরে চাওয়া হয়েছে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা।

কলকাতায় বৃক্ষরোপণের সঙ্গে সঙ্গে শহরের অন্তর্বর্তী ক্যানেলগুলির ধারে ধারে, গঙ্গা নদীর পাড়ে, বাইপাস এলাকায় দু' ধারে গাছ লাগানোর পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

সেদিন ধরে কলকাতার অবস্থাওয়ার মূল্যের সঠিক মাত্রা পরীক্ষিত হয়নি। বিগত বছরগুলিতে যেসব বিদ্যু গাছ মারা হয়েছে তখন মূল্যের মাত্রা বর্তমানে কি রকম আছে, তাহাড়া আমরা আশা করি আন্তর্জাতিক আদালতে পরিচালন করে ইতোমধ্যে আমরা সহিকভাবে ক্ষতিপূরণ পাবো। এই কারণে বিভিন্ন পরিবেশ বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এঁরা আগামী তিন মাসের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট পেশ করবেন।

রিপোর্ট পেলে আমরা জানতে পারবো কলকাতার কোন অঞ্চলে কি ধরনের নূতন জমির পরিস্থিতি হয়েছে এবং তখনই আমরা ঠিকমত অঞ্চলভিত্তিক কাজে নামতে পারবো। বর্তমানে আমরা কি এম ডি এ এই ধরনের একটি সার্ভে করছে এবং সেটিই এখন পর্যন্ত শেষ সমীক্ষা।

আমরা চাই কলকাতার নাগরিকদের সচেতনতা এবং সক্রিয় সহযোগিতা। নাগরিকরা প্রত্যেক বাড়ির সামনের খোলা জায়গায় গাছ লাগান। এজন্য ফুলে ফলের ছায়ে বাগান করুন। প্রয়োজনে পৌরসভা থেকে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের পরামর্শ নেওয়া হবে এবং সাহায্য করা হবে। বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখুন। ফুটপাতে লাগানো গাছগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে সজাগ থাকুন।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস সকলের সক্রিয় সহযোগিতা পেলে কলকাতাকে আরও সবুজ করে গড়ে তোলা যাবে যেখানে সকলে বুক ভরে ভালো বাতাস নিতে পারবেন।

পৌরবাজারগুলিকে লাভজনক করতে চাই

সামসুজ্জামান আনসারি

কলকাতা পৌরসভার তৃণমূল-বিরোধী ছোট নতুন বোর্ড গঠন করার আগে এখন ছাদ পড়েছে বাজার ও আলো বিভাগের দায়িত্ব। দায়িত্ব নেবার দুদিনের মধ্যে আমার রক্ত জলধিকার হয়েছে। দেখেছি কাজকর্মের পদ্ধতি খুব ধীর, কাজের পদ্ধতি বাতিলযোগ্য পর্যায়ের, সেই চেষ্টা শুরু করেছি। বিগত পুরনো বছরের কাজকর্মে তেমন 'ওয়ার্ক কালচার' ছিল না, আমরা 'ওয়ার্ক কালচার'কে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছি। নতুনের উন্নতির চেষ্টা করছি। যেসব বিভাগে ঘাটতি আছে, সেই ঘাটতি পুষিয়ে তাকে লাভজনক অবস্থায় আনতে হলে ওয়ার্ক কালচারের পরিবর্তন হওয়া দরকার।

আমার বাজার বিভাগে কেন কয়েক বছরের ফাইল নিষ্পত্তি হয়নি, কত মিউটেশান ফাইল-এরও একই অবস্থা নিষ্পত্তিহীন অবস্থায় পড়ে আছে। কেন অনেক কোটি টাকা আদায় হয়নি। পুরনো বোর্ডে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এই কাজগুলি শেষ করে যাননি। নতুন বোর্ড আসার পর আমাদের কাউন্সীল মেয়র-এর নেতৃত্বে সেই সব নিষ্পত্তিহীন ফাইলগুলি নিষ্পত্তি করা এবং বকেয়া টাকা আদায় করার কাজকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি।

বিগত অনেক বছরের কর্মকেন্দ্রে অনেকগুলোই বাজার বিভাগে সর্বমোট ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বকেয়া দেখানো হয়েছে। আমি মেয়র-এর নেতৃত্বে চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে আগামী বাজেট আসবের আগে বিভাগ আর ঘাটতিতে না আসে। বাজারগুলি পরিদর্শনের সময় আমি দেখেছি বাজারগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। অনেকগুলি তো এমন খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছে যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়ে বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পারে। আমি সব দেখে অবাক হয়ে গেছি। যাঁরা এত বছর এখানে ক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা বাজারের দিকে নজর দেননি। রক্ষণাবেক্ষণও ভালোভাবে করেননি, বাজারের ক্ষেত্রে নতুন কোন উদ্যোগও গ্রহণ করেননি। মার্কেটগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

কলকাতা পৌরসভায় ২৩টি বাজার আছে। যার মধ্যে অনেকগুলি ভাল অবস্থায় আছে, কয়িগুলির অবস্থা মোটেই ঠিক নেই। এই সব বাজারগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাজেটে যা টাকা ধার্য হয়েছে তা দিয়ে এগুলি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। আমরা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি পীঠাই পরিকল্পনা গ্রহণ করবো যাতে কয়েকটি নির্দিষ্ট মার্কেট উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। আমরা নিজেরা উদ্যোগ গ্রহণ করে উন্নতি সাধন করবো নয়তো কোন ডেভেলপারকে দিয়ে এগুলির উন্নতি ঘটাবো। এছাড়া বাজারগুলির পরিবেশও স্বাস্থ্যকর নয়, পরিচ্ছন্ন নয়। আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি, যাতে বাজারের প্রত্যেক দোকানদার যাঁরা জিনিসপত্র বিক্রি করেন, যাঁরা বাজার করতে আসেন সেইসব ক্রেতারা তাঁদের জন্য ভাল পরিবেশ বিভাগে চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা যায়। কাজটা খুব সহজ নয়—একটু সময় লাগবে, কিন্তু আশা করছি, আমরা সাফল্যলাভ করবো। আমরা কলকাতাবাসীদের মেখাতে পারবো আমরা এসে শুধু চেয়ারে বসে নেই। বাস্তবিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের অনুসন্ধানের আন্তরিকতায় আমরা এই কাজে সফল হবো।

আমার অন্য যে লক্ষ্য সেটি—তাহ বাজেটে এত টাকা যে সেই বাজেটে গোটা কলকাতা শহরকে আলো দিয়ে সাজানো সম্ভব নয়। আমরা ঠিক করেছি কলকাতার কিছু কিছু অঞ্চলে হিসেব করে বাতি এলাকায় এখনও অনেক জায়গায় আলো লাগানো বাকি আছে, সেই সব অঞ্চলে নতুন করে আলো লাগানো হবে। এই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করছি কয়েকটি নতুন ধরনের আলো ব্যবহার করার জন্য। বিশেষ করে ছোট আলো যাই, সোল-এ আমরা আলোর নতুন ব্যবস্থা ব্যবহার করে দেখবো, আলো করি নাগরিকরা পছন্দ করবেন। আলোগুলি দেখতে ভাল ও কম বিদ্যুৎ-এর ব্যবহারকারী হয়। আগামীর ১০০ ওয়াটের জায়গায় কমপক্ষে ২২ ওয়াটের বাল্ব লাগানো হবে। এর ফলে বিদ্যুতের সাশ্রয় হবে, বাল্বগুলির আয়ু বেশি হবে, বেশি আলো হবে এক একই সঙ্গে তা সুন্দর হবে।

বিগত বাজেটের বরাদ্দের কথা আমার মনে আমরা ভাবছি কি করে আগামী বাজেটে বাজার ও আলো বিভাগে বেশি করে টাকার সংস্থান রাখা যায়। যদি রাখা যায় তবেই এই দুটো বিভাগের সম্পূর্ণ উন্নতি সাধন করা যাবে।

আমরা যে অবস্থায় ক্ষমতায় এসেছি, এই জঞ্জাল থেকে উদ্ধার পেতে এবং যথার্থ উন্নয়নের পথে চলার জন্য মহানাগরিকের নেতৃত্বে আমাদের সকলকে মিলেমিশে চেষ্টা করতে হবে। তবেই কলকাতা শহরের মানুষ আমাদের কাছে যা আশা করছে, সেই সময় কাজ তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো।

জোড়া পাখী ও পৌরসভা

অশোক সেনগুপ্ত

১৮৯৯-এর ২৮ ডিসেম্বর। লন্ডন থেকে ফিরলেন এল ফলকাতায়। পৌরসভার প্রতীকচিহ্ন চাই। 'প্রেসিডেন্সি ডিভিশনাল কমিশনার' স্যার অলবনি উইলিয়ম উড পাঠালেন চিঠি। পৌরসভায় সেটি নিয়ে আলোচনা হল 'বিশেষ কমিটি'-তে। পৃষ্ঠীত হল প্রতীকচিহ্ন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা দুটি পাখী। মুখে বাঙ্ময় সাপ। মাথে রাজমুকুট। সেই শুরু। পৌরসভার নথি, বা পৌরভবনে খোদাই হয়ে থেকে সাড়েবসের সেই প্রতীকচিহ্ন। ছবির নিচে লাটিন প্রবাদ 'সার আবদুল্লা সেপিরিনিক এসেন্ট।'

এখনও কলকাতায় পৌরসভার পুরনো দু'একটি দপ্তরে দেখা যায় সেই প্রতীকের খোদাই। দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় ১৪ বছর বয়সে বাধি উঠল, কলকাতা পৌরসভায় সাড়েবসের প্রতীকচিহ্ন রাখা চলবে না। জন্ম পড়ল অনেকটি প্রতীক। শেষ পর্যন্ত গৃহীত হল একটি।

১৯৫১-র ৩ ফেব্রুয়ারি জন্ম পড়ল প্রতীক। গৃহীত হল ২২ ফেব্রুয়ারির বৈঠকে। প্রতীকে এবার লাটিন শব্দের পরিবর্তে বাংলা হরফে, বাংলা ভাষায় বাণী—'পুরশ্রী বিবর্ধন'। তার নিচে লেখা 'কলিকাতা পৌরসংস্থা'। এর নিচের খোপে বজরাপক্ষী নৌকো। আয়তাকার প্রতীকচিহ্নের চার কোনে চারটি বর্গাকার ছোট্ট খোপ। উপরে বাঁ দিকে সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির বার্তাবহ ৮টি পাপড়ির পদ্ম। ডান দিকে শিল্প ও উন্নয়নের চিহ্ন আটি গাছের চারা। নিচে বাঁ দিকে শারীরিক উন্নতির মন্ত্রিপাকর্ত বহ্নিশিখা। ডান দিকে যন্ত্র—গতি আর বৈদ্যুতিক শক্তির চিহ্ন।

বহ্নিশিখা আর যন্ত্রের উপরে ছোট্ট দুটি খোপে জ্বলে ভাসমান মাছ। প্রতীকচিহ্নের মাঝের মূল ছোপটিতে অগ্নি—পবিত্রতা আর শুদ্ধতার বার্তাবহ।

দুই পাখী থেকে পুরশ্রী বিবর্ধন—মাঝে অনেকটা পথ। এই বিস্তৃত সময়ের মধ্যে বদলে গিয়েছে পৌরসভার আইনের, কাজের এবং প্রশাসনেরও চরিত্রও। 'কলকাতা মিউনিসিপাল গেজেট'-এর পাতায় পাতায় সেই পরিবর্তনের আলেখ্য। 'কে লেখেননি তাতে! অতুল প্রসূনচন্দ্র রায়, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন, প্রফুল্ল সুরাবর্দি, বসিলীরঞ্জন সরকার, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, বিপিনচন্দ্র পাল, ফজলুল হক। 'প্রবাসী' আর 'দি মডার্ন রিভিউ'-এর সেকালের অ্যাসোসিয়েট সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় '৩০-এর ২২ নভেম্বর সংখ্যায় লিখলেন, কলকাতার জনসংখ্যা ১১ লক্ষ ৪২ হাজার ২৪৩। আর সিটির ৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৮৮। আলবার্টিয়ানের ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮০৬। হাওড়া-সহ কলকাতার আয়তন সেই সময়ে ছিল ৬২ বর্গমাইল। '২১-এ হাওড়া আর কলকাতার সম্মিলিত জনসংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ২৭ হাজার ৪৪৭। আর এখন ? ১৪২৫ বর্গ কিলোমিটারের শহরে লোকসংখ্যা প্রায় ৯০ লক্ষ।

১৮৯৬-র নভ, ১৯৯১-র নভ। ১৭২৭ থেকেই মেয়র ছোট। পৌরসভায় মেয়র ছাড়াও ছিলেন ৯ জন অলডারম্যান। ১৭৯৪-তে আইনের বলে 'জাস্টিস অব পিস'রা শহরের প্রশাসনের দায়িত্বে এলেন। বাজারে ছল সার্বভৌম রোড। চালু হল শহরের নিকাশি-পরিষেবা। ১৭৯৪-এর আইনের বলে বাড়ির কর এবং পানীয়ের উপর লাইসেন্স ফিস চাপানো হল। ১৮১৯ সালে আদায় হল আড়াই লক্ষ টাকার কিছু বেশি। ১৮৩৯-এ কেবল বাড়ির কর আদায় হল ৩ লক্ষ টাকার উর্ধে।

পৌরসভার মূল পথ চলা শুরু কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলির আমলে। ১৮০৫ সালে তিনি চলে যান স্বদেশে। তার আগেই শহরের উন্নতির রূপরেখা তৈরি করে

আন। ১৮২১ সালে কলকাতায় পাকা ও কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪,১৩০ এবং ৬৭,৫১৯। ১৯৩১ সালে তা থেকে কাঁচার যথাক্রমে ৩৮,৫৭৪ এবং ৮৭,৪৮২। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে তৈরি হল লটারি কমিটি। অষ্টাদশ শতক শেষ হওয়ার দু'দশক আগেই পাকা হল এই রাস্তা। লটারির টাকায় তৈরি হল টাউন হল, কিন্তু রাস্তাঘাট। ১৮৭৪-এ হুগলিনদীতে। ১৮৯৯-তে চালু হাওড়ার কলইখানা। আসছে শহরবাসী, বাড়ছে শহরের পরিধি। টাকাপয়সার কারবার নিয়ে একের পর এক পরিবর্তন হচ্ছে পৌরসভার প্রশাসনিক কাঠামোর।

প্রথম বোর্ড, প্রথম পৌরনির্বাচন নিয়েও জমেছে ঢের অনেকে। ১৯২৪-এর ফেব্রুয়ারি মাস। স্বরাজ দল এর আগের বছরই ক্ষমতায়। দলনেতা ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। কলকাতার প্রথম মেয়রের শিরোপা পড়েছিল তাঁরই মাথায়। '২৪-এর ১৬ এপ্রিলে।

১৯২৩ সালের কলকাতা পৌরসভা আইনে পৌরসভার কাজকর্মের তত্ত্বাবধিনে সর্বময় কর্তা ছিলেন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। '২৪-এর ১৩ এপ্রিল সেই পদে নির্বাচিত হলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র। কর্মিত মাহিত নেতাজীর জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছিল আরও মাসখানেক। ১৬ মে ওই পদে বসলেন তিনি।

ছয় মাস না-কাটতেই প্রেস্তার হলেন সুভাষচন্দ্র। '২৫-এর ২৩ অক্টোবর 'বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডার'-এর বলে ধরা হল পৌরকর্তা নেতাজিকে। আলিপুর জেলে বসেই পৌরসভার কাজকর্ম চালাতে লাগালেন। দেখা করতে জেলে যেতেন পৌর-অফিসারেরা। বেশ কিছুদিন এভাবেই কাটল। এর পর মাস তিনের জন্য জে সি মুখোপাধ্যায়কে ওই পদে বসানো হল। এর মধ্যে সুভাষচন্দ্রকে আলিপুর থেকে প্রথমে বেরহামপুরে, পরে সেখান থেকে পাঠানো হল মেদিনীপুরে। একটা গরজ প্রতিবাদ জানাতে সুভাষচন্দ্র শুরু করলেন অনশন। অসুস্থ হয়ে পড়লেন মেদিনীপুরে। জনমতের চাপে তাঁকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন ব্রিটিশ সরকার। ২৬-এর ১৫ মে, রবিবার ছাড়া পেলেন তিনি। খবর ছড়িয়ে পড়ল। খুশির খবর। পরদিন পৌরসভা অফিস ছুটি হয়ে গেল। তবে ব্রিটিশরা মেদিনীপুর থেকে প্রথমে কলকাতায় না-এনে তাঁকে আনলেন বারাকপুরে। গভর্নর যাতে লাটসাহেবের প্রাসাদে তাঁর শর্তাধীন করতে গেলেন বিধানচন্দ্র রায়, নীলরতন সরকার প্রমুখ ডাক্তারপ্রিন্ট চিকিৎসকেরা। শহরে ডাক্তারেরা তো ছিলেনই।

বিধানবাবু পরবর্তীকালে কলকাতার পৌরসভার মেয়র হয়েছিলেন। '৩১-এর ১৫ এপ্রিল। প্রায় এক বছর ওই পদে ছিলেন তিনি। তাঁর আগে কে মেয়র ছিলেন জানেন? সুভাষচন্দ্র নিজেই। '৩০-এর ২২ অক্টোবর থেকে প্রায় ছ'মাস। দেশবন্ধু আর সুভাষচন্দ্র—এই দুই কৃতী সন্তানের মেয়র পদের মেয়াদের মাঝে ওই পদে ছিলেন আর এক দেশবরেণ্য সন্তান অশ্বিনীকুমার সেনগুপ্ত। পরবর্তীকালে অনেকেই ওই পদে বসেন। এঁদের মধ্যে আছেন ত্রিগুণা সেন, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ।

'৩০-এর ১৩ ডিসেম্বর হাইকোর্ট বিচারালয়ে বিপ্লবীদের অভ্যুত্থানে মারা গেলেন আই ডি ট্রিফন সেশনস্‌জাজ অফিসিয়েটিং এন এম সিম্পসন। অন্যতম ছুন ফিচার লন্ডনের লর্ডস যে ক্রিকেট মেদানে এবং এক ভারতীয় আবার্সি। তুমুল হইচই পৌরসভাতেও। মেয়র ছিলেন নেতাজি কিন্তু প্রথানেই বিপ্লবীদের হয়ে সওয়ালি পেরেছিলেন। পুরনো 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট'-এর পাতায় রয়েছে এ সবের বিস্তারিত প্রমাণ।

১৮৭৯ সালের 'মাদ্রাজ আইন'-এর বলে কলকাতা পৌরসভার প্রথম ভোট হয় ১৯০০ সালের ১৭ মার্চ। এর পরে '০৬, '১৯, '১৫, '১৮, '২১ সালে। '২৩-এর 'বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট'-এর বলে কলকাতার প্রথম পৌরভোট হয় '২৪-এ। এর পরে '২৭, '৩৫, '৩৯, '৩৮, '৪০, '৪৪, '৪৫-তে। ১৯৫২-এ চালু হল 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট'। কেবল '৪১ থেকে '৫০-এর মধ্যেই এই আইন সংশোধন হয়েছে ৯ বার।

১৮৯৯-এর আইনে পৌরসভায় ছিলেন ৫০ জন কমিশনার। এদের অর্ধেক কাউন্সিলর, তখন তাঁদের বলা হত কমিশনার। ৫০টি ওয়ার্ডের প্রতিনিধি ছিলেন তাঁরা। এঁদের ২৫ জন নির্বাচিত হতেন করদাতাদের ভোটে। ১৫ জনকে মনোনীত করতেন সরকার। ১০ জনকে 'এলাকার বাড়ি'। এই ১০ জনের মধ্যে ৪ জনকে বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স, ৪ জনকে কলকাতা ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন, ২ জনকে বন্দর-কর্তৃপক্ষ।

নতুন আইন চালু হওয়ার পরে পৌরসভায় নির্বাচিত হলেন ৮৫টি ওয়ার্ডের 'কাউন্সিলর'। এঁদের ৬৩ জন নির্বাচিত হলেন। বাকিরা মনোনীত। এঁদের মধ্যে ছিলেন ৪ জন 'অলডারম্যান'। এই অলডারম্যানরাই মেয়র, ডেপুটি মেয়র ঠিক করতেন। পুরনো পৌর-পরিষদে দেখা যাচ্ছে '৪৩-'৪৪-তে কাউন্সিলরের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭৫ জন। অলডারম্যান ৫ জনই। এর পরে দু'দফায় বেড়ে কাউন্সিলরের সংখ্যা হল ১০৫। ১৯৮০ সালে নতুন আইন হওয়ার পরে কলকাতার প্রথম পৌরভোট হল '৮৫-তে। তখন সংযোজিত বালিগঞ্জ, মেয়রাল ও গার্ডেনরিচের ৪১টি ওয়ার্ড নিয়ে মোট ১৪১টি ওয়ার্ডে ১৪১ জন কাউন্সিলর। টিকে গেল অলডারম্যান পদ।

দেশবন্ধুর অগ্রগণ্য শিষ্য কলকাতার ছিল মেয়র পদ। তখন তাঁরাই পৌরসভায় কর্তৃত্বে ছিল এককাঠেই বলাবাহুল্য। ১৭২৭ সালে মেয়র পদ্ধতির পৌর-পরিষেবা ও মেয়র ইন-কাউন্সিল দায়িত্বে ছিলেন। ১৭৯৪-তে এলেন 'জাস্টিস অব পিস' (জে পি)-রা। জে পি-দের নির্বাচিত করার প্রথম ভোট হয়েছিল ১৮৪৭-এ।

পৌরসভা সংবাদ

শুরু হল শহরের পথ ধুয়ে দেওয়ার কাজ

সংহার জঞ্জাল অপসারণে বিভাগ কলকাতায় বিশেষ কয়েকটি রাস্তা ফেন জল দিয়ে ধুয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। এ ধরনের উদ্যোগ বহু বছর আগে নেওয়া হলেও তা অল্পেতেই শেষমেশ ধামাচাপা পড়ে যায়। নতুন পৌর বোর্ড ক্ষমতায় আসার পর সংশ্লিষ্ট বিভাগের মেয়র পারিষদ মানস ভুঁইয়ার উদ্যোগে এ নিয়ে ফের আলোচনা শুরু হয়। অধিকারিকদের নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের কয়েক দফা বৈঠকের পরেই শ্রীমতী ভুঁইয়া জানান, শহরের বেশ কয়েকটি রাস্তা জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করার কাজ বাস্তবায়িত করা হবেই। যেমন কথা তেমন কাজ। এরই ভিত্তিতে ১৪ অক্টোবর থেকে শুরু কারওয়াশ-এর মাধ্যমে জল দিয়ে রাস্তা ধোয়ার কাজ। এ কাজের সূত্রপাত ঘটে ওই দিন কলেজ স্কোয়ার চৌরঙ্গিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ মানস ভুঁইয়া সহ পৌর কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

এক মেয়র পারিষদ উদ্বোধন করছেন মেয়র পরিষদ মানস ভুঁইয়া

নগর থেকে ঠিক হয়েছে, ধর্মতলা বালিগঞ্জ রোড, চৌরঙ্গী, এস এন ব্যানার্জি রোড সহ বিভিন্ন ডায়মন্ডকাট, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ডানলপ, ডিস্ট্রিক্টরিয়া মেমোরিয়াল সহ মোট ৪৫টি রাস্তা ধুয়ে দেওয়া হবে প্রতিদিনই। উল্লেখ্য, নির্বাচনী ইস্তাহারে তৃণমূল কংগ্রেস শহরের রাস্তা ধোয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল। মানস বাবুর উদ্যোগে সেই আশ্বাস এখন বাস্তবায়িত হল।

উল্লেখ্য, শহরের প্রথম পর্যায়ে রাস্তা ধোয়ার কাজ শুরু ১৪ অক্টোবর থেকে শুরু হলেও ২৩ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে এর ২য় পর্ব। প্রাথমিক পর্যায়ে ছটি রাস্তায় এ কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্বে শুরু হয়েছে বিবেকানন্দ রোড, কলেজ স্ট্রিট, হরিশ মুখার্জি রোড, হজরা রোড, আশুতোষ স্ট্রিট, চৌরঙ্গীর প্রভৃতি রাস্তা ধোয়ার কাজ। মেয়র পারিষদ মানস ভুঁইয়া জানিয়েছেন, ধাপে ধাপে গোটা শহরেই রাস্তা ধোয়ার কাজ পর্যায়ক্রমে শুরু হবে।

বিদ্যাসাগর স্মরণে

কলিকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে ২৩ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্রভারতীর এক অনুষ্ঠানে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-৯১) জন্মদ্বিশতী উদ্‌যাপন করা হয়।

বিদ্যাসাগর উদ্যানে (অলেন্স রোডের) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন মহানগর চেয়ারম্যান অনিল মুখার্জি। মেয়র পরিষদ মানস ভুঁইয়া, প্রাক্তন পৌর চেয়ারম্যান শ্রীপৃথ্বী সেনগুপ্ত, তথা ও জনসংযোগ কর্তৃপক্ষের ভারপ্রাপ্ত উপমুখ্যপাত্রক তপন শিকদার প্রমুখ অনুষ্ঠানে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন।

কলকাতা পৌরসংস্থা আগামীতে এই অনুষ্ঠানে একটি করে সাধারণ আলোচনা চক্র এবং ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিবিদ্যক বিদ্যাসাগরের জীবনকৃতিত্ব পুষ্পার্ঘ্যবরক প্রদান করবেন।

দুর্গতদের সাহায্যার্থে মহানাগরিকের ডাকে কর্মী মহলে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার বন্যাদুর্গতদের সাহায্যার্থে কলকাতা পৌরসংস্থার প্রায় ৪০ হাজার কর্মী ও অধিকারিক তাঁদের মাসের টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর পরিমাণ প্রায় ১৯ লক্ষ টাকা। শুধু পৌরকর্মী এবং অধিকারিকই নন, পৌরসংস্থার কলমচারিবিশেষে সমস্ত কাউন্সিলার মেয়র পারিষদবৃন্দ তাঁদের এক মাসের বেতন ত্রাণ তহবিলে দিচ্ছেন।

মেয়র মাহলেরও বিদেশ ঈদে এক মাসের প্রায় সাম্মানিক ভাতা।

মেয়র সহ কাউন্সিলর, অতিরিক্ত মেয়র পরিষদবৃন্দ প্রমুখের বেতন সহায়তার পরিমাণ গত ডিসেম্বর থেকে ৫৩ লক্ষ টাকার বাজেটের বলে অনুমান করা হচ্ছে।

ইতিমধ্যে মেয়রসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাধারণের জন্যও মহানাগরিক সংবেদনশীল ও সৌর বৃত্তপথে যুক্ত হয়ে যান করার অনুরোধ জানিয়েছেন। খবর এল, এই সূত্রের বিভিন্ন দফতর ও সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু মন মেয়রস ট্রাম ডিপোতে জমা পড়ছে।

উল্লেখ্য, কলা বৃত্তপথের জন্য ট্রাম ডিপোতে যুক্ত হয়ে যান করার বিষয়টি নিয়ে মহানাগরিক বীক্ষণ ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক বৈঠকে ২৮ সেপ্টেম্বর সিদ্ধান্ত হল। নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে মহানাগরিককে সর্বপ্রকার সহযোগিতারও আশ্বাস দেন।

সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি

কলকাতা পৌরসংস্থার পৌর প্রতিনিধিদের সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে এই ভাতা বৃদ্ধি হবে মেয়র মহানাগরিক সহ তাঁর পারিষদবৃন্দেরও।

গত ১ অক্টোবর থেকে নতুন ভাতা বৃদ্ধির সুপারিশ কার্যকর হচ্ছে। মেয়র পরিষদের বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তে স্থির হয় এখন থেকে পুরপিতাদের ভাতা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮০০ টাকা হবে। আগে প্রতি মাসে এর পরিমাণ ছিল ১৫০০ টাকা। নতুন হারে ভাতা বৃদ্ধির ফলে ডেপুটি মেয়র এবং পৌর চেয়ারম্যানের বর্ধিত সাম্মানিক ভাতার পরিমাণ হল ২৪০০ টাকা। মহানাগরিকের ভাতা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াচ্ছে ২৬০০ টাকা।

জন্মদিনে গান্ধীজির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনে (২ অক্টোবর) তাঁর এক তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করা হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার কেন্দ্রীয় ভবনে মেয়রের অফিসঘরে এই তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন কলকাতার মহানাগরিক সুব্রত মুখার্জি।

এইদিন বেলা ১২টায় মহানাগরিকের অতিথিকক্ষে ছোটখাটো এক অনুষ্ঠানেরও

মেয়রের অতিথিকক্ষে গান্ধীজীর তৈলচিত্রে প্রথম ফুলমাল্য দিচ্ছেন মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়

আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে মেয়র পরিষদ সদস্যবৃন্দের মধ্যে ছিলেন রাজ, শোভন চট্টোপাধ্যায়, স্বপন সমাদ্দার, রূপচাঁদ পাণ্ডে, রাজীব মেহতা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পৌরসংস্থার চেয়ারম্যান অনিল মুখার্জিও এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে মেয়র পারিষদবৃন্দের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। নাগরিক ভাষণে মহানাগরিক সুব্রত মুখার্জি মহাত্মাজীর অহিংসা, ভালবাসা নিয়ে আলোচনা করেন। মহানাগরিকসহ অন্যান্য মেয়র পরিষদবৃন্দ মহাত্মাজির তৈলচিত্রে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। অনুষ্ঠানে পৌর প্রতিনিধি, সংস্থার মুখ্য পৌর মহাধ্যক্ষ জনাইলাল বিশ্বাস, পৌর সচিব সহ অন্যান্য আধিকারিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন

কলকাতা পৌরসংস্থা ও সংবেদ প্রতিদিনের যৌথ উদ্যোগে গত ২৪ সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় পুরভবনে কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের প্রাক্-১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়।

এদিন সংস্থার কাউন্সিলারস ক্লাব রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখার্জি কথাসাহিত্যিকের সাহিত্যে ভাবনা, চরিত্রায়ণ বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার আহ্বান জানান। কথাসাহিত্যিক প্রাক্-১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে পৌরসংস্থা ও প্রতিদিনের 'পড়াশুনোর' যৌথ উদ্যোগে এক প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন মহানাগরিক।

সংবেদ প্রতিদিন পত্রিকার চিফ রিপোর্টার নারায়ণ বসু এই অনুষ্ঠানে বলেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণের অভিযানে গ্রন্থ করে আজ ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে আসতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পৌর চেয়ারম্যান অনিল মুখার্জি, মেয়র পারিষদ মইনুল হক চৌধুরী, প্রবীণ মেয়র, মালা রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পড়াশুনো পত্রিকার সম্পাদক সুব্রত বাগ।

রুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে কলকাতা পৌরসংস্থা প্রকাশিত বই পড়ুন

ছোটদের জন্য

আমাদের সুভাষ

সাধারণের জন্য

মুক্তির সংগ্রাম ও কলকাতার পথে

C. V. Raman Birth Centenary Issue

Anthology Number 1924-1947

Netaji Birthday Com. Vol. Centl. eve-tribute

C. M. Gazette-Netaji Centenary Issue

Calcutta-a set of Pictures

Calcutta at a Glance

কলকাতা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে তথ্যসমৃদ্ধ পুস্তিকা নিয়মিত পড়ুন

উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সারা বছর পাবেন।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

১, হগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০ ০৮৭

আমাদের লক্ষ্য
আরো পরিচ্ছন্ন
সবুজ সুন্দর
গতিশীল কলকাতা

নাগরিক পরিষেবায় আমরা সদা জাগ্রত

কলিকাতা পৌরসংস্থা

কলকাতা দূরশ্রী

বন্যাদুর্গত মানুষের সাহায্যে
মেয়রের ত্রাণ তহবিলে
মুক্ত হস্তে দান করুন

মেয়রস রিলিফ ফাণ্ড
কলিকাতা পৌর সংস্থা
৪ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

কলকাতা পুরশ্রী

২৭ নভেম্বর, ২০০০

কলকাতা পৌরসভার এখন প্রতিদিন নতুন নতুন কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা ঘটছে। গত ৪ মাসের মধ্যে অনেকগুলি নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন ঘটেছে। এবারের সংখ্যায় কথাশিল্প সংস্থার সহযোগিতায় কলকাতার পানীয় জলের ব্যবস্থার প্রণালী পরিচালনা ব্যবস্থা কীভাবে উন্নয়ন করা যায় এই নিয়ে একটি নতুন প্রকল্পের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের কথায় ____.

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয় ☐ ২

কলকাতা পৌরসভার নতুন বোর্ড-এর ১০০ দিন ☐ ৩

আরণ্যপল্লী নিখনের কলকাতা আগমন ৫

হিটিলার / শীতুলকুমারী মল্লিক ☐ ৮

সেকালের 'শঙ্কা জ্বর'—একালের

'ম্যালেরিয়া' / ধরিপদ ভৌমিক ☐ ১৭

উন্নয়নে রাজনীতি আর এসে ইতিহাসে কথা বলবে না ☐ ২৩

পৌরসভা সংবাদ ☐ ২৭

সম্পাদক অমলেন্দু ভট্টাচার্য

সহযোগী অরুণকুমার রায়

মূল্য : ১ টাকা

প্রধান সম্পাদক অনুপ মিত্র

এশিয়ান পৌরসভার আগ্রহ মুদ্রণের পুরশ্রী, ৩৮ এ অমলেন্দু বিকাশ, ১ ম তল, ৫৯ বিডিবাগ (৪র্থ তলা), কলকাতা-৭০০ ০০১ থেকে অনুপ মিত্র দ্বারা প্রকাশিত এবং অনুপশ্রী অফসেট প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক ১৮৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

দেখতে দেখতে কলকাতা পৌরসভায় নতুন বোর্ড-এর কার্যকাল চারবছর অতিক্রান্ত হতে চললো। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে নাগরিক পরিষেবাকে আরও উন্নত করতে পৌর বোর্ড পেরেছে কতটা? এই বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে একটি লেখায়।

বিগত বেশ কয়েকটি সংখ্যায় 'কলকাতার প্রতিবেশী' বিষয়ক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এবারের সংখ্যায় লেখার বিষয় কলকাতার শিখ।

কলকাতায় ম্যালেরিয়া নতুন নয়। তিনশো বছরের কলকাতায় কীভাবে জ্বর আসতো এবং তার চিকিৎসা কত—সেই নিয়ে এবারের সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হল।

কলকাতা পৌরসভায় নতুন বোর্ড-এর ১০০ দিন

কলকাতা পৌরসভায় তৃণমূল-বি জে পি জোট ক্ষমতা দখল করে পৌর প্রশাসনের ভার নিয়েছে গত ৮ জুলাই। দেখতে দেখতে ১০০ দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। নাগরিক মেজাজ পরিবর্তনের পক্ষে সময়কালের হিসেবে ১০০ দিন এমন কিছু বেশি সময় নয়। নিজেদের বিভাগের প্রতিটি কাজ বুঝে নিয়ে সামগ্রিকভাবে এগুলোকে আনার লক্ষ্যে সকলেই সচেষ্ট হয়েছেন। প্রায় প্রত্যেক পরিষদই তাঁর নিজ নিজ বিভাগগুলি পরিদর্শন করে, কি ধরণের কাজ হয়, কাদের কোথায় কোথায় অসুবিধা ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়েছেন। ফলে এখন কাজ বিচারে নিতে অসুবিধা হচ্ছে না। পৌরসভার মূল বাজেট আয়ের সন্ধান। কিভাবে বিভিন্ন নতুন প্রকল্প রূপায়ন করা যায়, কোথায় টাকা কিভাবে আসবে তা ভাবনা-চিন্তা করে নতুন পথ খোঁজার কাজ চলছে। এই কাজে মেয়র পরিষদদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করে চলেছেন মহানাগরিক স্বয়ং। তিনি নিজেও কলকাতাবাসীর হয়েই নাগরিক পরিষেবার মূল ক্ষেত্রগুলি যথা পানীয় জল, রাস্তা, বিভিন্ন পাম্পিং স্টেশন, শ্মশানঘাটগুলি, টালির নালা, উত্তরপাড়া-কোতরং ইত্যাদি পরিদর্শন করে সরেজমিনে কাজকর্ম দেখে এসেছেন। অর্থ সংকট কাটানোর লক্ষ্যকল্পে পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক বিভেদরেখাগুলির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য ১৫টি বরোর পরবর্তীতে চেয়ারম্যান নির্বাচন পর্ব সাঙ্গ হয়েছে। প্রত্যেক মাসেই নিয়মিতভাবে কলকে পৌরসভার অধিবেশন।

এখন সংক্ষেপে দেখা যাক এই শাসনে তিনমাসে কোন বন্দরে কি কি কাজ হয়েছে।

জলনিষ্কাশন ব্যবস্থা ঃ কিভাবে

গত ৩১ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার আদীগাঙ্গ পার্কে একটি ভূগর্ভস্থ জলাধারসহ বৃষ্টির স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে। ৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়ে গেছে। কাজ শেষ হলে ৭৫, ৮৩, ৮৪ এবং ৮৭ নং ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দারা সমস্যামুক্তি এবং ৬৮, ৬৯, ৭২, ৮৫, ৮৬, ৯৮ এবং ১০ নং ওয়ার্ডে জলনিকাশকারী এক বিরাট সংখ্যক নাগরিক পরোক্ষভাবে উপকৃত হবেন।

জল সরবরাহের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই জলের মিটার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে। প্রথমদিকে কলকাতার মিটার বড় বড় অফিসগুলিতে যেমন বেসরকারী ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বসানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই মিটার বসানো হয়েছে কালীপুরের নাম এস্ক স্পেস-এ, ৩নং অকল্যান্ড স্কোয়ার-এ, ২৬বি, পি কে টেগোর স্ট্রিট-এ, নেতাজী সুভাষ রোডের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এ, জগদীশচন্দ্র বসু রোড অবস্থিত বর্তমান পরিচালন অফিসে, শিয়ালদহে ই এস আই হাসপাতালে।

নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখ পৌরসভার সঙ্গে ওলন্দাজ পরামর্শদাতা সংস্থা কৌণ্ডহাভে 'টেলিমেট্রি' নামক আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে ভূগর্ভের জলের পাইপের মজিলার মানচিত্র তৈরি করার কাজ শুরু করেছে। আগামীর প্রতিটি ছিদ্র অর্থাৎ ২০ ইঞ্চির বেশি ব্যাসার্ধের পাইপলাইন পরীক্ষা করা হবে। এই কাজ হবে পৌরসভার ১ থেকে ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে।

১০১ থেকে ১৪১ নম্বর ওয়ার্ডের জন্য একই ধরনের মানচিত্র তৈরি করার জন্য জার্মান গবেষকদের একটি পরামর্শদাতা সংস্থার সঙ্গে পৌরসভার প্রাথমিক চুক্তিও হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ১ থেকে ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে ভূগর্ভস্থ পাইপের একটা বড় অংশ জীর্ণ হয়েছে। ফলে জলের কমটা জলপড় হচ্ছে যা অতিপানি

এবারের পথে চলতে অসুবিধে হবে না: মেয়র উদ্বোধনে প্রস্তুতপর্বে শীর্ষে থেকে ডান দিকে পরিবহণকর্তা প্রীতমকুমারী পুরোহিত, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় মেয়রমন্ত্রী ফরহাদ হাকিম ও ধরণীধারিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

নাগরিকদের কাছে পৌঁছচ্ছে তা এই ফরাসি প্রকল্পের মাধ্যমে জানা যাবে।

জঞ্জাল অপসারণ

কলকাতা পৌরসভার অন্তর্গত ১৪১টি ওয়ার্ডে জঞ্জাল অপসারণের যে পদ্ধতি চালু ছিল তাকে অব্যাহত রেখে একটি বিশেষ কর্মসূচি বাড়ি থেকে গাড়ি, গাড়ি থেকে বাগ্‌ প্রকল্পে ঢিলে ঢিলে পরিবর্তিত করার ভাবনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এই নতুন কর্মসূচির আওতায় যোধপুর পার্ক ও মিডি আলিপুরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জঞ্জাল অপসারণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ২৫টি গাড়ি কাজ শুরু করেছে। পরে এই সংখ্যা বেড়ে হবে ৪০টি। এই ধরনের প্রকল্পের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করছে নাগরিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সচিবের সহযোগিতার ওপর।

কলকাতাকে পরিবেশ দূষণ এবং ধূলা দূষণের হাত থেকে মুক্ত রাখার সঙ্গে সঙ্গে জঁবসংহারের মাধ্যমে জঞ্জাল অপসারণ নিয়মিত অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মেয়র পরিষদ খালা হাত নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে প্রতিদিন শহরের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি ধোয়ার কাজ। প্রাথমিক পর্যায়ে রানী রাসমণি রোড, চৌরঙ্গী, এস এন ব্যানার্জি রোড-সহ বিড়লা তারামণ্ডল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংলগ্ন রাস্তাগুলি ধোয়া শুরু হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিধান সরণি, কলেজ স্ট্রিট, হরিশ মুখার্জি রোড, হাজরা রোড, রাজা রামমোহন সরণি, গৌরাঙ্গর স্ট্রিট প্রভৃতি রাস্তা ধোয়ার কাজ শুরু হয়েছে। মেয়র পরিষদ জানিয়েছেন, পর্যাপ্ত পরিমাণে জল না থাকায় ইচ্ছে থাকলেও একই সঙ্গে শহরের সব রাস্তা ধোয়ানোর কাজ শুরু করা যাচ্ছে না। এই জন্য ঠিক হয়েছে ধাপে ধাপে গোটা শহরেই এই কর্মসূচি শুরু করা হবে।

নিকাশী

এবারের বর্ষায় কলকাতার রাস্তায় জল জমা নিয়ে তেমন কোনও বড় অসুবিধার পড়তে হয়নি নাগরিকদের কারণ, নিকাশী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পরিষদ সর্বদা এই ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। দায়িত্বভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি নিকাশী ব্যবস্থাগুলি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং কর্মরত কর্মীদের উৎসাহ দেন। যুদ্ধকালীন প্রস্তুতিতে পয়ঃপ্রণালী ও গ্যালিপিটের সংযোগকারী পাইপের মাটি ও পলি পরিষ্কার করা হয়।

নতুন অনেকগুলি প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে সাদার্ন এভিনিউ-এর সাউথ এন্ড পার্ক থেকে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা ও তৎসহ রবীন্দ্র সরোবরের জমা জল সমস্যার সমাধানে সাদার্ন এভিনিউ পাম্পিং স্টেশন।

মন্ত্রী বিকাশ অ্যালার্জিক ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে একটিকরণের প্রস্তাব করার অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেয়র [illegible] মেয়র পারিষদ অমূল্য মুখোপাধ্যায়, মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, ঔষধনাগরিক ঈশ্বরদাসী মুখোপাধ্যায় ও মেয়র পারিষদ [illegible]

মল্লিকতলা ও উল্টোডাঙ্গা পাম্পিং স্টেশনগুলিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। কেনার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কয়েকটি আধুনিক পলি অপসারণের যন্ত্র।

রাজ্য বিধানসভার পৌরসভার বিষয় কমিটির সদস্যেরা ইতিমধ্যেই নালা খালগুলি পরিদর্শন করে এসেছেন। রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে খালগুলি সংস্কারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

শিক্ষা ও তথ্য জনসংযোগ

শিক্ষা, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ মইনুল হক চৌধুরী কাজের দায়িত্ব নেবার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম যে কাজটি করেছেন তা হল, ৩০৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরিদর্শন করা, সেখানকার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অসুবিধা ও সমস্যার বিষয়গুলি সম্বন্ধে খবরাখবর নেওয়া। প্রতিটি বিদ্যালয় পরিদর্শনের সময়ে তিনি লক্ষ্য রাখছেন আসবাবপত্র ঠিক আছে কিনা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা আছে কিনা, পানীয় জলের সংস্থান যেমন ইত্যাদি বিষয়। ইতিমধ্যে তিনি আরও একটি কাজ করেছেন যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য তা হল, ৩০৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলা, হিন্দি ও উর্দু প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে কাউন্সিল কক্ষে মিলিত হয়ে সকলের সঙ্গে তাঁর বিনিময় করেছেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সময় থেকে কলকাতা পৌরসভা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ভার নিয়েছিল। নতুন মেয়র পারিষদ একটি বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা নিয়েছেন। পুনরায় প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাল-তোলা প্রথা চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে, পৌরসভার অতিরিক্ত স্থানাভাব না থাকায় বিভিন্ন এন জি ও স্বনামধন্যদের মাধ্যমে ছাত্র। ছাত্রীদের ইউনিফর্ম ও জুতা পায়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এটি নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী পদক্ষেপ। তাঁর অধীন তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ পৌরসভার নিয়মিত স্তরে অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানগুলি সুসম্পন্ন করেছে। নতুন হিসেবে কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের প্রায় ১২৫তম জন্মদিবস ও বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুটি অনুষ্ঠানই অভিনবত্বের দাবি রাখে। পুরস্কৃত পত্রিকাও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

মেয়র পারিষদ অতি সম্প্রতি দিল্লিতে কেন্দ্রিয় মানব উন্নয়ন মন্ত্রী মুরলীমনোহর যোশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পৌরসভার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ১০ কোটি ২০ লক্ষ টাকা অনুদানের দাবিপত্র পেশ করেছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগ

স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্ব নেবার অল্প সময়ের মধ্যেই মেয়র পারিষদ জগতের খান ম্যালেরিয়া নিয়ে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি নিয়মিত

পৌরসভাকে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের পরামর্শ দিয়ে আসছে। স্বাস্থ্য বিভাগ জরুরি ভিত্তিতে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা করার জন্য সমীক্ষা প্রচারও করে আসছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে 'স্লাইড' প্রদর্শন করা হচ্ছে। ৩টি গাড়ি টহল কলকাতার শ্যামবাজার থেকে দক্ষিণে গোলপার্ক পর্যন্ত ৭৩টি মেটেরুসটিভেটরের একটি প্রচার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। তাদের সঙ্গে থাকবে মাননীয় মেয়র, মিনিমেয়র ইত্যাদি।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে কলকাতা পৌরসভায় এলাকাভুক্ত ১৪১টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে অন্তত একটি করে রক্ত পরীক্ষার কেন্দ্র খোলার, যাতে মানুষ সহজে রক্ত পরীক্ষা করে জানতে পারবেন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত কিনা। লায়ন্স ক্লাবের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রচারমূলক ডিসিপ্লেসন করা হবার ওক করেছে। এগুলির মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত পরীক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে জঞ্জাল নিষ্কাশনের সঙ্গে সম্বয়সাধনের বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলি ইতিমধ্যেই সপ্তাহে অভিযান চালানো হচ্ছে। বড় বড় পুষ্করিণী বা জলাশয় থেকে কচুরিপানা নির্মূল করার অভিযান চালানো হচ্ছে।

পৌরসভার বীতির অধিক অঞ্চলের মধ্যে একটা কথা বলা হচ্ছে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগসন্ধানের।

স্বাস্থ্য দপ্তরে শোনা জেলার বা অন্যান্যদের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য লোকজনের সংখ্যা বেশি না থাকা সত্ত্বেও মহল্লার ক্লাব ঐতুলির অভিনন্দনের জন্য সেখানে প্রতিদিন যেন কিছু সংখ্যক মানুষ পাখায়-পাখায় করেন একটি আবেদনপত্রি প্রকাশ করেছেন। এই ১৩ জন আবেদনকারীর পালিত হলে স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে পাখার ব্যবস্থা নিশ্চিত হবে। আগামী কয়েক মাস জলকলাবাসীর কাছে মাসে ম্যালেরিয়া কেলেঙ্কারির আবহাওয়া না হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে বর্তমানে স্বাস্থ্য বিভাগ খুবোমাত্রে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ অভিযানে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছে।

পার্কস অ্যান্ড গার্ডেনস

পার্কস অ্যান্ড গার্ডেনস বিভাগের অধিকর্তা দায়ার পর মেয়র পরিষদ প্রস্তাবগুলি ওপ্ত পার্কগুলির বর্তমান অবস্থা সরেজমিনে পরীক্ষা করার জন্য অনেকগুলি পার্ক পরিদর্শন করেছেন। ইতিমধ্যেই তিনি বিভিন্ন পার্কগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার হাতে তুলে দেবার ব্যাপারে তৎপরতা শুরু করেছেন।

বর্তমানে অনেকগুলি পার্কে সন্ধ্যার সময়ে অসামাজিক কার্যকলাপ হয় এবং বেআইনীভাবে দখল নেওয়া আছে এগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। বাজেটে সংস্থান বেশি না থাকায় মেয়র পরিষদ ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা টি এন শেষনের সঙ্গে দেখা করে আগামী পাঁচ বছরের জন্য ৫০ কোটি টাকা অনুদানের দাবিনামা পেশ করে এসেছেন।

কলকাতাসংলগ্নের সময় থেকে প্রতিটি প্রবেশপথে কিছু কিছু করে ফুল গাছ লাগানো হয়েছে।

বস্তি উন্নয়ন

বস্তি উন্নয়ন ও সাফাই বিভাগের তারপ্রাপ্ত মেয়র পরিষদ প্রবীণ ঘোষ বস্তিতে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা, কর্মক্ষম নারী-পুরুষের সংখ্যা, শিশুর সংখ্যা, ভাষা, জীবিকা, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত একটি রিপোর্ট তৈরি করাচ্ছেন।

পার্টির জোন নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করছেন কি করে পৌরসভায় আয় বৃদ্ধি হয়। নতুন নতুন রাস্তাকে পার্টির জোনের আওতায় আনার বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা চলছে।

বস্তির পৌরোদায় ব্যবস্থার উন্নয়নে ইতিমধ্যে তিনটি সুলভ পৌরোদায় চালু করা হয়েছে। ১৪টির কাজ চলছে। নতুন ১০টির জন্য অর্থের যৌথ করা হচ্ছে।

অন্যান্য

বন্যার বিভাগ হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই মেয়র পরিষদ বাজার বিভাগের পক্ষ অধিকারিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বৈঠকে বসছেন হাতে আর ও আরও নতুন সমস্যা আসে। ফলও বলেছে পৌরসভার বাজার বিভাগে আয় বৃদ্ধি হয়েছে।

নিউ মার্কেটে গম্বুজের কাজ শেষ হয়েছে আগামী-মেরামতি হবে। কেন্দ্র টু ফায়ারপ্রুফ দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে, সেটি সংস্কার ও নতুন ভাবে সাজানো হচ্ছে। তার এই সব কাজ করবে সঙ্গে সঙ্গে বাজারে বাজার করতে আসা ক্রেতাদের জন্য ৬টি টাওয়ার শৌচালয় তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, শ্যামবাজার মার্কেটের কাজ দীর্ঘদিন বন্ধ হয়েছিল। মেয়র পরিষদের উদ্যোগে কারিগরী সংগঠনদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে বর্তমানে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে আগামী দিনে কলেজ স্ট্রিট বাজার, এন্টালী বাজার, এসপ্লেনেড বাজার ও উল্টোডাঙ্গা বাজারের এই ধরনের পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করার। মানিকতলা বাজারে অনেকটা কাজ হয়ে আবার পর কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ম্যানিং এজ ডেভেলপমেন্ট, ব্যবসায়ী সংগঠন ইত্যাদির সঙ্গে বসে কিভাবে কাজ শুরু করা যায় তার কথা তৈরি করা হচ্ছে। গড়িয়াহাট বাজারে লিফ ভেঙে যাওয়া বসবাস করছেন তাদের নোটিস দেওয়া হয়েছে। এই বাজারেও পূর্ণ উন্নয়নের কাজ শুরু হবে।

জন্মা

নতুন মেয়র পরিষদ অধিষ্ঠিত গেয়েই নির্দেশ দিয়েছেন রাস্তার খানা-খন্দ ভরাট করার। এর সঙ্গে পূজার সময়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল কলকাতার মেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা মেরামতির। দুর্গাপূজা ও কালীপূজা-র সময়ে বিভিন্ন পাড়াগুলোর সামনে রাস্তাগুলি সারানো ইত্যাদি কাজ পৌরসভার নিজস্ব

মুখ্যত পৌরসভার টিকাকরণ অনুষ্ঠানে মেয়র পরিষদ প্রবীণ মেয়র ও চেয়ারম্যান মেয়র।

শোকজ্ঞাপন ও বাইরের কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে সুন্দর ভাবে করা হয়েছে। নতুন বোর্ড ক্ষমতায় আসার পরে বেহালা, বালবপুর, গার্ডেনরিচ এলাকায় কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে রাস্তা-ঘাটের প্রচুর কাজ হয়েছে। এই বিভাগের তরফে অতি শীঘ্রই সাড়ে ২২ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি নতুন পে-লোডার কেনা হচ্ছে। বিভাগের তরফ থেকে সর্বদাই চেষ্টা হচ্ছে কিভাবে রাস্তার গুণাগুন বজায় রেখে দ্রুত ভাল মেরামতি করা যায়।

নতুন বোর্ডের পক্ষে ১০০ দিন বা সাড়ে তিন মাস সময় এমন কিছু বেশি সময় নয়। তারই মধ্যে বেশ অনেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। তারমধ্যের সমস্ত পৌরসভার মধ্যে কলকাতার সর্বপ্রথম নিজস্ব ওয়েবসাইট চালু হয়েছে। পৌর প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণের কর্মশালা শুরু হয়েছে। সমস্ত কাজেই মহানাগরিক জনগণের সহযোগিতা চেয়েছেন। নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া কোনও প্রকল্পই সাফল্য লাভ করতে পারে না।

বিল্ডিং ও লাইসেন্স

নতুন বোর্ড-এর বিল্ডিং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পরিষদ প্রথম থেকেই চেষ্টা করছেন কীভাবে সাধারণ মানুষদের অহেতুক হয়রানির হাত থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। ঠিক হয়েছে, বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে ছাড়ের প্রশ্নে দরদ মনোভাব নেওয়া হবে কম জমির মালিকদের ক্ষেত্রে। সর্বোপরি দপ্তরকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অনলাইনে দপ্তরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গড়ে তোলা হচ্ছে নতুন 'ডিমোলিশন স্কোয়াড'।

লাইসেন্স সংক্রান্ত আইন-কানুনেরও সরলীকরণ করার চেষ্টা চলছে। বিনা লাইসেন্সে শহরে আউকে ব্যবসা চালাতে দেওয়া হবে না। অতি শীঘ্র পৌর এলাকার ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের টিটাগড়ের মাছ বাজারে ৪০ জন ব্যবসায়ীকে কম্পিউটারাইজড লাইসেন্স দেওয়া হবে। শীঘ্রই ৬১ নম্বর ওয়ার্ডের ফুলিরাম মার্কেটেও এই ধরনের লাইসেন্স দেওয়া হবে। ভাবনা চলছে মল্লিকঘাটে ফুল বিক্রেতাদেরও লাইসেন্স দেওয়া। সমস্ত মিলে লাইসেন্স বিভাগে চেষ্টা চলছে কীভাবে উপায় বাড়ানো যায়।

ভারতপন্থী শিখদের কলকাতা আগমন ও স্থিতিলাভ

পীযূষকান্তি রায়

এক

বিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থের তাগিদে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর প্রায় তিনখানি গ্রামে বসবেরা শহরের মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে একটি আধুনিক নগরী কলকাতার মর্যাদা পেল। তা ছাড়া ইংরাজদের বাজনীতির প্রাধান্যেরপ্রশ্নে সংস্থাপিত হল ইংরেজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বিদেশিদের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তের মানুষও এ মফস্বলটিতে এসে বসতি গড়তে শুরু করল।

উনিশ শতকে আর অধিকারে আসার পেছে দিল্লিকলে পরে বঙ্গদেশে আগমন ঘটেছিল আর সরাসরি এবং ক্রমে সমগ্র ব্রিটিশভারতই আর সরকারের পরিবেষ্টনীতে হিন্দুস্থানের এক বৃহত্তর গোষ্ঠীরূপে চিহ্নিত হল। ভূমির অর্থে সন্ধানরা অনেকেই প্রকৃতির প্রেরণে পাহাড়ি বনাঞ্চলে আবার নিজ ভাবের স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য। হিন্দুধর্মের নানা তীর্থ ও মাহাত্ম্য ছড়িয়ে আছে ভারত উপমহাদেশের নানা জায়গায়। তাছাড়া জ্ঞানচর্চার পীঠস্থানরূপেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল বারাণসীর মতো কিছু এ ভারতবর্ষের নানা প্রাচীন শহর। তাই ভারতবর্ষের অন্যান্যদের তীর্থসাধনা ও জ্ঞানপিপাসা নিবারণের জন্য ভারতীয়রা প্রাচীনকাল থেকেই বিপদসংকুল স্থল ও জলপথে নানা প্রান্তে যাতায়াতের সূচনা করেছিল। এমনই ধারাতে নিশ্চয়ই পাঞ্জাবের সঙ্গে বঙ্গ প্রাচীনকালেই বঙ্গদেশেরও একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল যা নিম্নোদ্ধৃত তথ্য জানা যায়।

আমাদের প্রধান আধুনিক নগরী কলকাতায় পাঞ্জাবের শিখ ধর্মাবলম্বীদের আগমন ও বসবাস বিষয়ে। অন্যদের মতো ভারতীয়দের আগমন ঘটেছে আধুনিক কালেরই, তাদের মধ্যে পাঞ্জাবের শিখধর্মাবলম্বীদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তারা এ নগরীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে স্থানীয় মানুষের সুখদুঃখের অংশীদার হয়ে এসেছেন দীর্ঘকাল ধরে। তাদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, আচারব্যবহারের ইতিবাচক, ধর্মীয় উদারতা ও নম্র ভাবনা সকলকে এক অনাস্বাদিত স্বভাব চিরদিন কলকাতাবাসীদের আকর্ষণ করে এসেছে। বীণাপাণী ভাবনায় অনন্যসাধারণ শিল্প নিজ মুখে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য কলকাতাকে শুধুই ব্যবহার করেছে এক মুক্ত প্রাঙ্গণ হিসেবে।

দুই

পাঞ্জাব থেকে কলকাতায় শিখদের উপনিবেশ প্রথম কে কখন করে এসেছিলেন তা এক কৌতূহলজনক অনুসন্ধানের বিষয়। এ প্রসঙ্গটির সঙ্গে জড়িত প্রাচীন কলকাতার শিবমন্দির ভিত্তিক অনেকেরই আগ্রহ ঐতিহাসিকদের প্রতিদিনে। কলকাতা নগরীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে আমরা জোব চার্নকের নাম জেনে থাকি। ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট সুতানুটি গ্রামে এসে তৃতীয় ও শেষবারের মতো জোব চার্নক নেমেছিলেন। ঐ সময় পরপরপরি তিনখানি গ্রাম ছিল তিহি কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর। ১৬৯৮ সালে সবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই গ্রাম তিনটির স্বত্ব কিনেছিল। এ গ্রাম তিনটির সীমা ছিল মোটামুটি : গোবিন্দপুর—বর্তমানের এসপ্লানেড থেকে এসপ্লানেড, কলকাতা—এসপ্লানেড থেকে বড়বাজার পর্যন্ত, সুতানুটি—বড়বাজার থেকে বাগবাজার পর্যন্ত। কলকাতা গ্রামের পরিসীমা সম্বন্ধে আরও বলা হয় যে তা এসপ্লানেড থেকে পুরনো টাকশালের উপর দিয়ে পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ তাহলেও বড়বাজারও তার অন্তর্গত ছিল। কলকাতার প্রাচীনত্ব নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে পণ্ডিতদের মধ্যে। তবে নিঃসন্দিগ্ধ তথ্যটি হল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদেও কলকাতা গ্রামের অবস্থান ছিল এবং গঙ্গাবক্ষে সুতানুটি ও গোবিন্দপুর অপেক্ষা এ গ্রামের প্রতিপত্তি ছিল অধিক। জোব চার্নক সুতানুটি পরিদর্শন করেছিলেন কিন্তু কিয়ৎকাল পরে কোম্পানির কার্যকর্ম পরিচালিত হত কলকাতার নামে। তার প্রধেও বড় কথা এ নগরীর পত্তন হল, তার নামকরণও হল কলকাতা। তা সুতানুটি বা গোবিন্দপুর হলো না কেন ? এ সবের উত্তরে সন্ধানরা বলা যেতে পারে নিশ্চয়ই কলকাতার খ্যাতি ছিল সুদূর প্রসারিত। তাই প্রবক্তা কালে শিবধর্মের প্রবর্তক গুরু নানকদেব তাঁর পুরী প্রবন্ধের নথে ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গাতীরবর্তী কলকাতা গ্রামেই অবতরণ করে সেখানে কিছুদিন অবস্থানও করেছিলেন তাঁর আধ্যাত্মিক বিষয়ে স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে আলোচনার জন্য। এমন আলোচনাকে কেন্দ্র করে নানক বা তাঁর শিষ্যদের কোনো স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা থেকে গড়ে উঠেছে আজকের কলকাতার ঐতিহ্যমণ্ডিত গুরুদ্বার বড়া শিখ সঙ্গত। মহাত্মা গান্ধী রোডের উপর অতি মর্যাদাপূর্ণ এ সুন্দর গুরুদ্বারটির প্রবেশ পথে প্রস্তরলিপি তার অতীত গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে সে ইতিহাসে। গুরু নানকের পদধূলি ধন্য এ গুরুদ্বারটি শিখ সম্প্রদায়ের নিকট এক তীর্থ বিশেষ। নবম গুরু তেগ বাহাদুরও এ তীর্থ দর্শন করেছিলেন তাঁর আসাম যাত্রার সময় ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে। আধুনিক কলকাতার গড়ে ওঠার ইতিহাসে অনেক বিশিষ্টজন মানুষের। কিন্তু

ভারতীয় জনজীবনের ওপর নানকপন্থের গভীর প্রভাব—এসবকিছুকে মনে রেখেছে এক ঐতিহাসিক সত্য।

তিন

জনকবিরের শিখ সম্প্রদায় সম্বন্ধে কিছু বলার পূর্বে তাদের ধর্মীয় জীবনধারা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও কিছিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। তারা অন্যদের নিকট প্রতিবেশী। অথচ তাদেরকে সাধারণে অন্যান্যে জানার জন্যই সাধারণভাবে আগ্রহের কম। তাই পরের পাশে যে পাড়শি বাস করে তার খবর জানবার বড় একটা গরজ নাই, যাচার চেষ্টাও করি না। এ অনীহাই বিশ্বের ভ্রান্ত অজ্ঞানতার উৎস।

শিখ শব্দটির প্রচলিত ব্যাখ্যা সংস্কৃত শব্দ শিষ্যের সমার্থবোধক। বাস্তবিকপক্ষে এ শব্দটির উৎস পালি ভাষা ভাষী বুদ্ধদেবের ধর্মপদে বর্ণিত—ব্রাহ্মণীয় অর্থাৎ শিখ ভাবনার ঈশ্বর ধর্মেরীত, ঈশ্বরের আসন। সদৃশ শুরু গোবিন্দ সিং, এ প্রচলিতধারীর নাম নিলেন 'খালসা' যা এরই সমার্থবোধক। তা গ্রহণ করা হয়েছিল সংস্কৃত শব্দ থেকে... the Pannian term khas comes from King's own (lands.) একজন শিখ হলেন 'জনবুদ্ধ' যার জীবন শুরুর প্রতি নিবদ্ধ। শিখধর্ম একেশ্বরবাদী, একমাত্র সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তিনি সবের শাষিশাল নিখিল মানুষকে সৃষ্টি করেন না, নিখিল বিশ্বে তাঁর অসীম লক্ষ্যপূরণ করার পর পুনরায় উৎসের সঙ্গে মিলন হওয়ার জন্য মানুষের সৃষ্টি। তাই এ বিশ্ব "একনার সত্য পুরুষের" নিজেকে জানার কারণে পবিত্র। তিনি শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন, তিনি আবার অতীন্দ্রিকর্তা, তাঁর মহেন্দ্র মূল্য ও বিচারবোধ, তিনি অকালমূর্ত ও নিরাকারাকার, তিনি প্রেমী এবং তাঁর সৃষ্টিকে উজ্জীবিত অনিবার্য করে তার যেমন, ক্ষয় ও দুঃখ থেকে তাকে মুক্ত করেন। তিনি সর্বজ্ঞানী, তাই তাঁকে প্রার্থনা করা অসম্ভব। তাঁর বর্ণনা করতে গিয়ে গুরু নানকদেব বলেছেন

> আমার বন্ধু ও প্রিয়তমের কথা বলুন,
> আমি খুব ভালভাবেই পরখ করে দেখেছি,
> তাঁর বর্ণন কখনোই অতীতিকর নয়।

তাঁর দর্শনে মুহূর্তে মানুষ নেতিয়ে হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে বিস্ময়বোধে। তাই শিখ পরিভাষায় তিনি হলেন "ভাহে গুরু" অর্থাৎ "বিস্ময়ের পরমগুরু"। গুরু নানকদেবের বিশ্বাসে 'গুরু' নিশ্চিত একজন 'গুরুমুখের' চরিত্রের আকাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য হল (১) সন্তোষ, (২) ঈশ্বর চিন্তনে হৃদয় সমর্পণ, (৩) ধ্যান, (৪) স্নান, (৫) মধুর বচন, (৬) সরলভাবে জীবন নির্বাহ, (৭) পবিত্রতের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন, (৮) অন্যদেরকে বিলাসন, (৯) গুরুর জ্যোতিকে অনুভব করা, (১০) এক ঈশ্বরের চিন্তন ও পবিত্র গুরুর বাণী গাওয়া, (১১) বিনম্রী হওয়া, (১২) সুখ ও দুঃখকে সমভাবে গ্রহণ করা, (১৩) কথা গ্রহণে ও স্নান, আহারের প্রতিকারে সংযত হওয়া, (১৪) ভোগ, লোভ ও প্রতিত আবেগ সংযমন এবং (১৫) পরিবার ও সমাজের অভিযুক্ত না করা।

সামাজিক আচার বিষয়ে গুরু নানকদেবের তিনটি নির্দেশ শিখদের অতি মনোগ্রাহ্যপূর্ণ। তা হল (১) আত্মিক শিক্ষিলনের জন্য আধ্যাত্মিক অনুশীলন, (২) তিনি সম্পূর্ণভাবে সমস্ত মানুষের সমান বিশ্বাস করতেন। লিঙ্গ বর্ণভেদ তাঁর নিকট ছিল অর্থহীন। ব্রাহ্মণ তথা অন্যান্যদের উচ্চবর্ণের মানুষদের ভন্ডামির উপাসন অবিরত বিরোধ করেছেন তিনি। (৩) কারো ইশ্বাস বিরুদ্ধে যৌথার পালনের বিধিকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন তিনি। গুরু নানক নিজেও বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর দুই পুত্র সন্তান ছিল। এক পরিব্রাজক তাঁদের একবার তাঁকে উপহাস করে বলেছিলেন বিবাহিত হওয়ার কারণে তাঁর পক্ষে ঈশ্বর সেবায় সার্বিকভাবে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব নয়। তাৎক্ষণিক উত্তরে গুরু নানক বলেছিলেন—জীবনে পবিত্রতা নীড় হল স্ত্রী, পুত্র হল তাদের জীবনের বিকাশ আর নিরাপদের জন্য আবেগিক প্রয়োজন (আকিয়াং-আমন, পুত্রে-নিশান, যৌনত-গুরুজন)।

ধর্মপ্রাণ ঈশ্বরপ্রেমী ভারতীয় মহাপুরুষদের মধ্যে গুরু নানকদেবের এক বিশেষ স্থান তাঁর মানব প্রেম ও সমাজতান্ত্রিক ভাবনে। জীবনের শুরুতেই তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হয়েছিল—এখানে কেউ হিন্দু নেই, নেই কেউ মুসলমান। এখানে আছে শুধু মানুষ—হিন্দু ও মুসলমান শুধু নাম যা মহান মানবজাতির সম্প্রদায়ের নিয়ন্ত্রিতকার।

গুরুগ্রন্থ সাহিব নিশ্চয়ই পবিত্রতম গ্রন্থ তার নিত্যপূজা হয় গুরুদ্বারে যা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে—তা ছাড়াই তোর তা পারলৌকিক প্রার্থনা অনুষ্ঠান হোক। গুরুগ্রন্থ পাঠ আনন্দিক তাদের ধর্মকৃত্য। শিখের গুরু অর্জুনদেবের তাঁর সংকলন করেছিলেন ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর সম্পাদনও ইতিহাসখ্যাতি ছিল তাঁর পূর্বসূরি গুরুজন গুরুর বাণী তা হৃদয়ঙ্গমে সংকলন করেছিলেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় গুরু। তৃতীয় গুরু অমরদাস হিন্দুভক্ত ও সুফি মুসলমান মহাত্মা ধরহোলদের যত প্রচলিত ত্রিয় বাণীসমূহও সংকলনে স্থান দেন। তা হস্তলিখিত অবস্থায় দুই ভাগে পাণ্ডুলিপিতে ছিল গুরু অমরদাসের পুত্র বাবা মোহনের হেফাজতে। বহু অনুনয় বিনয়ের পর গুরু অর্জুনদেব তা বাবা মোহনের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। অন্যান্য সূত্র থেকেও সংগ্রহ করা হয় গুরুবাণী। সমস্ত বাণী ও বক্তব্যসমূহ একত্রিত করে তার যথার্থতা ও যৌক্তিকতা বিষয়ে গভীর অধ্যয়নের পর গুরু অর্জুনদেবের তত্ত্বাবধানে সঠিকভাবে যৌথিক বাণীগুলোর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেন শিখ গুরুদের এক মহান শিষ্য ভাই ভানদাস। দশম গুরু গোবিন্দ সিং এ গ্রন্থে তাঁর পিতা নবম গুরু তেগবাহাদুরের কিছু বাণী যুক্ত করে এ মহান গ্রন্থের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এ গ্রন্থ যৌক্তিকতার দিকদিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ প্রকরণে আকর্ষক হলে আসলে যা হল Only

scripture of the world which was compiled by one of the founders of religion himself and whose authenticity has never been questioned.

গুরুগ্রন্থ সাহিবের সংকলন ও বিন্যাস বিশ্বমানিত্য নয়, তা ভজন হিসেবে গাইবার জন্য রাগভিত্তিক বাদ্য সংখ্যা একত্রিশ। এ রাগগুলো হল শ্রী, মাঝ, গৌড়ী, আসা, গুজরী ইত্যাদি পাত, পবিত্র ও গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবনার সমন্বয়ে। গুরুরা উচ্চারণের অনিশ্চয়তা ও অস্পষ্টতা যেনভাবে দূর করেছেন এ সংকলনে।

ধর্মগুরুদের ভক্তি আন্দোলনে ঈশ্বর অন্বেষণের মাধ্যমরূপে ভক্তিসঙ্গীত ছিল এক জনপ্রিয় মাধ্যম। তা ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য এক উজ্জ্বলতার সৃষ্টিসম্ভার। সৃষ্টি ভাবনাতেও গান এক অনন্য অন্বেষণের পরম্পরা। শ্রীগুরু নানকদেবও তাঁর অনেক ঈশ্বর ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন গানের মাধ্যমে।

"গান নিয়ে যে তোমার খুশি
রহিত মনে

ত্রিলোচন যেন শ্রীনানকের রচিত সুরের উচ্চনাদ এমন নয়নের সুরেই রচিত হয়েছিল। তা পরিষ্কারভাবে অর্জন করেছিল তাঁর পূর্ণদৃষ্টি এবং তজনের সুরলহরিতে। গুরু নানক তাঁর ঈশ্বরচেতনার অনেক গান অনন্যসাধারণের মধ্যে প্রচার করেছেন সুরের মাধ্যমে। তাঁর সহযোগী ছিলেন মরদন। বাদ্যযন্ত্রী মরদানা ছিলেন মুসলমান যাঁর বাবা ছিলেন ভাই। গুরু অর্জুনদেবের একজন শিষ্যের কন্যা ও অনুলিপিকী ছিলেন। গুরুগ্রন্থের সমস্ত ভাবনাই কবিতা ও সুরের মেলবন্ধনে গ্রথিত। তাই সুরের এ ধারা শিখ সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গুরু, সাধু ও ভক্তদের কেমনও বাণী নেই এ গ্রন্থে। তাঁরা কেমনও বাণী জমা করেননি বলে ধারণা। গুরু নানক থেকে শুরু করে গুরু গোবিন্দ সিং পর্যন্ত সাতজন গুরু ছাড়া যে সব হিন্দু ভক্ত ও মুসলমান ধর্মাত্মাদের বাণী এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তাঁরা হলেন কবীর, রামানন্দ, রবিদাস, সুরদাস, সেইন, ধিন্না, জয়দেব, নামদেব, ত্রিলোচন, পরমানন্দ, পিপা, বেনী, বাবা ফরিদ, দাত্তা, বলওয়ান্দ ও মরদানা।

এ গ্রন্থে আরও একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ গ্রন্থে সংকলিত হিন্দুভক্তদের বাণীর রচয়িতারা প্রায় সবাই হিন্দুধর্মের তথাকথিত নিম্নবর্ণে অবস্থান করতেন। কবীর ছিলেন জোলা, নামদেব ছিলেন কাপড় রং করার শ্রমিকদের, রবি ছিলেন চামী, সদনা ছিলেন কসাই, রবিদাস ছিলেন চর্মকার, সেইন ছিলেন ক্ষৌরকার। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে The emphasis in the growth is on the lowest becoming the highest and caste being of no consequence in the realisation of the supreme truth. গুরুগ্রন্থ সাহিবে সংকলিত ভজনের সংখ্যা পাঁচ হাজার আটশো চুয়ানব্বই। তার মধ্যে মূলো রোলটি শিখ গুরুদের বাণী—গুরু নানকের বাণীর সংখ্যা ৯১৯। গুরু অঙ্গদের বাণীর সংখ্যা ৬৩, গুরু অমরদাসের ২৩৫, গুরু রামদাসের বাণীর সংখ্যা ৬৭৩, গুরু অর্জুনদেবজীর বাণীর সংখ্যা ২১৮ এবং গুরু গোবিন্দ সিংহের বাণীর সংখ্যা ১। বাকি বাণীসমূহ হিন্দুভক্ত ও মুসলমান সাধুসন্তদের। তাঁদের মধ্যে ভক্ত কবীরের বাণীর সংখ্যা সর্বাধিক। এ মহান গ্রন্থে সংকলিত বাণীগুলির ভাষার বৈচিত্র্যও The GRANTH upholds the creed of synthesis as against exclusiveness of form, symbols and ideas. গুরুমুখী এবং গুরুমুখী লিপিতে তাঁদের বাণী আরও দুখানি খণ্ডে ধর্মগ্রন্থ।

গুরু নানকদের বর্তমানে পাকিস্তান অন্তর্গত লাহোরের পশ্চিমাঞ্চলে তালবন্দি নামে এক জায়গায় প্রায় ১৪ এপ্রিল, ১৪৬৯

সাথে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কালুচেরী। তাঁর মাতা ছিলেন দেবী ঝাড়ী। দ্বিতীয় ও পাঞ্জাবি ভাষায় তিনি সৈয়দের সম্পূর্ণ ও সঠিক ভাষা আয়ত্তে রাখেন। সরকারি হিসাবপত্রে তাঁর তেমন মন না থাকায় পিতা তাঁকে ঘোড়াব্যবসায় বা গোয়ারপনে কর্মে নিযুক্ত করাতে চান। পিতার একান্ত ইচ্ছা এ সন্তানটি যা পালন করতে পিতৃব্য সর্বদা পরমেশ্বরের চিন্তনে নিমগ্ন থাকতেন। তেউ তাঁকে নাম জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন তাঁর নাম নানক নিরঞ্জনী—অর্থাৎ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান। হিন্দু প্রথা অনুযায়ী উপবীত গ্রহণ করতে বলায় তিনি তা করতে অস্বীকার করে বলে উঠেছিলেন "যাকি এমন উপবীত ধারণ করব যা ছিঁড়বে না, জলসিক্ত হবে না, কোনওদিন দুর্গন্ধময় হবে না বা পুড়েও যাবে না। তিনি বিবাহিত ছিলেন, তাঁদের দুটি পুত্র সন্তান ছিল। তিনি দীর্ঘকাল জিল্লা শাসক নবাব দৌলতখান লোদীর অধীনে আওয়ার রক্ষকের কাজ করেন। এ সবসময়ই তাঁর মহান উপলব্ধি ঘটে, না তিনি হিন্দু, না মুসলমান।

গুরু নানক ভারতবর্ষের হিন্দুতীর্থসমূহ বর্ণন করেন। পরিব্রাজক হিসেবে তাঁদের নানা গ্রন্থ ছড়ায় সিংহল (বর্তমান শ্রীলঙ্কা), মক্কা, মদিনা ও ইরাক পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন তাঁর জীবন জিজ্ঞাসার খোঁজে। আরবদের যে জায়গায় বলে তিনি শায় আবদোল নামে একজন পুণ্যাত্মার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন (১৫২০ খ্রি:)। সে জায়গাটি আজও বিশেষরূপে চিহ্নিত এক পবিত্র স্থানরূপে সুরক্ষিত আছে। জন্মসাখির বর্ণনা অনুযায়ী, পরিব্রাজ্য গ্রহে একবার তিনি মক্কার এক মসজিদে জায়ে মসজিদের দিকে পা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। মোল্লা তা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে চিৎকার করলে অবিচলিত চিত্তে নানক বলে উঠলেন, "যে দিকে ঈশ্বরের নিবাস নেই, সেদিকে আমার পা ঘুরিয়ে দেব।" মোল্লা হতচকিত হয়ে গেলেন তাঁর এমন উত্তরে। আসল, ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান এই-ও তো বোঝানোই কথা, তিনি তাতে বিশ্বাসী। দীর্ঘ পরিশ্রমণের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন যখন বাবর বাদশাহ্ তৃতীয়বার পাঞ্জাব আক্রমণ করলে সেখানে হত্যাযজ্ঞ চলেছিল। এই সময় তিনি বিশ্ব ক্লেশভিত্তিমূলক মর্মস্পর্শী কবিতা রচনা করেন। যেমন—

যখন রক্তে চলেছে নরহত্যার, চারিদিকে মানুষের কান্না,
হায় ঈশ্বর, তাদের তোমার কোনও ব্যথা নেই ?
মানুষকে দিয়ে এক সিংহ ধরিয়ে পাঠালে এক পাল
আর তুমি, প্রভু, প্রতিবাদ করছ না ! —বাবর উপাখ্যান

এ সময়ে তাকে বন্দী করা হয় ও পরে ক্ষেপণীয়ের কাজে নিযুক্ত করা হয়। জন্মসাখির বর্ণনা অনুযায়ী পীরই অবশ্য তাঁকে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ করেছিল।

কর্তারপুরে অবস্থানের তিনি সপরিবারে স্থায়ীভাবে নিজের মনোনিবেশ ও কৃষিকাজে মন দিলেন। তাঁর অনুগামী অনেকে এখানে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ভাই লেহনা যিনি গুরু নানকের মৃত্যুর পর গুরু অঙ্গদ নামে দ্বিতীয় গুরু রূপে অভিষিক্ত হন। নানকদেব তাঁর দুই পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করে তাঁর গুরুপদে নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন। গুরুপদ লাভের প্রস্তাব হয় কার্তারপুর গ্রামে। এখানেই গুরু নানকদেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুর পর হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষের অনুগামীরাই স্ব-স্ব ধর্মে তাঁর মৃতদেহের সৎকার করতে চাইলে বিবাদ উপস্থিত হয়। জন্মসাখির বর্ণিত অনুযায়ী সিদ্ধান্ত মীমাংসার জন্য স্থির হল, উভয় পক্ষ থেকে তাঁর মৃতদেহের উপর ফুল রেখা হবে। যে পক্ষের ফুল দেখা যাবে শুকোয় তাঁরাই হবেন মৃতদেহের অধিকারী। শবের ঢাকা সরানো হলে দেখা গেল, উভয় পক্ষের রেখে ফুলই সমপরিমাণে তাজা রয়েছে, অথচ শবের ফুলে দেখা গেল শুকনো মৃতদেহের অন্তর্হিত। এবার দু-পক্ষই অর্ধেক অর্ধে চাদর ভাগ করে নিয়ে নিজ নিজ মতে তা সৎকার করল। তাঁর পূর্বপুরুষ জয়া কবীরের জীবন নিয়েও ঠিক একই কাহিনী প্রচলিত।

দ্বিতীয় গুরু গ্রন্থসাহেব গুরু অঙ্গদ (১৫০৪-১৫৫২ খ্রিস্টাব্দ)। গুরু নানক প্রবর্তিত শিখ আন্দোলনকে তিনি আরও এগিয়ে নিয়ে গেলেন অনেক দূরে। সাহিত্যিক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের মূল বস্তু অক্ষোরমালার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। বলা হয়ে থাকে, তিনিই পাঞ্জাবের ভাষা গুরুমুখীর লিপি প্রবর্তন করেন এবং গুরু নানকদেবের জীবনী ও শিক্ষার প্রথম গুরুমুখী ভাষায় রচনা করেন। গুরুমুখী বর্ণমালার প্রবর্তকও তিনি। তাঁর পূর্বে গুরু নানকের সংকৃত ভাষা প্রত্যাখ্যান করে লোকের অনুরোধে ভাষাই গ্রহণ করেছিলেন তাঁর উপলব্ধিকে প্রকাশের জন্য। গৌরব বৃদ্ধির তাঁর সময়ের এই সব অঞ্চলের অধ্যাত্মভাষা পালিয়েই তাঁর বাণী ও ধর্ম প্রচার করেছিলেন। নানকদেবের পূর্বপুরি কবীর বলেছেন

সংকৃত কূপ জল, কবীর ভাষা বহতা নীর

হে কবীর, সংকৃত হল কূপের জল, চলতি ভাষা হল পাহাড়ীয় জলধারা, যা নির্মল।

তিনি বিবাহিত ছিলেন। তিনিও তাঁর পূর্বজদানদের অনুপ্রাণিত হিবেচনা করে তাঁর এক বিশ্বস্ত শিষ্য পরম ঈশ্বর ভক্ত অমরদাসকে গুরুপদ গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে যান।

তৃতীয় গুরু অমরদাস (১৪৭৯-১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দ) ছিলেন একজন বৈষ্ণব কৃষক ও ব্যবসায়ী। স্ত্রী ও দুই পুত্র নিয়ে ছিল তাঁর স্বচ্ছল জীবন। গুরুর মুখে কবীর উচ্চারণ শুনে তিনি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। শিখ ধর্মকে তিনি আরও মানবমুখী ও সার্বজনীন রূপে রূপায়িত করেন। তিনি সতীদাহ প্রথা ও নারীজাতির পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তাঁর পূর্বের গুরুদের বাণী তিনি তাঁর নৌত্র গায়ত্রী রামকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে গ্রন্থসাহিবের দুই খণ্ডে সংকলন করেন। গুরুত্বের এই হল শুরু। তিনিই অনেক হিন্দু ভক্তদের বাণীও এই গ্রন্থসাহিবে সংকলন করেন। তিনি গুরু নানক ও গুরু অঙ্গদের দুই পুত্রের কাছ থেকে তিরী রামদাসকে সরিয়ে নেন।

চতুর্থ গুরু রামদাস (১৫৭৪-১৬০১) শাহেবে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গুরু অমরদাসের পুত্রে আগত তীর্থযাত্রীদের নিকট হতে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের ছিটি বই লিখে নিতেন। অবসর সময়ে তিনি গুরু অমরদাসের সেবা যত্ন করতেন। দুবার রামদাসের মুখস্থ শ্রদ্ধা ও সেবাপরায়ণতায় আকৃষ্ট হয়ে গুরু অমরদাস তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যা বিবি ভানীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন। নিজ পুত্রদের অযোগ্য বিবেচনা করে অমরদাসকে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে যান। তিনি রামদাসপুর নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন যার বর্তমান নাম অমৃতসর। নতুন জায়গায় ব্যবসায়ীদের তিনি সহজশর্তে এ শহরে বসতি স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানালে তাঁরা অনেকে সস্তায় জমি নিয়ে এখানে ব্যবসায়িক কর্মে লিপ্ত হলেন। ক্রমে এ শহর এক বিশ্বখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্রস্থলে পরে উঠল। তিনি শিখ সম্প্রদায়ের আমৃত্যুর ব্যবসায়ীদের একে অপরকে সাহায্যের হাত বাড়াতে আমৃত্যু জানালেন। কৃষিকর্ম পরিত্যাগ করে অনেকে গুরুর আমৃত্যু কথোপকথন-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করলেন। তারা অনেকে মূলধন নিয়ে ঘোড়ার ব্যবসায় বা অন্যান্য খাতে আত্মনিয়োগ করে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে অগ্রসর হলেন। এ পথে আজ শিখজাতি হয়ে এক সমৃদ্ধশালী জনগোষ্ঠী।

পঞ্চম গুরু অর্জুনদেব (১৫৬৩-১৬০৬) ছিলেন গুরু রামদাসের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনি অমৃতসরে যে মন্দির নির্মাণ করেন তাই বিশ্ববিখ্যাত স্বর্ণমন্দির। এ মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন মুসলিম সাধু মিয়া মীর। গুরু অর্জুনদেব তরণতারণ ও করতারপুর শহরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ মন্দিরের চতুর্ভুজিক যুক্ত—মন্দির তাকবার যোতক এ ব্যবস্থা। জাতি, ধর্ম ও বর্ণনির্বিশেষে বিশ্বের চতুর্দিকের মানুষের প্রতি আহ্বান এ গুরুদ্বারে। গুরুগ্রন্থ সাহিবের সংকলনের তিনি সম্পাদ করেন। তিনি ছিলেন সম্রাট আকবরের বিশেষ প্রিয়ভাজন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর গভীর শ্রদ্ধাবোধের শক্তির হয়ে দুষকজ সেলিম তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আকবরের নিকট তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল তিনি গুরুগ্রন্থে ইসলামের অবমাননা করেছেন। ১৬০৮ খ্রি সম্রাটের সম্মুখে এই পবিত্র গ্রন্থ পাঠ করার আদেশ দিলেন সম্রাট। তা শ্রবণ করা হলে আকবর গুরুর বাণীতে আনন্দ লাভ করেছিলেন। তারপর তিনি এর মধ্যে এক সমন্বয় ভাবনার জন্ম দেখতে উৎসুক উপলব্ধি করলেন। সেলিম (সম্রাট জাহাঙ্গীর) ছিলেন অন্য আদুরে ধরা। গুরু অর্জুনদেবের ক্রমবিস্তারমান শক্তিতে ভয় হয়ে এবং বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে সাহায্য করার সন্দেহে সম্রাটের তাঁর প্রাণ হরণ করান। এ কথা জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনী তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরীতে স্বীকার করেছেন। গুরু অর্জুনদেব ৩০.৫.১৬০৬ তারিখে লাহোরে শহিদের মৃত্যুবরণ করেন।

ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের (১৫৯৫-১৬৪৪) সময় থেকে শিখ শত্রু এক নতুন ধারার সন্ধানে অগ্রসর হতে শুরু করল। ক্ষমাশীলতা ভাবনার পরিবর্তে সূচনা হল যৌগপূর্ণ এক জঙ্গীর ভাবনার। তাঁর গুরুপদে অভিষেকে হয়েছিল মাত্র এগার বছর বয়সে। এ অভিষেক অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেছিলেন বাবোজোই একনিষ্ঠ শিখ ভাই বুঢ়ন। তিনি গুরু নানকের সময় থেকে শিখ ধর্মপ্রচারের ছিলেন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। অভিষেক অনুষ্ঠানে গুরু হরগোবিন্দ দুই হাতে ধারণ করেছিলেন দুই অসি। তাই নূতন নব-অভিষিক্ত গুরুকে ঘোড়ায় চড়া, তীরন্দাজি ইত্যাদি শিক্ষা, অসি চালনা, শরীরচর্চা ইত্যাদি সামরিক প্রশিক্ষণে শিক্ষিত করলেন। গুরু নানকের সময় থেকেই গুরুর পরিচয় ছিল সচ্চা পাদশা অর্থাৎ সত্যের রাজা। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার নিয়ম কানুন নাম হল দরবার আর গুরুপদে অভিষেক পর্বকে বলা হল সিংহাসন আরোহণ। তাঁর রাজত্ব হল সচ্চাপাদশাহ অর্থাৎ প্রকৃত শাসন। তাঁর মাথায় উঁচুমি ছামরের সাহায্যে বাতাস করার ব্যবস্থা হল। শিখ সম্প্রদায়ের ধর্ম সংগঠনের উদ্দেশ্যে তিনি অমৃতসর মন্দিরের বিপরীত দিকে এক অট্টালিকা নির্মাণ করালেন যার নাম আকাল তখত অর্থাৎ অবিনশ্বরের সিংহাসন। এখানে ধর্মীয় আলোচনা ছাড়াও তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নানা বিষয়ের আলোচনা হতে আসছে আজও। এখানে তিনি 'লোহাগড়' অর্থাৎ লোহার দুর্গ নামে এক ছোট দুর্গও নির্মাণ করান ও পাঁচ হাজার সৈন্যের এক ছোট পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী। তিনি সমস্ত শ্রদ্ধালু শিখদের নিকট নির্দেশ পাঠান তাঁকে কোনও উপহার দিতে হলে তা হবে ঘোড়া অথবা কোনও অস্ত্র। তিনি শিকারেও যেতেন।

গুরুর নির্দেশে শহরে এমন পরিবর্তনে শাসক সন্তুষ্ট হয়। শহরে সমস্ত কর্মকাণ্ডের দৃষ্টিতেও প্রশাসকদের শাসনাধীন নিশ্চিন্ত মনে হল। সম্রাট জাহাঙ্গীর সন্তুষ্ট হয়ে গুরু হরগোবিন্দকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করে রাখার নির্দেশ দিলেন। অনেকের মতে তাঁর কারাবাসের মেয়াদ ছিল বছর, তবে তার পূর্বেই তিনি মুক্তি পেলেন। গোয়ালিয়র দুর্গে গুরুর ঈশ্বরচিন্তা ও নিষ্ঠাবান জীবনযাপনের দৃষ্টান্তে জাহাঙ্গীর মুগ্ধ হয়ে তাঁর কারাবাস মকুব করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ স্থাপন করলেন। গুরু হরগোবিন্দ ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করলেন। স্থানীয় মানুষ অনেকে তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করলেন। তিনি কাশ্মীর ও উত্তরপ্রদেশের সিলসিটে গুরুদ্বার নির্মাণের মাধ্যমে শহরের প্রতিষ্ঠা করলেন। শাহজাহান সিংহাসনে বসলে ধর্মান্তকরণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। গুরুর নির্মিত শহরগুলোর গুরুদ্বারে ধনে সাধন করে আর উপর কর্তৃক নির্ধারণ করানো হল। মোগলদের সঙ্গে গুরু হরগোবিন্দের নেতৃত্বে শিখদের সংঘর্ষ চলতে লাগল। গুরু হরগোবিন্দও তাঁর পুত্রদের অযোগ্য বিবেচনা করে তাঁর পৌত্র হরিরাইকে উত্তরাধিকারী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে যান।

সপ্তম গুরু হরিরায় (১৬৩০-১৬৬১) শিখগুরুর গরিমাকে রক্ষা করার জন্য ২২০০ সৈন্যের এক অশ্বারোহী বাহিনী গড়ে তোলেন। তিনি কখনও মোগলদের তাঁর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার কোনও সুযোগ দেননি। শরীর আত্মরক্ষার সঙ্গে শিখধর্মের উন্নতির বিষয়ে তিনি বিশেষ

—গুরু শিবলিঙ্গ পাহাড়ে জমি ক্রয় করে এক শহরের পত্তন করলেন যার নাম আনন্দপুর, বর্তমান হোশিয়ারপুর জিলার অধীনে।—

মহাপ্রয়াণ দিয়েছিলেন। ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে পুত্র হরিকৃষ্ণকে তাঁর উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করে তিনি পরলোকগমন করেন।

অষ্টম গুরু হরিকৃষ্ণ (১৬৫৬-১৬৬৪) পাঁচ বছর বয়সে গুরুপদে অভিষিক্ত হন। তাঁর গুরুপদে অভিষেকে সংঘের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামরায়ের মনঃপূত ছিল না। সভাটি শান্তস্বভাবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে তাঁর সন্তুষ্টিসাধন প্রার্থনা করলে সভাটি ভাবলেন যেকোনওবিধীন এমন একজন সন্তুষ্টজনকে শিখদের গুরুপদে অভিষিক্ত করতে পারলে তাঁর অনেক চিন্তা দূর হবে। বিষয়টি নিশ্চিন্তির জন্য উভয়পক্ষকেই সভাটির দরবারে ডাকা হল। সভাটি বালক হরিকৃষ্ণের বুদ্ধি পরীক্ষা করে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। সর্বোপরি শিখসম্প্রদায়ও তাঁদের ধর্মের স্থানাদের সভাটির হস্তক্ষেপে বিরক্ত হলেন। এরই মধ্যে গুরু কলসংক্রোগে আক্রান্ত হলে মাত্র আট বছর বয়সে শিষ্টিতে পরলোকগমন করলেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি উপস্থিতিকারীগণকে সম্পর্কে নিকটস্থ বাকলার তেগবাহাদুরের নাম করে গেলেন। তেগবাহাদুর তখন ঠিক মতে নির্লিপ্ত সাধু জীবন-যাপন করছিলেন।

নবম গুরু তেগবাহাদুরের (১৬২১-১৬৭৫) গুরু পদে অভিষেক বড় সহজে হল না। গুরু হরিকৃষ্ণ কাকে শিখেছিলেন পরবর্তী গুরুকে খুঁজে পাওয়া যাবে বাকলায়। এ নিয়ে ওখানকার অনেক দাবিদার এগিয়ে এল গুরু পদের জন্য। প্রকৃতপক্ষে শিখগুরুরা কিন্তু খুঁজে পেলেন তাদের গুরুপদের যোগ্যপাত্র পাঁচ তেগবাহাদুরকে। তখন তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ। তাঁর অভিষেক হল কিন্তু অন্যান্য দাবিদারেরা তুমুল কলহে মাতিয়ে দিল। তাঁর প্রাণ হরণেরও চেষ্টা হল। এ সবের মূলে ছিলেন হরিরায় এর পৌত্র ধীরমল যে পরিত্র গুরুগ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপিখানিও হস্তগত করেছিলেন। শিখরা ধীরমলের বাড়ি আক্রমণ করে তাঁর সম্পত্তি তছনছ করল ও পরিত্র গুরুগ্রন্থের মূল পাণ্ডুলিপিখানি উদ্ধার করল। গুরু অর্জন ঈশ্বরদাসের মতন সম্পত্তি ছিনিয়ে নিলেন ও কিরাতপুর যাওয়ার পথে সিমলা নদীর এক সুরক্ষিত স্থানে গুরুগ্রন্থের পাণ্ডুলিপিখানি গোপনে লুকিয়ে রেখে অন্যান্য শিখগুরুদের উদ্ধার বিষয়ে ধীরমলের করার পারলেন তা উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। ধীরমলের বাসেবকরা এখনও কাঁহানপুর গ্রামে তা রক্ষা করে রেখেছেন। গুরুপদে অভিষিক্ত হওয়ার পর গুরু তেগবাহাদুর অমৃতসরে ফিরে আসতে গেলে ওখানেও তাঁর সম্মুখে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। এমন পরিস্থিতিতে গুরু শিবলিঙ্গ পাহাড়ে জমি ক্রয় করে এক শহরের পত্তন করলেন যার নাম আনন্দপুর, বর্তমান হোশিয়ারপুর জিলার অধীনে। এখানে তিনি পাকি গাড় তৈরালেন। এখান থেকে তিনি গেলেন আলোয়াল অঞ্চলে এবং প্রচারের জন্য তারপর গেলেন মুরিয়ানায়। পথে তিনি পৃথিবীবীদের জন্য কয়েকটি কূপ খনন করিয়ে দিলেন। তাঁর এ পর্যটন শেষ করে কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁকে প্রেমাবতে নিমন্ত্রণ দিলেন। এখানে ঢাকপুর মোগলাকের হস্তক্ষেপে গুরু মুক্তি লাভ করলেন। তিনি ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘুম নামুর পরিদর্শনান্তরে পাটনায় উপস্থিত হলেন। গুরুর স্ত্রী ছিলেন গর্ভবতী। এখানে তাঁর পরিবার রেখে তিনি গেলেন ঢাকা পর্যন্ত। অধিক আছে তিনি চট্টগ্রাম ইত্যাদি অঞ্চলেও গিয়েছিলেন। এসব অঞ্চল পরিদর্শনের পর তিনি আসামেও গেলেন। তাঁর পদধূলিতে ধন্য হয়ে আলোচনায় হয়ন গড়ে উঠেছিল সমস্ত যা আজও বর্তমান। আসামের রাজধানী গৌহাটে সে ঐতিহাসিক গুরুদ্বারটি আজও বিদ্যমান। এ সময়েই তিনি কলকাতার বড়বাজারের ঐতিহাসিক সঙ্গত ও সংগত করেছিলেন ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে। এ ছাড়াও পূর্ব অঞ্চলের বাসস্থানি অঞ্চলে তিনি সফর করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত সেই গুরুদ্বারগুলি আজও দাঁড়িয়ে আছে যার বিস্তৃত আলোচনা জায়গা মতো হল পেয়েছে। আসামে অবস্থানকালে তাঁরই বন্ধু রামরায় সিং-এর নেতৃত্বে এক মোগলবাহিনী এল আসাম আক্রমণ করতে। সেনাপতি গুরুর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে তিনি জানালেন এ যুদ্ধে রক্ত মানুষের প্রাণ যাবে। এর পূর্বে ঈশ্বরজেবের কাহিনী আমরা অন্যত্র আসামে আক্রমণ করতে এসে ব্যর্থ মনে ফিরে গিয়েছিল। আসাম ছিল অপরাজিত। গুরু পুনরুজ্জীবনের মধ্যে একটা ঈমানের ব্যবস্থা করলে আসাম এক বড় বন্যা থেকে নিষ্কৃতি পেল। এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিচারণে গুয়াহাটিতে আজও দাঁড়িয়ে আছে তাঁর স্মৃতিবিজড়িত গুরুদ্বার। ইতিমধ্যে পাটনাতে তাঁর এক পুত্রসন্তানের জন্ম হল। ঠিক একই সময়ে আনন্দপুর থেকে জরুরি প্রত্যাবর্তনের ডাক এল। ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধ নীতি পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের শিখ ও হিন্দুদের অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। তিনি ফিরে এলে তাঁর উপস্থিতিতে শিখ ও হিন্দুরা প্রাণে বল পেল ও পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সাহস ও ধৈর্য দেখাল। তারা অনেকে মনে করল গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলে

> সমন্বয় সাধনা ও সেবায় উৎসর্গীকৃত এমন এক বিশ্ব আন্দোলনের পতাকাবাহী হবে তাঁর পথ, এমন দলের প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি ১৬৯৯ খ্রিঃ পুণ্য বৈশাখীর দিনে আনন্দপুরে।

অনুষ্ঠিতব্যের পরিচয় দেন। আগন্তুকের পরিচয়ের পরপরই ধর্মাত্মকরণের রায় থেকে বীরত্বের জন্য তাঁর তখন নির্বাচিত হলে তিনি তাঁর মস্তক দেবেন—নিজের জীবন বিসর্জন দিয়েও তাঁদের ধর্মরক্ষা করবেন। তিনি তাঁদের উপদেশ দিলেন তাঁরা যেন ঔরঙ্গজেবের আজ্ঞাপালনে বসে যেন—তাহলে তাঁদের তাঁরা হাতকে পরাজিত করতে পারে। পরে যেন তাঁদের তা বলতে থাকে। নির্বাচিতের কাছে ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে গুরু তাগবাহাদুরকে বন্দী করা হল। চার মাস বন্দী করে রাখার পর শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে আসা হল। তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হলে তিনি প্রত্যাখ্যান করে মৃত্যু বেছে নিলেন। চাঁদনী চকে ১৬৭৫ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর শিরশ্ছেদন করা হল। এই বধ্যভূমিতেই গড়ে উঠে গুরুদ্বার শিসগঞ্জ। সম্রাটের নির্দেশ ছিল এই দুর্ঘটনার কোনো সংবাদ কাউকে পালাবে না। তাঁদের দুর্ভাগ্যে দুঃখিত হয়েছিল। রাতের অন্ধকারে একজন শিখ গোপনে গুরুর নিষ্প্রাণ জীবনের ছুঁড়ি নিয়ে একটি বস্তাবন্দীকরে তার রাতের অন্ধকারে গোপনে বয়ে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। রাইসিনার মানুষের পাশে সাহসে ভর করে নিজপুত্রে অগ্নিসংযোগ করে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই গুরুর মৃতদেহের সৎকার করলেন সমস্থানে। গুরুর নির্দেশে ইতিপূর্বেই শিষ্য গোবিন্দ সিংকে নিয়ে তাঁরা আনন্দপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন। এবার অপর একজন শিখ গোপনে গুরুর মস্তক বস্ত্রে নিয়ে গোপনে আনন্দপুর। এখানে সমস্থানে তাঁর মস্তকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা হল। আজকের নতুন দিল্লিতে যেখানে গুরু তাগবাহাদুরের অগ্নিদগ্ধ সংকার করা হয়েছিল, এই স্থলে দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহ্যমণ্ডিত গুরুদ্বার রিকাবগঞ্জ।

দশম গুরু গোবিন্দ সিং (১৬৬৬-১৭০৮) শিখজাতির ভবিষ্য নির্মাণে মাত্র ৯ বছর বয়সে গুরুর আসন গ্রহণ করার সুযোগ পেলেন। পাটনাতে বাল্যাবস্থায় একাদশে অধিবাসীদের উপরোধ কারণে তিনি হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষা শিখেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তরবারি ও ধনুর্বিদ্যা শিখতে শুরু করেছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন শিখদের তিনি এমন এক জাতিতে পরিণত করবেন যে তারা তাদের প্রকৃত পরিচয় গোপন করতে পারবে না যেমনটি তারা করেছিল গুরু তাগবাহাদুরের হত্যার সময়। পরীক্ষার মধ্যে পুণ্যকর্ম, বীরত্ব ও নৈতিকতার জাগরণে তিনি উদ্যোগী হলেন। রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীও তিনি অনুবাদ করলেন এবং এই সব গ্রন্থসমূহ থেকে বাণীবিশেষের অনুবাদ করলেন, ঈশ্বরভক্তিমূলক অনেক কবিতা রচনা করলেন। তাঁর এসব অভিনবত্বের বাণী সংগ্রহ করে যে সংকলন তা 'দশম গ্রন্থ' নামে পরিচিত। তাঁর প্রথম বিবাহ হয় সুন্দরী নামে এক মহিলার সঙ্গে। এ বিবাহে তাঁদের একটি পুত্র সন্তান হয়। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী জিতুর গর্ভে জন্ম নেয় তিন পুত্র সন্তান। জিতুর মৃত্যুর পর ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি সাহিব কাউরকে বিবাহ করেন। এ বিবাহের পূর্ণাহুতি ছিল তিনি চির কৌমার্য পালন করবেন। এ কারণে তাঁকে কালসাদের অনন্তবীরূপে গণ্য করা হয়। পরবর্তি হিন্দু প্রজাদের উপর মোগল শাসনে ত্রাসানো নানা করের বোঝা তাদের নিজস্ব অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। তারা তাদের পরিত্রাণের জন্য গুরু সমীপস্থ হলে গুরু সমস্যাসঙ্কুল হৃদয়ে ঔরঙ্গজেবী শাসনের মোকাবিলা করতে চাইলেন কিন্তু স্থির করতে ব্যর্থ হলেন। পথের বাধা ছিল বর্ণ বিভাজন ও শাস্ত্রশাসিত ঈর্ষাপরায়ণতা। তুর্ক মুসলমান ধর্মে চলে আসা জাতির এ সর্বনাশের কারণসমূহ সমূলে উৎপাটন করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। তিনি এমন এক গোষ্ঠীর সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর হলেন যারা শুধু প্রচলিত প্রথা সমূহের অনুসরকারীই হবে না, তারা নতুনের কর্ণধার, খোদার, খালা ও সামাজিক অবস্থানের মতো কৃষ্টির বিধি ব্যবস্থা অতীতকে অতিক্রম করে অগ্রগামিতায় হবে এক সর্বশক্তিমান গুরুর পুরুষের উপাসকে এবং বিশ্বের সমস্ত মানবজাতিকে এক ও অভিন্ন জ্ঞান করবে। তিনি চাইলেন সমন্বয় সাধনা ও সেবায় উৎসর্গীকৃত এমন এক বিশ্ব আন্দোলনের পতাকাবাহী হবে তাঁর পথ। এমন দলের প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি ১৬৯৯ খ্রিঃ পুণ্য বৈশাখীর দিনে আনন্দপুরে। এক শিখ ধর্ম সম্মেলনে গুরু উদ্যুক্ত তরবারি হাতে সমবেত জনতার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জনতরঙ্গীর মধ্যে থেকে এমন একজন শিখকে আহ্বান করলেন যিনি ধর্মরক্ষার জন্য মস্তক দান করতে প্রস্তুত। সম্মেলনে গুঞ্জন উঠল। কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর একে একে পাঁচজন গুরুর সন্নিকটে উপস্থিত হলেন, তাঁদের মস্তকদানের জন্য। তাঁরা ছিলেন লাহোরের দয়া সিং, দিল্লির ধরম সিং, পুরীর হিম্মত সিং, দ্বারকার সাহস সিং এবং বিদরের সাহেব সিং। তাঁদের চারজনের অবস্থানই ছিল নিম্নবর্ণে। গুরু তাদের আখ্যা দিলেন তাঁর 'পাঞ্চ পিয়ারে' অর্থাৎ প্রিয়তম পাঁচজন নামে। এ থেকেই তিনি প্রবর্তন করলেন খালিস অর্থাৎ পবিত্র বা মুক্ত আত্মা। তিনি তাঁর প্রিয়তম পাঁচজনকে পাহুল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইস্পাতের ছুরিকা দ্বারা আবর্তিত মিষ্টি সরবতের অমৃত পান

করিয়ে শিক্ষিত করলেন। তাঁদের শিক্ষাসমাপ্তির পর তিনি স্বয়ং তাঁদের তাঁদের ভাষাতেই শিক্ষিত হলেন। এটি এল পাশ্চাত্যের পদ্ধতিতে শিক্ষার উপর বিশেষ জোর স্থাপনের প্রথম। তাঁর অসাধারণ প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের কথা তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়

অসীমাকে ধরা দেওয়ার দিন, তিনি গুরু
ও শিষ্য দু'এ আবর্তিত 'এক'।

তিনি বললেন আমার নিজের হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদ, খ্রীষ্ট-মুসলমের ভেদাভেদ মিটিয়ে ফেলবে, ইংরেজি শিখবে ছাত্র-অধ্যাপকের ভেদাভেদ, ঊঁচু-নিচুর ভেদাভেদ এবং ঘুচে যাবে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও ঈশ্বরের নিকটত্ব। শিখের তিনি পাঁচটি 'ক' ধারণ করবার নির্দেশ দিলেন, (১) কেশ (চুল), (২) কঙ্ঘা (চিরুনি), (৩) কড়া (ইস্পাতের বালা), (৪) কাচ্ছা (লেংটি ও কৃপাণ (অসি)। চিরুনি ধারণ পরিষ্কার অভ্যাস হবে ঈশ্বরের ইস্পাত বলয় ঈশ্বরের সর্বত্রগতে নিয়ন্ত্রণ করার প্রতীক, কাচ্ছা না লেংটি সৎ ও চরিত্রের লোভক এবং কৃপাণ হল আত্মরক্ষা ও শত্রুশাসনকে প্রতিরোধ করার প্রতীক। তিনি নির্দেশ দিলেন খালসা ও গুরুর প্রতি গভীর অনুরক্তির সূত্র ধরে প্রত্যেকজনের তাঁর নামের আগে সিংহ নামে (কীর্তিবর্ধনে), কুল নামে (পরিচয়ে নাম), ধরম নামে (ধর্মের পৌত্তলিক নামে) ও কর্মনামে। তাঁরা পৌত্তে নিয়মেছ, তাই নামের সঙ্গে সিং গাধীর ব্যবহার অবশ্যিক করলেন। কৃপাণের প্রতি অনুরক্তি তাঁদের সর্বোক্ত বলিদানে পণ্য হয়ে ওঠে বলে তিনি বললেন। পাহাড়পরির রাজিয়ানের জন্যে নির্দেশ দিলেন, 'ওরা গরমীকে খালসা'। গুরুর বিরাগভাজন এমন অনেকদের একটা শক্তিতে হয়ে ঔরঙ্গজেবের সাহায্য প্রার্থনা করলেন, তাঁর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা খর্ব করার জন্য। সম্রাটের নির্দেশে লাহোর ও সিরহিন্দের নবাব বিপুল বাহিনী নিয়ে ১৭০১ খ্রিস্টাব্দে আনন্দপুরের দিকে অগ্রসর হল। দীর্ঘ তিন বছর এই বাহিনী গুরুর দুর্গ ঘিরে রাখল, কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ করলেন না। তাঁর অনেক অনুগামী ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় প্রাণ ত্যাগ করলেন, অনেকে আবার যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন। চল্লিশজন তাঁকে ত্যাগ করে ঘরে ফিরে গেলে মুঘলের ঘরে ফিরন্তুত হয়ে আবার গুরুর কাছে ফিরে গেলেন ও যুদ্ধ করে প্রাণ দিলেন। তাঁদের এ কারণে বলা হয় 'মুক্ত আত্মা'।

অবস্থা দুর্গম অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়লে অনুগামীদের লাহোরে গুরু সপরিবারে অন্য কোনও আশ্রয়ের জন্য দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা তাঁদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে গুরুর পরিবার তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সঙ্গে রয়ে গেল তাঁর দুই বড় ছেলে। গুরুর মা গুজরি দুই নাতিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁদের এক ব্রাহ্মণ পরিচারকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁদের সিরহিন্দের নবাবের হাতে তুলে দিল। নবাব গুরুর দুই নাবালককে জীবন্ত কবর দিল। এ আঘাত সহ্য করতে না পেরে গুরুর মা গুজরি প্রাণত্যাগ করলেন। গুরু পিছে উপস্থিত হয়েছিলেন চামকউর গ্রামে (বর্তমান লাধানা জেলায়)। এখানে যুদ্ধে গুরু তাঁর দুই পুত্রকে হারালেন। তাঁর সঙ্গে রয়ে গেলেন মাত্র পাঁচজন শিখ অনুগামী। তাঁদের অনুরোধে তিনি ছদ্মবেশে আশ্রয় খুঁজতে বেরিয়ে গেলেন। মোগলবাহিনীও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করছিল। পথে গুরু কিছু লোক সংগ্রহ করে গড়ে তুললেন এক ছোট বাহিনী এবং শত্রুকে উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পরাস্ত করলেন। এবার তিনি তালবণ্ডী সাবুতে পৌঁছে কিছুদিন কাটালেন। এ জায়গাটি পরে দমদমাসাহেব নামে খ্যাত, যার অর্থ বিশ্রামস্থল। এ জায়গাটি গুরু জানী জন্মের থাকে। একদিন তিনি তাঁর গুরুগ্রন্থের সম্পাদনা করে তা থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিয়ে, কিছু বাণীর সংশোধন করে, আরও প্রার্থনার জন্য দারটি ছোত্র সংযোজন-সহ তাঁর নিজের রচিত বলে স্বীকৃত একখানি বিরাটাকার গ্রন্থের মোগ করে গুরুগ্রন্থ সাহিবের মর্যাদা ঘোষণা করলেন, যা গুরু অর্জুনদেবের সময় প্রথমটি ছিল।

ঔরঙ্গজেবের নিকট গুরু গোবিন্দ সিং আরবি ভাষায় ছন্দে এক পত্র লিখে জানালেন, যদিও তিনি নিজেকে একজন ধার্মিক বলে থাকেন, তবুও তাঁকে গুরুদ্বের কাজ করতে হল। তাঁর চার পুত্র-সহ ঘরের প্রায় সেল, তাঁর অনুগামীরা জীবন দিলেন, আরও অনেকে নারা গেলেন। তিনিই শুধু একা বেঁচে। যখন সাক্ষাৎকারের বাইরে চলে গেল, তখন ভাবলাম বোধ হয় আমি কোন যুদ্ধ করাই সম্ভোষ নয়।

ঔরঙ্গজেব গুরু গোবিন্দ সিংহকে লিখি ডেকে পাঠালেন। গুরু তা পালন করার পূর্বেই খবর পেলেন সম্রাট ইহেজাগ করেছেন। গুরু বিলম্ব না করে দিল্লি পৌঁছলে বাহাদুর শাহ্ সৈন্যবল-সহ গুরুর সাহায্য প্রার্থনা করলেন উত্তরাধিকারের যুদ্ধে। গুরু তাঁকে সাহায্য করলে বাহাদুর শাহ্ বিজয়লাভের পর গুরুকে অনুরোধ তাঁর সভায় নিমন্ত্রণ করে সম্মানের নিদর্শন, মণিমুক্তা খচিত খঞ্জর ও বাটি হাজার টাকা নজর উপহার দিলেন। গুরু একেছিলেন নামকরণ ও জাতুকাহ্—এ দুয়ের মধ্যে যে তফাৎটুকু, তার একটা ঐতিহাসিক ভেদ। কিন্তু তা বিলম্ব হলে তিনি দক্ষিণ প্রান্তে প্রস্থান হয়ে নান্দেড়-এ স্থির নিবেদ হলেন।

নতুন সম্রাটের উপর গুরুর ক্রমবর্ধমান প্রভাবে শঙ্কিত হয়ে সিরহিন্দের নবাব দুই পাঠান আততায়ী নিযুক্ত করলেন তাঁকে হত্যা করার জন্য। এদের আঘাতে গুরু গোবিন্দ সিং গুরুতরভাবে আহত হলেন এবং তার ফলেই ৭-১০-১৭০৮ তারিখে নান্দেড়-এ দেহনিবাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুশয্যার পিছনে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন তাদের পরবর্তী গুরু কে হবেন। গুরু গোবিন্দ সিং বললেন, "আমি গ্রন্থ সাহেবকে সমস্ত গুরু আত্মিক গুরু অনন্তধার্মিক (তেকুগাদ) গুরু হল খালসা পন্থ"। এরই ধারায় আত্মিক ও সাম্রাজ্যিক শাসনে গুরু গোবিন্দ সিং প্রতিষ্ঠা করলেন চিরন্তন গণতন্ত্র।

গুরুর মৃত্যুর পরেও বন্দা সিং বাহাদুর মোগলদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সাত বছর সংগ্রাম করে বিজয় লাভ করেছিলেন।

জন্ম দিয়ে ছিলেন গুরু গোবিন্দ সিং-এর এক ভিন্ন সম্প্রদায়ের শিষ্য। তিনি নিজের পশ্চিমে তাঁর নিজস্ব শাসন প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর জীবনগাথা নিয়েই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'বন্দী বীর'। গুরুদাসপুর গ্রামে তাঁকে বন্দী করে মোগলরা সাতদিন অনাহারের মৃত্যুদণ্ড দেয়। তার পরের শতাব্দী এবং ছিল শিখদের পক্ষে এক জীবন-মরণ সংগ্রাম। তাদের রক্তের তৃষ্ণা মৃত্যু পঞ্চনদ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল। তারা প্রাণ ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল জঙ্গলে। কিন্তু এ অবস্থায়ও গেরিলা পদ্ধতিতে সংগ্রাম করে তারা শত্রুপক্ষ করেছিল ব্যতিব্যস্ত আক্রমণকারী নাদির শাহ্ ও আহমদ শাহ্ আবদালীর বাহিনীকে। তারা এ পর্বে বারেবারে পেরেছিল বিজয়ী হয়েছিল কিন্তু কোনও আক্রমণের সময়ই একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তা করতে এগিয়ে আসেনি। পঞ্জাবকেশরী রঞ্জিত সিং এর পূর্বেই তারা এক সমাজ গড়ে তুলে ছিল যার আইনে ছিল বর্তমানে পঞ্জাবের বৃহত্তর অংশ, কাশ্মীর-কাবীর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি। বারোটি মিসলের এক একটি শাখা তাদের নিজস্ব স্বশাসিত স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এদের শিখ রাষ্ট্রের মধ্যে ছিল পাতিয়ালা, নাভা, জিন্দ, ফরিদকোট, কলসিয়া ও কপুরথালা। ১৮০৯ খ্রি: রঞ্জিত সিং-এর মৃত্যুর পর নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে নানা ষড়যন্ত্র বহিত হল বিশ্বাসের মধ্যে। ইংরেজ তার সুযোগ নিয়ে শিখভূমি ইংরেজ শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে নিল।

চার

পঞ্জাব ও বাংলার একই উপনিবেশের অঙ্গ হওয়ার কারণে উভয় দেশের সঙ্গে সম্পর্ক এক ঐতিহাসিক ব্যাপার। সে সম্পর্কের সূত্রপাতই শিখরা নানা সময়ে কলকাতায়ে এসেছেন। গুরু নানক ও গুরু হরগোবিন্দের কলকাতায় এসেছিলেন আগে পূর্বে তার আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ তাঁরা সঙ্গে ইংরেজদের অনুরোধ জায়গায় 'সমর' করেছিলেন। তাঁরা ছিল সম্ভবত পঞ্জাবীদের এক ভিন্ন পরের। ব্যবসায়িক কারণে শিখরা গুরু অর্জুনদেবের উপদেশে এসব অঞ্চলে এসে তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসেরও প্রচার করেছিলেন। তার পরের শিখরাই অনেক শিখ এখানে এসেছেন তাঁদের নিশ্চয়ভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কারণ গুরু গোবিন্দ সিং-এর নির্দেশে শিখ সম্প্রদায়ের পরিচয়সূচক চিহ্ন ব্যবহারের কারণে পরবর্তীকালে তাঁদের গণনা করা সম্ভব হয়েছে। তার পূর্বেও তাঁরা অনেকেই এসেছে এসেছেন ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে। শিখ ধর্ম মানুষের আধ্যাত্মিক ও আর্থিক সমৃদ্ধির প্রবক্তা। বিদেশ ভ্রমণের উপদেশ কোনও গুরুই দেননি। একবার গুরু নানক তাঁর সঙ্গী মর্দানকে সঙ্গে নিয়ে এক গ্রামে গেলে তাঁর অভ্যর্থনা করা না, তারা কষ্ট দেওয়া শুনবার হল তাঁকে। গুরু তাই গ্রামবাসীদের আশীর্বাদ করলেন তারা যেন ঐ গ্রামের মধ্যেই ছড়ান থাকে। অন্য এক গ্রামের মানুষ তাঁদের স্বাগত জানালে গুরু আশীর্বাদ জানালেন তারের গ্রাম যেন উজাড় হয়ে যায়। মর্দানা বিস্মিত হয়ে গেলেন এ ধরনের অদ্ভুত আশীর্বাদের তাৎপর্য জানতে চাইলে গুরু বললেন গ্রাম ছাড়া হলে গ্রামবাসীরা দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়বে বাণিজ্য বৃদ্ধিতে, তাতে তাদের আর্থিক উন্নতি হবে। অপর দিকে যারা গ্রামেই থেকে যাবে তারা কোনদিনই আর্থিক উন্নতির মুখ দেখতে পাবে না। অবশ্য গুরুর এমন আশীর্বাদের অন্যরকম ব্যাখ্যা করে অনেক ঐতিহাসিক বলেছেন—গুরু বলতে চেয়েছিলেন যারা ক-গ্রামেই মুখে থাকবে তারা তাদের দুর্ভাগ্যজনের ছায়া বাইরের লোকদের ভালোকিত করতে পারবে না। তাই তাঁদেরকে স্থানান্তর জানিয়েছেন যারা এলাকাকে ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তের মানুষকে পুণ্যবান ও সুখীজন মতে সমৃদ্ধ করতে তাদের সুযোগের ব্যবহারের দ্বারা।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে গুরু নানকদেবের কলকাতায় আগমন ও সফর করার কথা। তবুও জানা, আধুনিক কলকাতার ইতিহাসে শিখদের প্রথম আবির্ভাব কবে হয়েছিল তা নিয়ে নিশ্চয় করে বলা অসম্ভব অথবা বলব রাজনৈতিক কারণে তা চলেই আসছিল। সফরের কারণেও তা সম্ভব হয়েছিল। বড়বাজারের গুরুদ্বারটির ঐতিহ্যগত মর্যাদা রয়েছে আর তাই তার পরিচালন ব্যবস্থা অমৃতসরের কেন্দ্রীয় গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির অধীনে। এ কারণেও অন্তত তাঁরা আসছেন এখানে পঞ্জাব থেকে।

অনেকে বাজার কলাব শিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী উমিচাঁদকে পঞ্জাবের শিখ বলে আখ্যা দিয়েছেন। উমিচাঁদ ও তার ভাই দীনচাঁদ কলকাতায় এসেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তাদের পৈতৃক উপাধি ছিল ওসরা। দীনচাঁদ ওসরা ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাঙালি। আপার সার্কুলার রোডের ধারে বর্তমান নাখোদা মসজিদের উপর ছিল কলকাতার প্রথম ডেপুটি অধিকার বা কালো জমিদার গোবিন্দরাম মিত্রর বাগানবাড়ি। গোবিন্দরাম এ কাজে নিযুক্ত ছিলেন ১৭২০-১৭৪৬ খ্রি: পর্যন্ত। এ বাগানের দক্ষিণ পাশেই ছিল উমিচাঁদের অপেক্ষাকৃত ছোট বাগান বাড়ি। ১৭৫৭ খ্রি: সিরাজের বিরুদ্ধাচরণ কলকাতা আক্রমণের সময় নবাব হয়ে এখানে ছিলেন। এই উমিচাঁদের জাতি ছিল। তা নিয়ে কলকাতার এক ছড়ায় প্রচলন ছিল :

কলমালী সরকারের জাতি,
গোবিন্দরামের ধুতি,
উমিচাঁদের পাতি,
রাজবল্লভের কড়ি।

'কলকাতা কথা' গ্রন্থকার যিনি মহাশয় বলেছেন, "উমিচাঁদ ও রাজবল্লভ পাঞ্জাবের লোক—শিখ ছিলেন।" তাঁর মন্তব্যের ঠিক বোঝা গেল না উমিচাঁদই শিখ ছিলেন কিনা, তবে উমিচাঁদের পাতি ছিল তা ছড়ার বয়ানে সুস্পষ্ট। উমিচাঁদের পাতির উল্লেখ থেকেই কি তিনি তাকে শিখ বলতে চেয়েছেন ? অন্যান্য কোনও সূত্র থেকেই হয়তো এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

সেকালের 'পাক্কা জ্বর'—একালের 'ম্যালেরিয়া'

হরিপদ ভৌমিক

গ্রাম অঞ্চলগুলো থেকে খুব-একটি ব্যতিক্রম নয় এমন কয়েকটি ইউরোপীয় পরিবারের সঙ্গে অল্প একদিন বন-জঙ্গলে ঘেরা ছিল। নদীর তীরবর্তিতে ঘন জঙ্গলে কিছু মানুষের বসতি ছিল। সেটা অঞ্চলটি জঙ্গলবুড়ি বা বাদাবুড়ি নামে পরিচিত ছিল। এই বাদাবুড়ি-ই ছিল সুন্দর অরণ্যের রাজধানী। ব্রিটের কর্মচারী হিসেবে কলকাতা-সুতানুটি -গোবিন্দপুর অঞ্চলটি প্রসিদ্ধ ছিল। সেই সময় হুগলি বন্দরের কথাও মনে, আর নদীর জল ছিল সুমিষ্টের কারণে। সুতানুটি থেকে জমিদারদের নিয়ে এই জঙ্গলের মধ্য দিয়েই একটি সরু পথ চলে ছিল নাম জমিদারদের পথ।

জোব চার্নকের সঙ্গে কাউন্সেলের ছড়িয়ে ছিল চার্নক একদিন আস্তানার জন্য এই ভাল অঞ্চলটিতেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, অপরাজ্বর এই পরিবেশে মশার কামড়ের ফল বেশে দু-দশ জন সৈন্য মরবে ঠিকই, কিন্তু জোসালের কামড়ের মুখে পড়লে রাত্রে বলে মৃত্যু অনিবার্য—এ থেকে বাঁচা যাবে। দেশীয় মানুষজন এই অঞ্চলে বসবাস করতেন বলেই তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিল। জোব চার্নক ভেবেছিলেন, জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে পারলে মশার উপদ্রব কমবে, কিন্তু টাকা। টাকা নেই, তাই তিনি প্রচার করলেন—"জোসালীয় সরকার যে সমস্ত পতিত-জমি আছে বা জঙ্গল আছে, তারা কাটিয়া ও পরিষ্কার করিয়া যে কোনও ব্যক্তি বসবাস ইচ্ছা ও প্রয়োজনানুসারে যে কোনও স্থানে ঘর-বাড়ি করিতে পারিবে।"

এই একটি প্রচারেই কাজ হয়ে গেল, দেশীয় মানুষজন ভেবেছিল—জমির জন্য খাজনা দিতে হবে না, শুধু জঙ্গল পরিষ্কার করে নিলেই জমির মালিক। সুতরাং কলকাতা জঙ্গল কেটে বসতি করার লোক জুটে গেল অনেক। যে যতটুকু পরিষ্কার করল, তাতে বাড়িটা পরিষ্কার হল বটে, কিন্তু মশা কমল না—কারণ বাড়ির বাইরে, কাঁচা রাস্তার পাশে যে কাঁচা নর্দমা, ডোবা রয়েছে তা বন্ধ করা যাবে কি দিয়ে টাকা কোথায় ? অনেক ভেবেচিন্তে একটা রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেল, সে-টা কি ? সেটি হল দেশীয় মানুষদের মধ্যে যারা অপরাধ করবে তাদের ধরে জরিমানা আদায় করা হবে। আর যদিতে সাহেবদের হাতে এই টাকাটাই শুধু ছিল। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দে কাউন্সিলের এক আদেশ প্রচার করে বলা হল—"দেশীয় অধিবাসীদের অপরাধের পরিবর্তনে যে সমস্ত জরিমানা আদায় হইবে, সেই আয় হইতে সহরের রাস্তার ও আশেপাশের নর্দমা, পানা ও ডোবা সমস্ত জমাট করা যাইবে।"

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে নাগাদ আবারও মানুষ এসে কলকাতা-অঞ্চলে ডোমের নিজেদের খুশিমতো ঘর-বাড়ি তৈরি করল। আগেরই আবার বসতিটের সঙ্গে এক বা একাধিক পুকুর কাটাল। মশা মারার জন্য ঘরে-ডোবা বন্ধ করতে সাহেবরা যখন ফিরিলির যাচ্ছে, তখন নেটিভ মানুষেরা নূতন করে পুকুর কেটে মশা বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে দেখে সাহেবরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ আলোচনার পর কোর্ট উইলিয়ম-এর বরাবরে এক নোটিশ লাগানো হল এবং নোটিশের কপি ঢাক পিটিয়ে সকলকে জানিয়ে দেওয়া হল, কাউন্সিলের দেওয়া এই নোটিশে বলা হল—"এইজন বিশুদ্ধজলাভাবে আর ঘর-বাড়ি নির্মাণ করিতে দেওয়া হইবে না। এরূপ দেখা গিয়াছে যে অনেকে ফোর্ট উইলিয়মের কর্তৃপক্ষীয়দের অনুমতি না লইয়া, বাড়ির চারিদিকে পরিখা খুলিয়াছে কিংবা বাড়ির মধ্যে পুষ্করিণী কাটাইয়াছে। তাহাতে সহরের আর এরূপ পুষ্করিণী নির্মিত না হয়, তজ্জন্যে কর্তৃপক্ষের সাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য একটি নোটিশ দেওয়া হইল।"

কলকাতার মশা সেকালে নেটিভ মানুষদের সঙ্গে মিলেমিশে মনের একজন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু অসুবিধা করল উচ্চবর্গের সাদা চামড়ার মানুষদের। মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া জ্বর নিয়ে সাহেবরা বাস্তহারা হয়ে গিয়েছিল। ১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতার সাহেবরা সবচেয়ে বেশি ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ১৭০৩ ইংরেজ অধিবাসীর মধ্যে এই সময়ে ৪৬০ জন মানুষ জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। ১৭০৭ সালেই সাহেবদের দল জনমৃত্যুর কারণে কাউন্সিলের কর্তাদের একটি হাসপাতাল তৈরির চিন্তা ভাবনা আসে। এই সালেই কলকাতায় প্রথম হাসপাতাল স্থাপিত হয়। তারকটি ঘোষণায় বলা হয়েছিল—"কলিকাতা-দুর্গের নিকট একটি সুবিধাজনক উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে, সেখানে হাসপাতাল নির্মিত হইবে। এইজন্য কোম্পানি দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করিলেন। যে সমস্ত ইউরোপীয় জাহাজ দেশীয় নৌকা ও অন্য ইত্যাদি আনিবার জন্য কলিকাতা-বন্দরে অবস্থিতি করিবে, তাহাদের নিকট হইতে হাসপাতাল নির্মাণের জন্য টাকা নেওয়া হইবে এবং মাসোহারা টাকা দিতে হবে। কোম্পানির আদায় সাহেব এই সমস্ত টাকা আদায় ও বাড়ি নির্মাণকার্য তদারক করিবেন।"

১৭১০ খ্রিস্টাব্দে হাসপাতালটি অনেকটা উন্নতি করা হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের যে নিয়মাবলীটি প্রথম চালু ছিল তা নিম্নরূপ—

১৭৯৩ খ্রি: প্রকাশিত কটুক্ষ পাশের পত্রিকায় ডাক্তারিয়া জ্বরের ঔষধের বিজ্ঞাপন

"এক. যে সমস্ত সৈনিক অধিবাসিয়, পীড়া হইলেই তাহাদের হাসপাতালে আসিতে হইবে।

দুই. প্রত্যেক সৈনিককে পেয়াদিল বাবদ নির্ধারণে প্রতিদিন চারি আনা করিয়া দিতে হইবে।

তিন. যাহাতে পীড়িত ব্যক্তি হাসপাতালে যাইতে না পারে তজ্জন্য একজন গোরা সৈনিক পাহারা দিবার জন্য নিযুক্ত হইবে।

চার. তাহাতে অধিক হইতে কোনওরূপ উৎপাতক ঘটিয়া রোগীদের স্বাস্থ্য শুশ্রূষাবে অবহেলিত না হয়, তাহার উপায় দেখা কর্তব্য।

পাঁচ. হাসপাতালের রোগীদের প্রয়োজনীয় বিছানাপত্র ও পোষাক পরিচ্ছদাদি ধোয়াইবার জন্য ত্রিশ টাকা বেতনে একজন স্টিউয়ার্ড নিযুক্ত করা হইল। এই স্টিউয়ার্ড ব্যতীত কাহাকেও ধোবার কার্য ও তৈলের জন্য কখনও ভাতা পাইবে না।"

১৭১০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার স্বাস্থ্যরক্ষার উন্নতির জন্য নদীর উপর এক আদেশে বলা হয়েছিল—"ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের মধ্যে ও আশেপাশে অনেক গাছপালা ও জঙ্গলের আছে। পয়ঃপ্রণালীর বন্দোবস্তও ভাল নাই। এই সমস্ত গাছপালা কাটিয়া ও দুর্গস্থানের নালা-নর্দমা বুজাইয়া দিয়া দুর্গের চারিদিকের জল-নিকাশের জন্য নয়ানজুলী কাটিয়া দিতে হইবে। তাহাতে দুর্গের চারিপাশে জল নিকাশ হইয়া বড়ো বড়ো গঙ্গানালায় গিয়া পড়ে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

১৩ জানুয়ারি ১৭৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কর্তৃপক্ষ বিলেতে চিঠি লিখে জানান—"আমরা কলিকাতার জমিদারকে আদেশ করিয়াছি, তিনি যেন কলিকাতার ড্রেনগুলির একটি সার্ভে লয়েন। কোনও ড্রেন মেরামত বা নূতন করিতে কত খরচ পড়িবে, তাহারও একটা এস্টিমেট আমরা চেয়েছিলাম। তিনি এ সম্বন্ধে একটি রিপোর্টও আমাদের দিয়াছেন। আমরা তাঁকে এই ড্রেনগুলির উন্নতি করে কলকাতাকে স্বাস্থ্যকর করার আদেশ প্রদান করেছি।

মশামুক্ত করতে ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে একটি নূতন পথ বের করা হল, কঁড়েকে পাকা করতে ইট চাই। ইট পোড়াতে কাঠ চাই সুতরাং কাঠের জন্য জঙ্গল পরিষ্কার হওয়া চাই। এই মনে এক নোটিশে বলা হয়েছিল—"কোম্পানির ব্যবহার ইটের পাঁজা পোড়াইবার জন্য, কলিকাতার নিকটবর্তী একটি জঙ্গল কাটাইয়া সাফ-সফাই করিতে হইবে।" ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার কাউন্সিল বিলেতে পত্র লিখে জানিয়ে ছিলেন—"চারিদিকের নালা-নর্দমা কাটিয়া নগরকে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যপূর্ণ করিবার জন্য সম্প্রতি জমিদারকে আদেশ করা হইয়াছে।"

না, এত করেও কলকাতাকে ম্যালেরিয়া মুক্ত করা গেল না। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় ভয়ানক মহামারী জ্বর উপস্থিত হয়। ২৫ আগস্ট ১৭৫৭ তারিখে লর্ড ক্লাইভ জানিয়েছেন—"বর্তমান কলকাতার অবস্থা অতি অস্বাস্থ্যকর। এই সঙ্কট সময়ে সেনাপতিকে কলকাতায় রাখলে তাদের অনেকেই 'পাকা জ্বরে' মৃত্যুমুখে পতিত হবে। সেনাগণের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করে আমি আপাতত তাদের কলকাতাবাস রহিত করলাম। আশা করি, আমার এই প্রস্তাব কোম্পানির সেনাদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার হবে।"

বছর	পাকা বাড়ি	কাঁচা বাড়ি	ছাপ্পর	খলি	ছোটখলি	পুষ্করিণী
১৭০৬ খ্রি.	৮	৮,০০০	২	২	—	১৭
১৭২৬ খ্রি.	৪০	১০,০০০	৪	৮	—	২৭
১৭৪২ খ্রি.	১২১	১৪,৭৪৭	১৬	৪৬	৭৪	২৭
১৭৪৬ খ্রি.	৪১৮	১৬,৪৫০	২৭	৫২	৭৪	১৩

ব্যবস্থাপত্র।

REGISTERED Trade Mark রেজিষ্টারি করা।

PROP. ...

ডিঃ গুপ্ত এণ্ড কোম্পানির

এন্টিসিফিলিটিক মিক্শ্চার।

...

যেখ আদিম পুরাতন ঘা, আতসকিয়া ঘা, গলা ও তালুর, টন্সিল ও [illegible] ঘা, কানের ঘা, ঘৈতিকের ঘা, শিশ্ন ও বঙ্কণাণ্ড প্রদেশ হইতে নিঃসৃত পচা ঘা ও সিফিলিক ব্যাধিসমূহ। মূলা মাত্র ১৫০ টাকা, ডেলিভারি ...

বৈশাখের বিক্রয়-পুর্ণ বছরে অর্ডারের আকার, ১০ বছরের ১২ বোতল ১৫০ টাকা আকার, ১৫০ বছরের ২০ বোতল ২৫০ টাকা আকার, ২০ বছরের ৩০ বোতল ৩৫০ টাকা আকার, ২৫ বছরের ৪০ বোতল ৪৫০ টাকা আকার, ৩০ বছর উর্দ্ধে ৫০ বোতল ৫৫০ টাকা আকার, [illegible] এবং বিশেষ বয়সে কিরূপ ঔষধ সেবন করিতে হইবে।

ইহা পরিবর্ত্তনের প্রণালী।

যদি কোন রোগীর আকার একেবারে বিশেষ না হইয়া কোন অংশে ১ বা ২ টী বা কোন পীড়ার কম হয় তাহা হইলে অনায়াসে তাহার ছোট করা ঔষধ সেবন করিতে পারিবে। কিন্তু যদি [illegible] হইলে [illegible] ঔষধ [illegible] ঔষধ [illegible] ঔষধ

১১ই আগস্ট, বুধবার, বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা ঈশ্বরের—আর ও বিশ্বের ইংরা সকলকে জানান যাইতেছে। এতি বৎসর হইতে এই মেলা প্রতিষ্ঠা করিবেন। বট্টক্ষ ৭৯৯ ৫৪ ১৭১ খ্রিস্টাব্দ।

১৭০৪ খ্রিঃ পরিত্যক্ত গরুর গাড়িতে মালপত্তর ফেলে একবারে চলিয়ে দিয়েছিল

অনেকেরই অবশ্য কোম্পানী বাহাদুরের ভাবনাটা, তাঁরা কলকাতার অধিবাসীদের সহযোগিতায় এখানকার জঙ্গলমুক্ত করার চেষ্টা করেন। সরকারি এক আদেশে বলা হল—"সহরের মধ্যে ও আশেপাশে বড় বড় পাছগুলি ছেটে, কলকাতাকে রৌদ্র ও বায়ুপূর্ণ করা বিশেষ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এইজন্য আদেশ করা যাচ্ছে, আমাদের অধিকারের মধ্যে যারা বসবাস করছে, তারা নিজ ব্যয়ে নিজের নিজের দখলী জমির, বাগানের ও পরিত্যক্ত জমির জঙ্গল ছেটে দেবে। কদমগাছের ও অন্যান্য ফলের গাছগুলি শুধু তারা কাটতে পারবে না। যারা নিজ ব্যয়ে জঙ্গল কাটবে, তারা কাটা গাছের স্বত্বাধিকারী হবে। কোম্পানি এই সব গাছ সম্বন্ধে কোনওরূপ দাবি করবে না।"

১৭০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মশার সঙ্গে লড়াই চালিয়ে অনেক খাঁটি সাহেব পাওয়া গেল, পুরুষ মানে বেড়ে গেলেও গায়ে তা কমিয়ে আনা হল। এই সময় নীমার মধ্যে নীচের তালিকার সাহায্যে কলকাতা প্রথমের ক্রেতারা ছেড়ে বিলাতে গরুর গাড়ায়ক্রিয়ে হইছিল তার খানিকটা আন্দাজ পাওয়া যাবে—

সকলেরই জানা আছে, পোয়া থেকেই কলকাতা দু-ভাগে বিভক্ত, ব্রোবাইটা টাউন যা সাহেব পাড়া আর ব্ল্যাক টাউন বা নেটিভপাড়া। এই নেটিভ বা দেশী পাড়ায় কিন্তু আদুরেরা অসুবিধাতে জলের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে ছিল। যদি নেটিভ টাউনের মৃত্যুর হার বেশি থাকত তাহলে আলাদা করে এর উল্লেখ থাকার কথা নয়। তবে নেটিভপাড়া যে সাহেব পাড়া থেকে অনেক বেশি অবহেলিত ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ১৭৯২ সনের কথা বলি, তখন কলকাতা 'ভয়ানক' অস্বাস্থ্যকর স্থান ছিল বলে সাহেবরা উল্লেখ করেছেন। ইংরেজ অধিবাসীদের মৃত্যুর সংখ্যার বিরাম ছিল না। সকালে যা মধ্যাহ্নে যে ইংরেজ তার বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে একত্রে খানার খেয়ে গিয়েছে, রাত্রে পরদিন ভোরে সেই বন্ধুদেরই শব যাবার জন্য ডেকে আনা হল। ইংরেজ কবরীদের মধ্যে তখন একটা আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল। কোনও ইংরেজের মৃত্যুর সেখানেই তাঁদের প্রাণ উড়ে যেত। এই কারণে সেই সময় নূতন নিয়ম হয়, শবদেহগুলি রাত্রে সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ম্যালেরিয়ায় রাত্রে সাহেবদেরই বেশি মৃত্যু হত। জনস্টোন হ্যামিলটন সাহেব লিখেছেন—"যাঁরা একবার হাসপাতালে প্রবেশ করতেন, তাঁদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক রোগীই ফিরে আসতেন।" এই ম্যালেরিয়ার ভয়েই লর্ড ক্লাইভ সমস্তে এবং অন্যান্য পদস্থ ইংরেজরা শহরের বাইরে ফাঁকা জায়গায় থাকতে ভালবাসতেন।

নেটিভপাড়ার মধ্যে নালা-নর্দমা ও স্রোতের কোনও সুবন্দোবস্ত ছিল না। এখানেও চারিদিকে ছিল অস্বাস্থ্যকর জলাভূমি ও বনজঙ্গল। ধরতে গেলে তখন একমাত্র হিন্দুরাই গেলা পয়ঃপ্রণালী ছিল মারাঠা ডিচ। ১৮৬২ খ্রি. কলকাতায় ভয়ংকর সেপেছিল, ভয়ংকর পলিত মৃতদেহের দুর্গন্ধময় বিষাক্ত বাতাসে কলকাতার পরিবেশ ভারি হয়ে গিয়েছিল। ম্যালেরিয়া তখন পূর্ণমূর্তিতে বর্তমান। এই সনের ১২ ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গলীয় অভিমত জানা গেল—"কলকাতাকে কলাগাছ এ জঙ্গলশূন্য করতে হবে। তা না করলে সহরের স্বাস্থ্যরক্ষা অসম্ভব। এজন্য সারভেয়ার সাহেবকে আদেশ করা যাচ্ছে, মারাঠা ডিচ সীমানার মধ্যে জঙ্গলময় সমস্ত জায়গা তিনি পরিষ্কার করতে আরম্ভ করবেন।"

বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেও কলাকে বাগে এনে, ম্যালেরিয়াকে আটকানো গেল না। ১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে নাগরিক স্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য কলকাতা আরও কুখ্যাত হয়ে উঠল। সুপ্রিমকোর্টের খুব কম জজই জ্বরের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। মি. জাস্টিস হাইড তাঁর কোর্ট ডায়েরিতে লিখেছেন, "সারা ই. ইম্পে অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত। সার রবার্ট চেম্বারও অনুপস্থিত ছিলেন। ওরজলা তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। আমিও জ্বরে পড়েছিলাম, এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠতে পারিনি।"

১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে, কলকাতা জলনিকাশী ব্যবস্থাহীন জলাভূমি ঘিরে ছিল ম্যালেরিয়াপূর্ণ জঙ্গল। ওই সময় অভিযোগ করা হয়েছিল '৩০ বছর পূর্বে কলকাতার যে অবস্থা ছিল, এখনও তার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হয়নি।' এই সময় 'বাবরার' নামে এক রোগ আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, এই রোগে প্রবল জ্বর, কড়

আর্থিক সংস্থার অসহায় হাত কাজ করিয়ে নিত। এই জন্য এর চোখকে বলা হতো 'মায় কার' চোখ, যেমনটা ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের 'মার কার' খুব আড়ম্বরের সাথে প্রকাশিত।

এই পত্রের আগের একটি অনুচ্ছেদে দুঃখ ছাড়ি পাওয়া যাবে আর্টিফিশিয়ালের কবিতায়—

"কি অসহায়ই তখন তোমাও ছিল, যে অন্ধকারে :
পুলিশম্যান কথা, ফোন করে' তৈরী তোমার আর্থিক, আর
তোমার দুঃখি ?

অন্ধকারে কত প্রকার আর দুর্গন্ধময় কথা—
টিয়াপাখা নিয়ে আসে কত টিয়ের পাখে মাতাদের।
সকল নিয়েই উজ্জ্বল দৃষ্টি করে কত :
ইউনিফর্ম পরনের মতই চতুর্দিকে ছড়ায় বিষবাষ্প ;
নিবাসগৃহের ভ্রাণ অসহনীয়, আর ছাড়ি শুধু তোমাকে—
ক্লান্তির আবেশে ভরা, শীতসেঁতে, স্বাস্থ্যহীনের ন্যায় শয়ান,
পরাজয়ের উদ্দেশ্যহীন, প্রত্যেই মৃত্যু কবলিত।"

এত জনল পরিষ্কার, এক ইঞ্চি নর্দমা পাকা নয়নাভিরাম চেহারা তবুও মশা মশন সম্ভব হচ্ছে না কেন ? বিষয় সত্য, নানা দিক খতিয়ে দেখে ঠিক হল—জনল পরিষ্কার ফলে বস্তি কিছু বাড়ির সামনে খাল্লাসের যে নূতন জনল তৈরি হচ্ছে তা থেকেও মশা বাড়ছে সুতরাং জঞ্জাল পরিষ্কার করা বিষয়ে একটা স্থায়ী কিছু না করলে মশা ও ম্যালেরিয়া থেকে পরিত্রাণের কোনও উপায় নেই। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, কলকাতার মশা মুক্ত করতে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে একটি আলাদা 'মশলা ফোর্স' গঠন করা হবে। এই বিভাগটি পুলিশ কমিশনারের অধীনে রাখা হয়েছিল। ঐই সনের ১ জুন তারিখে এক নোটিশে বলা হয়েছিল—

"কমিশনার অব পুলিশ সাহেবের মশলা পরিষ্কার করার জন্য কয়েকটি নূতন আইন প্রচলন করেছেন। সেগুলি সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হল। এই বিভাগ নি. জোন্সের সেক্রেটারিয়েটের তত্ত্বাবধানে খোলা হল। তাঁর নিজ প্রতিষ্ঠিত খাল্লাসের এক ঘরে তিন নম্বর পামরস্ট 'মশলেদার অফিস' স্থাপিত হয়েছে। সাহেবের অধিবাসীগণকে জানানো যাচ্ছে, মশলদার পদবির জোন্সের এ আর্টিফিসের আদেশে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আইনগুলি গঠিত হয়েছে।

১। সমস্তদহর ৩১টি থানায় বিভক্ত হলো। প্রত্যেক থানেই এক একজন ইন্সপেক্টর জমাদারের অধীন।

সাহেব-পল্লীতে সাতটি থানা স্থাপিত হলো। প্রত্যেক থানার অধীন চারটি মশলা ফোর্স গাড়ি থাকবে। দেশীয় পল্লীতে প্রত্যেক থানার অধীন দুটি করে মশলা ফোর্স গাড়ি জমাদার তত্ত্বাবধান করবে।

চতুর্থ-স্তরে সমস্তটার তদারক হবেন কর্মচারীদের নিয়ে গড়া, এই কাজে নিযুক্ত অর্ধেকারীরা কোনওরূপ অবহেলা না দিয়ে, তা 'সুপারিন্টেন্ডেন্ট জেনারেল সাহেবের কাছে সরাসরি নিজেই তার উত্তর দেবে।

বর্তমানে কলকাতায় মশলা ফোর্স ক্লেন প্রতিটি সম্বন্ধে যে আইন প্রচলিত আছে, তাই পূর্ণভাবে কলকাতে হইল।"

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত এক সভায় এসব কথা সাব্যস্ত হয়েও এ কথা সত্যি, ম্যালেরিয়া মোকাবিলায় গ্রাম-কলকাতায় পরিচ্ছন্নতাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য, কল জলায় প্রতিটি জায়গা করার জন্য আলাদা একটি সমিতি বা অর্গানাইজেশন গঠন করা হয়েছিল। কাজটাকে সহজ করে বলা হয় 'মেয়র' আর মেয়রের কাজে সাহায্যের জন্য নয় জন সহকারী বা অলডারম্যান নিযুক্ত করা হয়।

'মশা'—একটি ছোট্ট জীব কেমন করে প্রথমে পশ্চিমে পরিণত করে দিল, তার কাহিনী-ই কলকাতার কাহিনী। কলকাতায় এই 'মশা'র কথা প্রথম যারা লেখে—'হেস্টে বলা দিনে মাছি,/এই তারিখে কলকাতায় আছি।' আর একটি ছড়ায় যা দুর্গতির মূলে জানিয়ে বলা হয়েছে—

"অগ্রে মোদের দেখতে পাবে বলিজনগ্রাহ্য,
এদিকে তোমার সন্তানেরা করে হায় হায়।
রক্তের জল যাচ্ছে, নূন জ্বাড় দেন জোর্ট,
ম্যালেরিয়া ধরছে এসে কেমনে ছাড়ি কোর্ট।"

ক্যালি পার্কস ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে কলকাতার জোনাকি আর 'মশা' সম্পর্কে অসাধারণ একটি বর্ণনা দিয়েছেন, দেখা যাক সেই কথা—

"কৃষ্ণপক্ষের রাতে গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোনাকি জ্বলতে থাকে, মনে হয় যেন ছোট ছোট আগুনের ফুলকি হাওয়ায় উড়ছে। একটা-দুটো নয়, অসংখ্য জোনাকি। এগুলো একদম্বাইয়ের পতঙ্গ, এমনি দেখতে অত্যন্ত কুৎসিত, সেজন্য নিজে আলো জ্বালিয়ে রাখে, উড়ে যায় যখন তখন আলো জ্বালতে ও নিভতে থাকে। বাড়ির গাছপালাগুলো ঘিরে জোনাকিরা যখন জ্বলতে-নিভতে থাকে তখন যে কি সুন্দর দেখায় তা আর কি বলব।...

তার উপর 'মশা' বলে একটি জীব আছে এদেশে। অগুনতি তাদের সংখ্যা, গুনগুন শব্দ করে তাঁকে তাঁকে উড়ে বেড়ায়। তাদের অতিসূক্ষ্ম ক্ষুদ্র দেহে একটি তারের জাল থাকে, মানুষের দেহে সেটি সূচের মতন বিঁধিয়ে দিয়ে রক্তপান করে। অবশ্য এদেশের যে না এই মশার কামড় খেয়েছে তাকে বলে বা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়, তার জ্বালা কি। কাপড় দিলেই সেখানে ফুলে ওঠে, ফুলবেই, ফুলবেই সেটা বিজ্ঞানের এবং সেই বিষ বাহিরে বেরোই কেন পেতে হবে। তার চেয়ে গায়ে যেন খাল কিন্তু মশা একেবারে অসহ্য।"

—'সর্ব্বজ্বর গজসিংহ' ঔষধটি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। এই ঔষধ বিক্রির বিজ্ঞাপন লালমোহন সাহা নিজে পত্রিকা ছেপে তাতে দিতেন—

সর্ব্বজ্বর গজসিংহ—ঔষধের ছোরা

সর্ব্বজ্বর গজসিংহ — সর্ব্বজ্বর নাশকর।
সর্ব্বজ্বর গজসিংহ — প্লীহা যকৃৎ ধ্বংসকর।
সর্ব্বজ্বর গজসিংহ — অম্লপিত্ত নাশকর।
সর্ব্বজ্বর গজসিংহ — শ্লৈষ্মিপাত হরকর।
সর্ব্বজ্বর গজসিংহ — পৌরাণজ্বর নাশকর।
সর্ব্বজ্বর গজসিংহ — বালজ্বর ধ্বংসকর।
সর্ব্বজ্বর গজসিংহ — মেলেরিয়া নাশকর।
সর্ব্বজ্বর গজসিংহ — লালমোহন প্রকাশকর॥'

- সর্ব্বজ্বর গজসিংহ—সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ।
- ছেলে মিত্র জ্বরে অচেতন নিরাশ গজসিংহ খাও বন্ধু পাইবে উল্লাস॥
- ব্রীলালমোহন সাহা পঞ্চনিধির সর্ব্বজ্বর গজসিংহ সেবনে নিরাশ রোগীর সহস্র ২ প্রশংসাপত্র সম্পূর্ণ অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থানীয় অনেকানেক লোকের ফটোগ্রাফও ছাপা হইয়াছে।
- ব্রীলালমোহন সাহা পঞ্চনিধির/সর্ব্বজ্বর গজসিংহ। সেবনে মেলেরিয়া জ্বর, ম্যালাজ্বর, নিয়ার জ্বর ও সর্ব্ব প্রকারের জ্বর আরোগ্য হয়। মূল্য বড় ১ ডিবা ১৷৷, মধ্যম ডিবায় ১ মোট ডিবা॥ আনা। ডাঃ মাঃ ১৷৷৷ ডিঃ

- রোগীগণ! সর্ব্বজ্বর গজসিংহ সেবন করুন।
- সর্ব্বপ্রকার জ্বরাদির মহৌষধ সর্ব্বজ্বর গজসিংহ মহৌষধ। মূল্য ১ ডিবা।
- সর্ব্বজ্বর—গজসিংহ
  সেবনে ধ্বংসে রাশি
  ওষধি বর্দ্ধন।
  গজসিংহ খাও বন্ধু
  ধরিয়ে যতন॥
- আমরা অধিক বলিতে পারি যে, অনেকের সময়ে প্রকাশ জ্বর ব্রীযুক্ত গোষ্টপদ ঔষধ সেবনে জন্মাবধি প্লীহা রোগে তিনি নিষ্কল হইয়াছেন, তিনি ব্রীলালমোহন সাহা পঞ্চনিধির সর্ব্বজ্বর গজসিংহ সেবনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতে পারিবেন। মূল্য বড় ডিবা ১৷৷ টাকা, মধ্যম ১ ডিবা ১, ছোট ডিবা॥ আনা। ডাঃ মাঃ

সর্ব্বজ্বর গজসিংহ' ঔষধের প্রশংসা করে যিনিপত্রও এসেছে অনেক। তার মধ্যে 'সাধু পুত্রলাভার্থ 'শ্রীমন্তনীলাভূ বিদ্যাসুন্দর' এমনি ছড়ায় প্রশংসাপত্র পাঠানো হাত পঞ্জিকায় ছাপা হয়। ঐ ছড়ার প্রথম দুটি লক্ষ্যভ্রষ্ট, তবে তেবে নিয়ে পড়ে গেলে এ ওষুধের মর্মটি পাওয়া যাবে। ছড়াটি এই রকম

সর্ব্ব-জ্বর গজসিংহ বিখ্যাত ভুবনে,
জ্বর-কষ্ট করে নষ্ট অতি অল্পক্ষণে।
পক্ক-যকৃৎ প্লীহাদায় তাহেতে পালায়,
পিত্ত-প্রেরি, আদি সব ঔষধ প্রভায়।

ঘটকৃষ্ণ পাল জ্বরের ঔষধের বিজ্ঞাপনটিও অভিনব। পঞ্জিকার উৎসব অনুষ্ঠানে যে ছবি ছাপা হত তার নীচে জ্বরের ঔষধের বিজ্ঞাপনগুলি থাকত। জ্বর নিয়ে যত বিজ্ঞাপন আমার চোখে পড়েছে তার মধ্যে ১৩১৩ বা ১৯০৬ সনের ছাপা লালমোহন বিদ্যানিধি 'সারস্বত পঞ্জিকার' (পৃ. ৬১৭-৬২৪) প্রকাশিত দুটি পরিচ্ছেদে ছাপা সবচ 'ঘটনাবলম্বনে' প্রকাশিত বিজ্ঞাপন-গল্পটি সর্বোত্তম। একজনের পড়বার জন্য বিজ্ঞাপন এখানে টাইপে তুলে দেওয়া হল—

ব্রীবর্ষকৌমিক সংবাদ।
সত্যঘটনাবলম্বনে-ব্রীরামপ্রসন্ন অধিকারী প্রণীত।
প্রথম পরিচ্ছেদ।

অধিকদিনের কথা নহে, প্রায় পাঁচ বৎসর গত, পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় ব্যক্তি গঙ্গাস্নান ও ব্রীধাম দর্শনে ধরিগাঁও। তাহারা ট্রেণে করিতে করিতে কলিকাতা গৌরীমহলের পার্শ্বে উপনীত। সেইখানে দেখিতে পাই যে, অনেকগুলি ব্যক্তি যমন রোগ শয্যা হইতে এইমাত্র উঠিয়া অতি কাতর চিত্তে মনের আনন্দে কি ভোজ পান করিতেছে। সেই কথাগুলি অতিশয় অদ্ভুত, আমাদের হৃদয় স্পর্শ করিয়া বাহির হইতেছে।

ব্রীপশুপতিকল্প সেই ভোজ শুনিতে সেই স্থানে বসিয়া পড়িল।

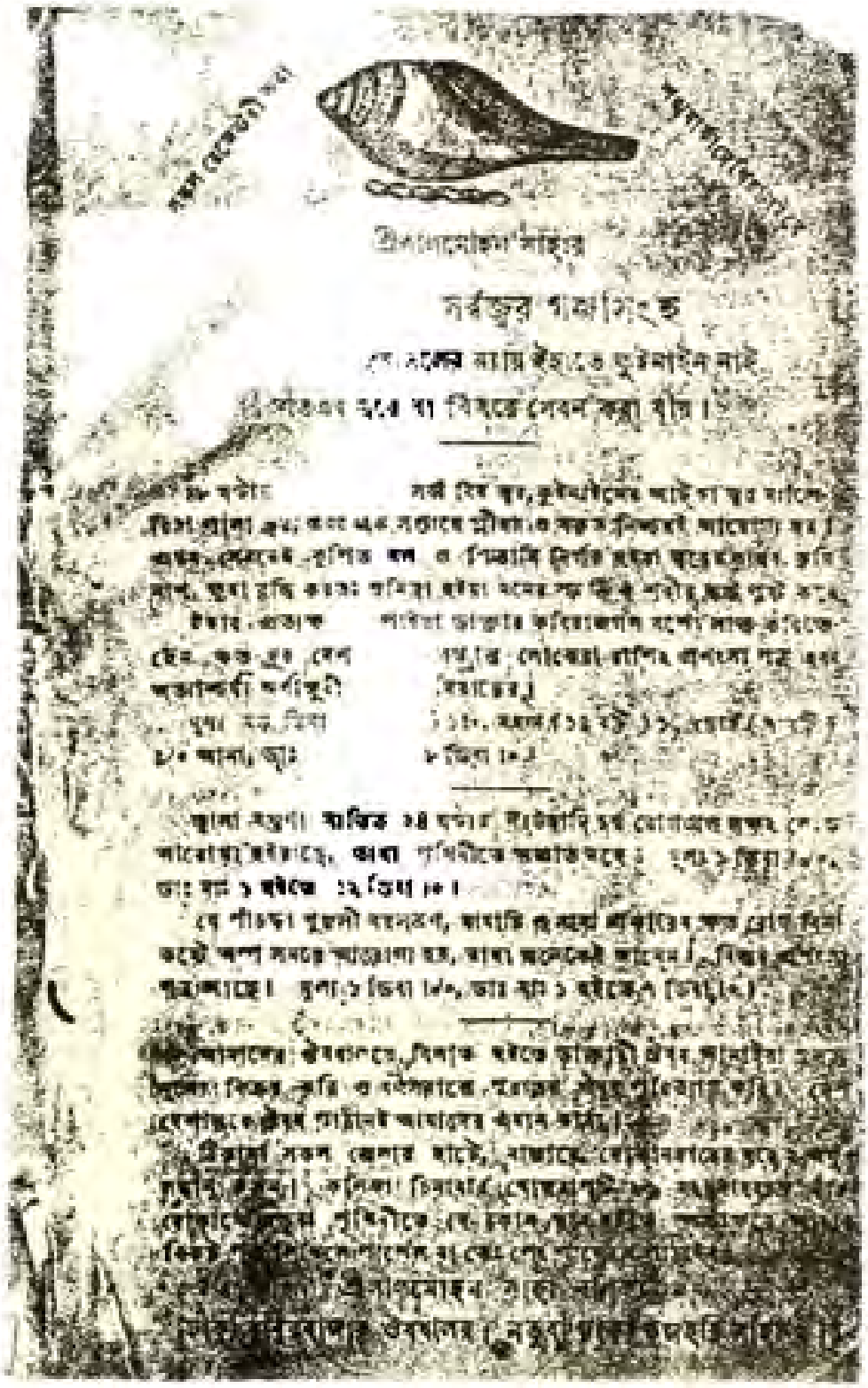

১৮৮২ খ্রিঃ হোমিও ফার্মাকোপিয়া আইনের বিধানের সর্বপ্রথম প্রকাশিত ঔষধের বিজ্ঞাপন।

নবরত্নে গঙ্গাদিয়াছে সর্বাঙ্গের বিলেপিনে
নবরত্নে গঙ্গাদিয়াছে ইন্দ্রে যক্ষে বিশ্বাদিনে
নবরত্নে গঙ্গাদিয়াছে মেলেরিয়া প্রশমিনে
নবরত্নে গঙ্গাদিয়াছে জলাঙ্কুর বিনাশিনে
নবরত্নে গঙ্গাদিয়াছে কবিরাজ কলপটিনে
নবরত্নে গঙ্গাদিয়াছে ঔষধমূল্য জলিশে
গঙ্গাঙ্কুর গঙ্গাদিয়ং পৃথিব্যাং পরিবাপকং
সর্বাঙ্গের গঙ্গাদিয়ং লালমোহন প্রচারকং

উপস্থিত ভীষণদর্শনেরগণ, মেরিয়ে লইল, অত ২ বাক্তি এক কণ্ঠে এই শ্লোক পাঠ করিতেছে। তাহাদের মধ্যে বালক, বৃদ্ধ, যুবক এবং স্ত্রীলোকও বিস্তর। উপস্থিত ব্যক্তিগণ, প্রথমে বুঝিতে দিল, ইহারা বোধ হয় রোগ মুক্ত হইয়া ডাক্তারেরই স্তব ও বন্দনা করিতেছে। কিন্তু যখন সর্বাঙ্গের গঙ্গাদিয়ে বটিকা ও লালমোহন প্রচারক এই কথা তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, তখনি তাহারা চমৎকৃত হইল। এবং শ্লোক পাঠ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। পরে অতি ত্বরান্বিত জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি জন্য এই শ্লোক পাঠ করিতেছেন। তখন সকলেই বলিতে উদ্যত হইল, মহাশয় আর কি বলিব, আমাদের গ্রামটীতে অধিকাংশ লোক মেলেরিয়া জ্বরে, প্রায় সকল লোকই রোগে জীবন্মৃত হইয়াছিল। কত চিকিৎসা, কত ঔষধ, কত ডাক্তার, কবিরাজ অসমর্থ হইয়াছে কিন্তু না জানি, ভগবানের কৃপায় এই সকলোকে মেলেরিয়ার গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এক মহাত্মার ধন্বন্তরীরূপে ঔষধ হস্তে ধরার মাঝারে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারই প্রকাশিত সর্বাঙ্গের গঙ্গাদিয়ে বটিকা, যেদিন হইতে এই মেলেরিয়া ও জ্বর বিজয়ের দেশে প্রচারিত হইল, সেই দিবসে যেন যমদূতী মেলেরিয়া আমাদের দেশ হইতে পলায়ন করিয়াছে।

পথিকগণ যদিও বুঝিতে পারিয়াছিল, ডাক্তারি জিনিষে চাহিল কি ঔষধ, নাম কি, কে প্রচার করিল, বাড়ী কোথায়, মূল্য কত ? তখন তাহারা বলিতে লাগিল, এ ঔষধ বঙ্গদেশের ডাক্তার নবরত্নের বাবু লালমোহন সাহা পঞ্চনিধি প্রচার করিয়াছেন। ঔষধের নাম সর্বাঙ্গের গঙ্গাদিয়ে বটিকা। রূপের ঘটোঘটি, এমন স্বর নাই, এই ঔষধ সেবনে ভাল না হয়। বোধ হয় এমন ঔষধ আর হয় নাই, আর হবে না। ধন্বন্তরি ভগবানই এই ঔষধ লালমোহন বাবুকে স্বপ্নযোগে পাঠাইয়া থাকিবেন। মহাশয় বলিব কি ঔষধের মূল্যও অধিক নয়। ৭ বটিকা এক ডিবার মূল্য মাত্র আনা, ১৪ বটিকা ১ টাকা এবং ২৮ বটিকা ১॥ টাকা। বলিতে কি প্রায় ৭ বটিকা খাইলেই রোগের উপশান্তি হয়। জিজ্ঞাসার পর উহারা বলিল, আমাদের এই যে সকলকে দেখিতেছেন, আমাদের কেহ হয় আর, কেহ কলেরাটিক মেলেরিয়া জ্বরে, কিম্বা জ্বরে, প্লীহা যকৃতে ভুগিতেছিলাম। সকল ঔষধ ও চিকিৎসায় জ্বর এড়াইয়া অধিয়ে জন্মিয়াছিলাম। কিন্তু ভগবানের প্রেরিত লালমোহন বাবুর প্রচারিত এই সর্বাঙ্গের গঙ্গাদিয়ে বটিকা খেয়ে সকলেই আরোগ্যলাভ করিয়াছি। যেন মেলেরিয়াদেবী এই দেশ হইতে ঘরের অধিকার চলিয়া গিয়াছে।

যাত্রিকগণের মধ্যে কেহ ২ বলিল, মহাশয়েরা ঠিক বলিতেছেন, জ্বরের এমন ঔষধ আর নাই, ইহা প্রায় পূর্বেই জানিতাম। কেহ বলিতে পারে না, এই ঔষধ জগতময় প্রচারিত আরোগ্যলাভ করে নাই। ইহার আপনাদের দেশকে স্বাস্থ্যবান করিয়া দিবেন, কতকগুলি লোক এমন দাঁড়াইয়াছে, তাহারা সর্বাঙ্গের বিলক্ষণটাই বলিয়া দোষ ও নিন্দায় পড়িয়া নকল ঔষধ এই দেশেতে ও বৌটার অযত্নে ও কারচুপিতে বাহির করিয়াছে। সেই ঔষধ লইয়া যেন বঞ্চিত না হয়। তাহাতে রোগ আরোগ্য থাক, বিষম অনিষ্টের কি প্রাণ নাশেরও সম্ভাবনা।

রোগমুক্ত ব্যক্তিগণ বলিয়া উঠিল তা জানাই : হা জানাই : তাইত তাইত, এমন লোকও জগতে আছে ? ছি ছি ! হোমরা এই সব লোক যেন যমের প্রেরিত গোপনীয় দূতানুদূতই হইবে। হায় বিধাতা !! ইহারাও তোমার মঙ্গলময় রাজ্যের পরম শত্রু। বলিয়া সকলে অনন্য মনে গান করিতে করিতে যাইতে লাগিল।

রাগিণী কীর্ত্তনিয়া সুর-খাম্বাজ।

আহার আগে। নেড়ে আগে ঝরবোখী ভোরা সঙ্গে।
ডেয়াকের জন্য আছে সেজন বিদ্যেটা পাঠালে ভবে।
সর্বাঙ্গের গঙ্গাদিয়ে বড়ি কৈরে সবে দিবে।
বিদ্যেটা বিদেয়ে করা, বটিকে জ্বর পালাবে।
লালমোহন সেনাপতি সর্বাঙ্গের বিনাশিবে।

এই গান করিতে করিতে নাচিতে সকলে নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

ঔষধাত্মিক সংবাদ।
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যাত্রিকগণ, ঔষধ হইতে ঔষধান্তরে যাইতে লাগিল, ক্রমে অনুসন্ধান অন্বেষণান্তরের পৈতৃক নিবাস শ্রীহট্টের পল্লীতে উপস্থিত। সেই পল্লিগ্রামে দর্শন করিয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে দূর হইতে একটী গান যেন তাহাদের কর্ণে মৃদু মৃদু প্রবেশ করিল। সকলে ভাবিল, একি আশ্চর্য ! পৌষীসাসের পাটে, বাঁধকুড়া বিজলুরের মতো শুনিয়াছি, তাহাই কি আবার এই স্থানের বা না এ খানি আবার কিরূপ। সকলেই একান্ত মনে শুনিতে ছিল।

কি শুনিল ?

রাগিণী জংলোটি—তাল একতাল।

আহাহা ! দেখ দেখি কে ঘটে সেজন
সর্বাঙ্গের গঙ্গাদিয়ে গুলিল এখন।
ঘরে ঘরে যে অসুখ, পলাবে ছিল কাহার

এই 'অসুখ' শব্দ নিয়ে কলকলান্তর বাবুদলাদেশের চিরশত্রুর ঠেকটি গেল। শব্দ এবং মেলেরিয়ার জ্বর সম্বন্ধে কত ঔষধ যে আবিষ্কার হইয়াছে, হয়ত, হবে তার সংখ্যার হিসেব কেউ করেনি। কত শতকের পেছে এবং এই শতকের গোড়ায় মালেরিয়া রোগে অত্রদেশ অনুক্ষণের জন্য ঢলঢল লালমোহন

দৃতদের দেহ ত্রাস, এ শরীর মৃত্যু হেন।
শরীরে জ্বর বিকার, দেখেশুনিয়া আসন্নকাল
জিহ্বা ঠাণ্ডা হয়ে যায়, বাঁচিবা আসার্থ নাশ।
পঞ্চনিদি লালমোহন, ধন্বন্তরী ধরায় যেন
প্রকাশিল এ ঔষধ, মৃত্যুঞ্জয় বটী হেন।
জ্বর নাশ করে ভাল, নতুন জীবন ভবে
কত জানি লোকে বৈদ্য, গজানন তুলাদ জন।
তাই বলি সাবধান, একদিন দিবে না প্রাণ
আরোগ্যকারী হোমে রবে, নিশ্চয়ই লালমোহন।

আহা কি গুণিলাম কি শুনিলাম, এমন জ্ঞান নাই, বেদ বেদান্তরে যেখানে যেখানে লালমোহন সরকার সর্বজ্বরগজনিহর বটিকার এত প্রশংসা। অবশ্য লোকে এ ঔষধের অনুকূল গুণ, জ্বরের ঔষধ জানিয়াই এত প্রশংসা, এত গুণগান করিতেছে, তুমি ও আমরাও এ শরীরেনাম্ব অমর অমর হইয়া থাকি। কোন্ দ্বারা লোকের যে কত উপকার হইবে, তুমি যে কত লোকের কত ঔষধাদি প্রদান করিয়া সংসারে লোকদিগকে রোগমুক্ত ও সুস্থ করিবে তাহা বলা যায় না। কবে যে লোকে তোমায় নিন্দা করে, হিংসে করে, তোমার ক্ষতি করিতে চায়ে বুঝিতে পারি না। বোধ হয়, তাহারা লোভ দ্বেষ, হিংসা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়া আসিবে।

শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ, প্রত্যেক জেলার লোকের সহিত ইহাদের কত পরিচয় হইতে লাগিল, তাহারা সকলেই লালমোহন বাবু! লালমোহনবাবু! সর্বজ্বর গজনিহর! এই আলাপ ভিন্ন কিছুই আলাপ করিতে চাহে না। যেন কৃষ্ণজয়ের তাহাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। লালমোহন বাবুকে দেখিবার জন্য সকলেই উৎসুক।

যাত্রিকগণ জয়ে শীতাকুণ্ডের পরিচয় চন্দ্রনাথ তীর্থে উপস্থিত। একণে তাহারা প্রবল কলিযুগে কলিতে প্রায় হইতে প্রস্থানস্থলে আসিয়েছিল। সেই দুর্দিন কলপ্রভাব দেখে, একটী লোককেও পীড়িত কি অসুস্থ দেখা হইল না। সকলে চমৎকৃত, হাসিল, এ দেশ কি অমরধাম, রোগ শোক নাই। দেখে জানিতে পারিল, এ দেশে এমন কি ৪৫।৫০ বৎসর হইতে আক্রমণের, কেহুন পর্যন্ত লোক প্রায় নীরোগ। এ সকল স্থানে পূর্বে জ্বর, কোল-পীড়ার, দক্ষ লোকের ভয় প্রবলরূপে ছিল। এখন নাই বলিলেও হয়, তাহারা বলিল, যে অবধি ঢাকার বাবু লালমোহন সাহা সর্বজ্বর গজনিহর বটিকা, কলুপাচনাদি, সর্বরোগ ঔষধালয় খুলিয়াছে তাহার প্রচারে এ দেশ হইতে এই সকল রোগ-পিশাচ দূর হইয়া গিয়াছে। তাহারা বলিল, আমাদের দেশে অতি আশ্চর্যের স্থান, কলপ্রাকৃতিক। এই সকল রোগের অধিকারও বেশি ছিল। একণে প্রত্যেকের গৃহে গৃহে লালমোহন বাবুর প্রচারিত এই সকল ঔষধ তাহার যে প্রতি ঘর রোগশূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

তখন যাত্রিকগণ বলিল, আহা! লালমোহন বাবুর তাহাদের দেশের লোক, আমাদের দেশেরই পৌরাণিক বলিয়ে হইবে। না জানি, কবে ঢাকায় যাইয়া লালমোহন বাবুকে এই সমাচার, এই দেশ দেশান্তরবাসীর কৃতজ্ঞতার কথা বলিতে পারিব।

শরীরেশ্বর ক্রমে চন্দ্রনাথ আশিনাথ দর্শন করিয়া আসামে আগমন সম্বাদ বহির হইল। তাহাদিগকে তথায় যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ লিখিবার লোকজন আসিতে হইয়াছিল। অবশ হয়, আষাঢ় মাসের প্রথমে তাহারা সিলেটে উপস্থিত আসিয়ে পৌঁছিবে। সেখান হইতে ৩ দিন সিলেটে থাকিতে হয়। সিলেটের বুকরী হইতে গোয়ালন্দগামীর প্রথমে তখন বারি বিস্তর হইবে। সে সময় গাছের পাতাটি নড়ে না, পাখিরা পাখা ঝাড়ে না, লোকের সাড়া শব্দ নাই। পৃথিবী নিস্তব্ধ নিস্পন্দ। যেন প্রীষ্মতাপে জড় জগতের সহিত একত্র নিদ্রা যাইতেছে।

গোয়ালন্দবন্দরের বাজারের ঘাটে। শত ২ নৌকা নঙ্গর করিয়া রহিয়াছে। ক্রমে নিশা প্রায় অবসান। পূর্ব একটি লোক যেন নিদ্রার ক্রোড় ত্যাগ করিয়া রক্তপূর্ণ নয়ন দুটী আলিয়ে বাহিরেছে। সেই সময়ে বাজারের কবোতারি তোলে এই সংগীতটী হইতেছিল।

রাগিণী বিভাস-তাল টেকা।

কত জ্বর দুনিয়ে আলো প্রতি সন্ধান,
অদ্বিতীয় দেহখানি, আয় যায় আছ প্রাণ।
কাল জ্বরে দেহখানি, পুড়িছে তবু না জানি
ভীম বীর্য বলে আছে, ওষাগত হয়ে পরাণ
দেখে আছ কেন পাছে, দেখ নাহি এ জগতে
এ রোগের চিকিৎসিতে, আছে ঔষধ অনুপান
লালমোহন শর্মনিধি, ঔষধে সাগর নদি
সর্বজ্বর গজনিহর, তুলেছে কবি যতন
সে মূল ঔষধ ফেলে, জ্বর শরীরের বৈরে
নতুন পরাণ নুতন, দেন নিয়ে কাল প্রাণ।

যে 'শান্তা জ্বর' একদিন অনুরের সঙ্গে শান্তিপাকিরাবে কলকাতায় প্রবেশ করেছিল—তার বয়সও তিনশ বছর পেরিয়ে গেছে। কলকাতার হালচালের মতো সুতোনুটি এবং এরা বয়সও তিনশের কলকাতায় রয়ে গেল। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত জ্বর হলে একটা অদ্ভুত পরম্পরা মেনে চলেছে, এরা বড়োলোকদের বেছে বেছে বেশি আক্রমণ। অথচ এদের কারণে গরিবরা বেশি নাজেহাল হয়েছিল, আর আজ দুটি বাড়ি বা বড়োলোক পাড়ায় মানুষদের বেশি পরোপকারী দেখছে। তাই সেকালের মতো একালেও বড়োলোকদেরই সচেতন করতে বলতে হচ্ছে, জ্বরের উৎসবে টিকে বা অন্যের জন্য জায়গা ছেড়ে রাখবেন না—পরিষ্কার করে দেখুন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রোগমুক্ত কলকাতাকে সত্তরের, আশির, উনিশশো, বিশের পরাধীন পাপ জ্বরে দিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দিল। মনে হয় আমরা অন্তত পাপের জ্বর দিয়ে একবিংশ শতাব্দীর কলকাতা উপহার দেওয়ার দায়—এটাও কম আনন্দের নয়।

উন্নয়নে রাজনীতি বাধা হলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না

—মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

'অলকাতা জল সরবরাহ প্রণালী পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নয়ন' প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

শহরে বসু নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার ও কলকাতা পৌরসভা যৌথভাবেই সচেষ্ট। তাই রাজনৈতিক বিতর্ক তুলে নাগরিক পরিষেবার উন্নয়নে কল্প করতে হবে। তাঁদের কাঁধ মিলিয়ে। রাজনীতি উন্নয়নের পথে বাধা হলে ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করবে না। শুক্রবার ২৪ নভেম্বর ইন্দো-ফ্রেঞ্চ প্রোটোকলের আওতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ফরাসি সরকারের সহযোগিতায় 'কলকাতা জল সরবরাহ প্রণালী পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নয়ন' প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এ কথা বলেন। তিনি বলেন, কলকাতা আমাদের প্রিয় মহানগরী। এই শহরের জন্য আমাদের ভালবাসা আছে। পাশাপাশি এই শহরের দুঃখ-বঞ্চনাকেও অনুভব করি। প্রায় ১ কোটি মানুষের এই শহরে আমাদের অবশ্য কর্তব্য পানীয় জল, আবর্জনা পরিষ্কার, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা। জলের সমস্যা আছে জানি, কিন্তু এটাও ঠিক নিধি, মুম্বাই, চেন্নাইয়ের চেয়ে অনেকটাই জল এই শহরের মানুষই পাচ্ছেন। তবু জলের ব্যবহারের মধ্যে কিছু গলদও আছে। ৩০ শতাংশ জল নষ্ট হয়ে যায়। পুরনো জলের পাইপ, পাইপের সঠিক ম্যাপিংও এতদিন ছিল না। তাড়াতাড়ি লক্ষ্যমাত্রা, এই অভাব এবং অপচয় রোধে ফরাসি সহযোগিতার এই পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হল।

প্রায় ৩৬ কোটি টাকার এই প্রকল্প থেকে যেভাবে টাপলেই কন্ট্রোলরুমে বসে জানা যাবে মাটির তলায় জলের পাইপের প্রেশার কেমন, কোথায় পাইপের লিকেজ, এমনকি প্রতিদিন প্রিয়ের নির্দিষ্ট আঞ্চলিক জলচিত্রও পুরো উঠবে। শুরুতে কাজ হচ্ছে ৬৩নং ওয়ার্ডে। ধীরে ধীরে ১ থেকে ১০০ নম্বর ওয়ার্ডে চালু হবে এই ব্যবস্থা। এই আধুনিক ব্যবস্থার নাম 'টেলিমেট্রি'।

মহানাগরিক তাঁর ভাষণে বলেন, কলকাতা শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা দীর্ঘদিনের পুরনো। শহরবাসীর প্রত্যেকের কাছে সমপরিমাণ জল পৌঁছানোর লক্ষ্যে জল সরবরাহ প্রণালীর পরিচালন ব্যবস্থায় উন্নতির প্রয়োজন। এই জন্য ইন্দো-ফ্রেঞ্চ প্রোটোকলের আওতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ফরাসি সরকারের সহযোগিতায় এই প্রকল্প গড়ে তোলা হচ্ছে। আমরা আশা করি, ফরাসি সরকার প্রযুক্তিবিদেরা আমাদের দেশের প্রযুক্তিবিদদের এই কাজে দক্ষ করে তুলতে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন। পানীয় জলের অপচয় বন্ধ হলে শুধুমাত্র জল সরবরাহের পরিমাণই বাড়বে তা নয় সঙ্গে সঙ্গে জল উৎপাদনের জন্য যে খরচ হয় তারও সাশ্রয় ঘটবে। কর্মীদের পরিকাঠামোকে উপযুক্তভাবে পরীক্ষা করে কিভাবে নাগরিকদের সুষ্ঠু জল সরবরাহ করা যায়, কিভাবে খরচ কম করা যায়—এই সব সমস্যাই এই প্রকল্পের ফলে সমাধান করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে, জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ শোভন চাটার্জি, পৌর মহাগুরু নেপালিস মেয়র ছাড়াও ফরাসি দূতাবাসের প্রতিনিধি জয়েস, ফরাসি সংস্থা সুয়েজ গ্রুপের চেয়ারম্যান ম্যাক্সেট প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেন।

অনুষ্ঠানে সকল মেয়র পারিষদ, চেয়ারম্যান, পাশক ও বিরোধীপক্ষের পৌর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

পৌরসভা সংবাদ

প্রয়াত প্রশান্ত দাশগুপ্ত

গত ৩০ অক্টোবর কলিকাতা পৌরসংস্থার প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রশান্ত দাশগুপ্ত প্রয়াত হলেন। প্রবীণ এই রাজনীতিকের রাজনীতিতে হাতে খড়ি বিপ্লবী সূর্য সেন বা মাস্টারদার কাছে। পরবর্তীকালে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সংস্পর্শে এসে ফরওয়ার্ড ব্লক মনে যোগ

দেন এবং আমৃত্যু এই দলের সাথেই জনসেবা করে গেছেন। তদুপরি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রামেই নয় শ্রী দাশগুপ্ত ট্রেড আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।

১৯৮৫ সালে ১৯৮০ সালের আইন অনুযায়ী পৌরভোটের মাধ্যমে মেয়র পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ এবং পরবর্তীকালে ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ এই দশ বছর তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ এই পদে আসীন হয়ে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। অধিবেশন চলাকালীন সরকার ও বিরোধীপক্ষকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনে পৌরসভা ও নাগরিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি আলোচনার মাধ্যমে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতেন।

পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকী পালনের ক্ষেত্রেও তাঁর উদ্যোগ্যোগ্য ভূমিকা ছিল। প্রতিটি অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি ও মূল্যবান পরামর্শ লাভ করেছে পৌরসভা।

পৌরসভা ছাড়াও একাধিক শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে ছিলেন। যেমন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। নেতাজীনগর অঞ্চলের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, চট্টগ্রাম বিপ্লব তীর্থ ও মহাজাতি সদনের ট্রাস্টি সদস্য হিসেবেও তিনি সাফল্য রেখে গেছেন। প্রয়াত দাশগুপ্তের মৃত্যুসংবাদ পৌরভবনে জানা হলে মহানাগরিকের পক্ষে মরদেহে পুষ্পস্তবক দেন মেয়র পরিষদ মালা রায়। এ ছাড়াও অন্যান্য মেয়র পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রবীণ পৌর, প্রশাসন সমাধানের প্রমুখ মরদেহে মাল্য অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন বর্তমান চেয়ারম্যান অনিল মুখার্জি। পৌর কর্মচারীদের তিনিয়ন ইউনিয়নের পক্ষেও মরদেহে মাল্য অর্পণ করা হয়।

প্রয়াত পৌরপিতা অশোক বাগচী

কলিকাতা পৌরসভার ৭২নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর অশোক বাগচী ৩ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৮ বছর। তিনি তিন-তিনবার পৌরসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। তবানীপুর সহ সংলগ্ন অঞ্চলে তিনি 'বাবীদা' হিসেবে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। পেশায় শিক্ষক অশোকবাবু স্পষ্টবক্তা ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবন থেকেই কংগ্রেসী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

জনপ্রিয় পৌরপিতাকে মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন স্তরের মানুষজন শ্রদ্ধা নিবেদনে উপস্থিত হন।

অনুষ্ঠানসূচি অনুযায়ী সকাল ৯টায় পৌরভবনে জমা হলে মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, উপ-মহানাগরিক ঈশানেশ্বরী পুরোহিত, সভাধিপতি শোভন চট্টোপাধ্যায় ও চেয়ারম্যান ইন-ইন মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন চেয়ারম্যান পূর্ণেন্দু সেনগুপ্ত, বিরোধীদলের নেতা সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি, নীলা, সৈয়দ নজরুল, বিনয়েন্দু বিশ্বাস, দিলীপ মুখার্জি প্রমুখ তাঁর মরদেহে মাল্যভূষিত করে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সমস্ত পৌর অফিসগুলিতে ছুটি ঘোষণা করা হয়।

নলকূপ উদ্বোধন

গত ২৭ তারিখ চাকুরিয়া স্টেশন রোড-এ এক গভীর নলকূপের উদ্বোধন করলেন মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে মেয়র ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জলবিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ শোভন চট্টোপাধ্যায় ও ১০ নম্বর বরো-র চেয়ারম্যান অরূপ বিশ্বাস। নলকূপটি চালু হওয়ার ফলে ৯২ নং ওয়ার্ডের পানীয় জলের সংযোগের অভাবে অনেকটা মিটে যাবে বলে আশা করা যায়।

ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান

স্বাস্থ্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ জয়ন্তী ঘন জনবসতিপূর্ণ কলকাতা পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত পাঁচ ৫০০০ ঘরো পুকুর ও জলাশয় অনুসন্ধান পরিচালনার ভার দেওয়া হবে বিভিন্ন সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠানকে। ১৪১টি ওয়ার্ডের মধ্যে প্রায় ৩০০০-এর মতো জলাশয়ের শতকরা ৪০ ভাগ অনুসন্ধান-এ পূর্ণ। অনুসন্ধান কলকাতা শহরে পুকুরের সংখ্যা ২৪৫টি। এর মধ্যে ঢাকুরী মহল্লার মহাবীর ক্লেত্রার, নীলরতন সরকার হাসপাতাল, এস এস কে-এম হাসপাতাল, এশিয়াটিক সোসাইটি, ভারতমাতা, বিড়লা মেমোরিয়াল প্রভৃতি স্থানের পুকুরগুলিকে ক্রমান্বয়ে পরিষ্কার করা হবে।

প্রাথমিক বৃটি ব্লাডসেল টিকিৎসাকেন্দ্র ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকা বিশেষ করে টেরেটা, টালিগঞ্জ, বেলেঘাটা ও তপসিয়া এলাকায় প্রতি পাঁচ বাড়ি অন্তর রক্ত পরীক্ষা করবে। এজন্য জনসন মেয়র পরিষদ।

ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান

ম্যালেরিয়ার বিশ্বব্যাপী মহামারীকে অবহিত করতে কলকাতা পৌরসংস্থা স্বাস্থ্য বিভাগ ১৭ নভেম্বর এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। মেয়র অরোরাতে ছিল ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত প্রচারপত্র ও আলেট। শ্যামবাজারের পাঁচমাথা মোড় থেকে শুরু করে মিছিল শেষ হয় মহানাগরিকের ৮৭ নম্বর ওয়ার্ডে। ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করার এই অভিনব প্রয়াস লোকের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে। পৌরসভার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই মিছিলে উপ-মহানাগরিক ঈশানেশ্বরী পুরোহিত ও স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পরিষদ জয়ন্তী ঘন ছাড়াও বহু পৌর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

পৌর প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধনে ঈশানেশ্বরী অনুষ্ঠানে ভাষণরত মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

পৌর প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পৌর অধিবেশনে পৌর প্রতিনিধিদের ভাষণপদ্ধতি কেমন হওয়া উচিত তা শেখানোর জন্য পৌর কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রিয় পৌরভবনে ২১ নভেম্বর এক কর্মশালার আয়োজন করে। প্রশিক্ষক ছিলেন পৌরসভার প্রাক্তন প্রশাসক প্রবনারায়ণ ব্যানার্জি। বিরোধীপক্ষের প্রতিনিধিরা এই কর্মশালা বয়কট করেছেন। কর্মশালার শুরুতে ভাষণ দেন চেয়ারম্যান অনিল মুখার্জি। ভাষণের অনুলেখন মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

দেশবন্ধু স্মরণ অনুষ্ঠানে দেশবন্ধুর মর্মরমূর্তিতে মাল্যদান করছেন মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, পাশে ...মোহন মুখোপাধ্যায় ও টিম মহানাগরিক শ্রীমতী শুক্লা মুখার্জি প্রমুখ।

দেশবন্ধু স্মরণ

গত ৪ নভেম্বর কেওড়াতলা মহাশ্মশানে কলকাতার প্রথম মেয়র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের জন্মদিবস পালন করা হয়। এদিন সকালে পৌরসভা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, চেয়ারম্যান অনিল মুখার্জি এবং মেয়র পরিষদ সদস্যা মালা রায় দেশবন্ধুর মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য দেন।

অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত ভাষণে মহানাগরিক বলেন, দেশবন্ধুর স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান প্রশ্নাতীত। মেয়র হিসেবেও তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। বর্তমান দিনে সকলকে দেশবন্ধু-র আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে মহানাগরিক আহ্বান জানান।

চেয়ারম্যান অনিল মুখার্জি তাঁর ভাষণে বলেন দেশবন্ধু ছিলেন স্বাধীনতেতা মানুষ। কখনই কোনও আপস করেননি। দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে তিনি নানা পথে আন্দোলন সংগ্রাম করেছেন তাই আজকের এই শুভদিনে তাঁকে স্মরণ করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

বিজয়া সম্মিলনী

গত ৪ নভেম্বর পৌর প্রতিনিধি কক্ষে এক মনোরম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন পৌর প্রধান অনিল মুখার্জি এবং প্রধান অতিথি মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন দলমত-নির্বিশেষে সবাই মিলে এই বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমাদের সংহতভাবনা ব্যক্ত হচ্ছে। প্রধান অতিথির ভাষণে মহানাগরিক বলেন, অতীতে এই ধরনের অনুষ্ঠান পৌরসভার পক্ষ থেকে করা হয়নি। নিজেদের মধ্যে পৌরভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিকতার প্রয়াসে এই বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এই অনুষ্ঠানে সব দলের পৌর প্রতিনিধিরাই অংশগ্রহণ করেন। কেউ গান গেয়েছেন, কেউ আবৃত্তি করেছেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পৌরকর্মী শান্তিলতা আনসারি। মেয়র পরিষদ সদস্যা মালা রায় ও ফরওয়ার্ড ব্লকের পৌর প্রতিনিধি অন্তরা মুখার্জির দৈত সংগীত বিশেষভাবে উপস্থিত সকলের মনোগ্রাহী ও আনন্দের বিষয় হয়ে ওঠে। শ্রীমতী বিভূতি মুখার্জি ও মঞ্জুশ্রী মজুমদারও সংগীত পরিবেশন করেন। আবৃত্তি শোনান সলিল চট্টোপাধ্যায় ও শ্যামাপদ রায়।

পৌর প্রতিনিধিদের সক্রিয় অংশগ্রহণে সমগ্র অনুষ্ঠানটি একটি নতুন মাত্রা লাভ করে।

সুরেন্দ্রনাথ স্মরণ

১০ নভেম্বর সুরেন্দ্রনাথ পার্কে প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূর্তির পাদদেশে এক ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হল তাঁর ১৪২তম জন্মদিবস।

এদিন সকালে প্রতিষ্ঠাতার মর্মরমূর্তিতে মাল্যদান করেন কলকাতা পৌরসেবার উপ-মহানাগরিক হিমাদ্রি পুরোহিত, ফ্রেডারেশন অমিল মুখার্জি এবং পার্কস অ্যান্ড গার্ডেনস দপ্তরের মেয়র পরিষদ হালদারসহ অন্য প্রাক্তন ফেডারেশন পুরোধা সেনগুপ্ত প্রমুখ।

বন্যাত্রাণে সাহায্য

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের হাতে কলকাতা পৌরসেবার মেয়র সুব্রত মুখার্জি মুখ্যমন্ত্রীর বন্যাত্রাণ তহবিলে ১৬ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন। গত ২৩ নভেম্বর মহাকরণে মহানাগরিক যখন যান তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন মেয়র পরিষদের সদস্যা মালা রায়। পৌরসভার প্রায় ৪৩ হাজার শ্রমিক, কর্মচারী, আধিকারিকের অক্টোবর মাসের বেতন থেকে ১ শতাংশ মহার্ঘভাতার টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়ার জন্য দান করেন।

কেন্দ্রিয় মানব উন্নয়ন মন্ত্রীর সঙ্গে মেয়র পারিষদের সাক্ষাৎ

শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পরিষদ অভিজিৎলালের সঙ্গে সঙ্গেই কিভাবে বিদ্যালয়গুলির হাল ফেরানো যায়, কিভাবে মান উন্নয়ন করা যায়, কি করে বেশি করে ছাত্র-ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় ইত্যাদি নিয়ে প্রতিনিয়তই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন। তিনি অতি সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রিয় মানব উন্নয়ন মন্ত্রী মুরলীমনোহর যোশীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি পৌরসংস্থার অধীন ৩০৮টি বিদ্যালয়ের অবস্থা সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করেন। তিনি কেন্দ্রিয় মন্ত্রীর কাছে ১০ কোটি ২০ লক্ষ টাকার অনুদানের জন্য একটি দাবিপত্র পেশ করেন। তার মধ্যে ৪০টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ক্লাসরুম তৈরির জন্য ২ কোটি, ৭০টি বিদ্যালয় পুনর্গঠনের জন্য ২ কোটি, বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য ৮০ লক্ষ, পানীয় জল-নিকাশী ব্যবস্থা তৈরির জন্য ১ কোটি, বিদ্যুৎ, আলো, পাখা ইত্যাদির জন্য ২০ লক্ষ, আসবাবপত্র যথা বেঞ্চি, চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাক বোর্ড ইত্যাদি কেনার জন্য ১ কোটি, বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের পোশাক ও ব্যাগ কেনার জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ এবং আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি কমপিউটার

সুরেন্দ্রনাথের জন্মদিনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন উপ-মহানাগরিক হিমাদ্রি পুরোহিত।

ফজলুল হকের প্রতিকৃতি উন্মোচন অনুষ্ঠানে মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়।

ইত্যাদি বাবদ্যতের জন্য ২ কোটি টাকা চাওয়া হয়েছে। কেন্দ্রিয় মন্ত্রী মেয়র পরিষদের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং মেয়র পরিষদ আশা রাখেন এই ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকার অতি শীঘ্রই তাঁদের সিদ্ধান্তের কথা জানাবেন।

আলোচনাচক্রে মেয়র পরিষদ

হাওড়াতে ১৪ ও ১৫ নভেম্বর 'টেকনোলজি কমিটি এবং টেকনোলজি স্ট্রাটেজি ২০০০' শীর্ষক দু-দিনব্যাপী এক আলোচনাচক্রে যোগ দিতে গিয়েছিলেন কলকাতা পৌরসভার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পরিষদ সদস্য আলা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন পৌরসভার কঠিন বর্জ্য পদার্থকে কীভাবে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যবহারযোগ্য করে পড়ে তোলা যায়— এটাই ছিল দু-দিনব্যাপী আলোচনাচক্রের অন্যতম বিষয়। প্রথম দিনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। সি আই আই, অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার, ফরাসি সরকার এবং ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের যৌথ প্রচেষ্টায় এই আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাচক্রে ফরাসি সরকারের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রথম দিনে ভারতের দুটি শহর তুতিকোরিন ও কলকাতায় কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়।

পৌর অধিবেশন কক্ষে ফজলুল হকের প্রতিকৃতি

গত ২৭ অক্টোবর এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ও কলকাতা পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র ফজলুল হকের একটি তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন কলকাতা পৌরসভার মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার উপস্থিত ছিলেন। এদিন ছিল ফজলুল হকের জন্মদিন। অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান অনিল মুখার্জি, উপ-মহানাগরিক শীলাদেবী পুরোহিত, অন্যান্য মেয়র পরিষদ সদস্য ও পৌরপিতা নির্মল ব্যানার্জি সমেত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে উদ্বোধনীতে উপস্থিত ছিলেন।

মহানাগরিকের উত্তরপাড়া-কোতরং পরিদর্শন

গত ৭ নভেম্বর মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় পরিকল্পনা উন্নয়ন ইওয়া ২০০০ বিভাগ মত সম্পত্তি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন। মহানাগরিক জানান পরপর একটিতে পলতা, অন্যটিতে উত্তরপাড়া। এই দুই জায়গায় ১৫০০০ কোটি টাকার মতো সম্পত্তি রয়েছে। এই দুই স্থানে সহজে পৌঁছানোর জন্য ৫০ লক্ষ টাকা দিয়ে একটি পাকা রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছে পৌরসভা। এ ছাড়া উত্তরপাড়া-কোতরং-এ অনাবাসী ভারতীয়রা নানা প্রস্তাব নিয়ে আসছেন। যৌথ উদ্যোগে ইন্ডিয়ানিয়ারিং, কেরলের আয়ুর্বেদশালার মতো আয়ুর্বেদ হাসপাতাল গড়া, 'ওল্ড এজ হোম' ইত্যাদি নানা প্রকল্প তৈরির প্রস্তাব আসছে বলে মহানাগরিক জানান।

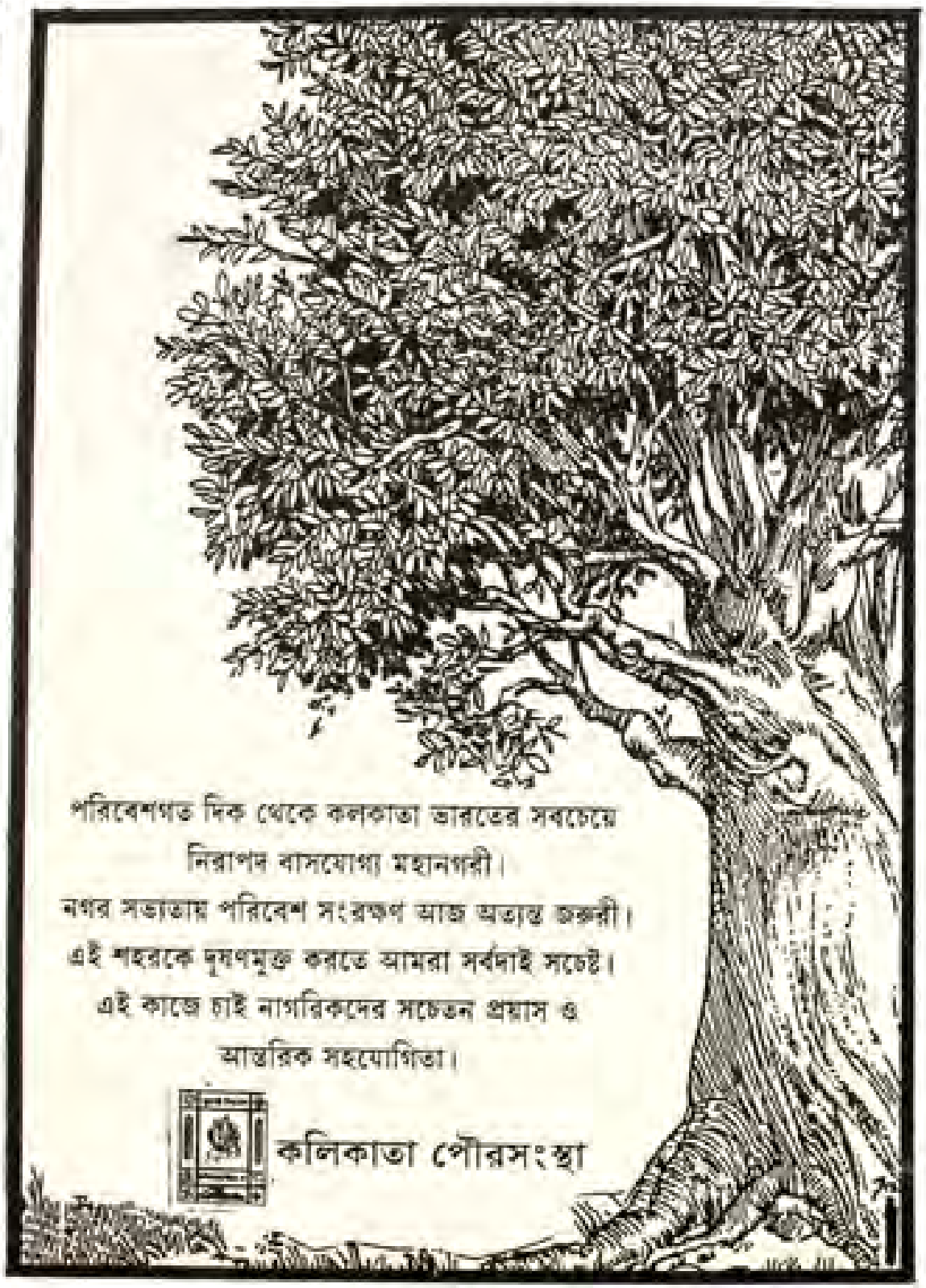
পরিবেশগত দিক থেকে কলকাতা ভারতের সবচেয়ে
নিরাপদ বাসযোগ্য মহানগরী।
নগর সভ্যতায় পরিবেশ সংরক্ষণ আজ অত্যন্ত জরুরী।
এই শহরকে দূষণমুক্ত করতে আমরা সর্বদাই সচেষ্ট।
এই কাজে চাই নাগরিকদের সচেতন প্রয়াস ও
আন্তরিক সহযোগিতা।
কলিকাতা পৌরসংস্থা

রুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে কলকাতা পৌরসংস্থা প্রকাশিত বই পড়ুন

ছোটদের জন্য

আমাদের শিবাজীদা

আমাদের সুভাষচন্দ্র

সাধারণের জন্য

মুক্তির সংগ্রাম ও কলকাতার দান

C. V. Raman Birth Centenary Issue

Anthology Number 1924-1947

Netaji Birthday Com. Vol. Cent. eve-tribute

C. M. Gazette-Netaji Centenary Issue

Calcutta-a set of Pictures

Calcutta at a Glance

কলকাতা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে তথ্যসমৃদ্ধ পুরশ্রী নিয়মিত পড়ুন

উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সারা বছর পাবেন।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

১, হল স্ট্রিট, হল বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০ ০৮৭

প্রাণ চাঞ্চল্যে মুখর
এক অনন্য শহর

কলিকাতা পৌরসংস্থা

কলকাতা দূরশ্রী

মেয়রের ত্রাণ তহবিলে
মুক্ত হস্তে দান করুন

মেয়রস রিলিফ ফাণ্ড
কলিকাতা পৌর সংস্থা
৫ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

কলকাতা পুরশ্রী

২৭ ডিসেম্বর, ২০০০

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু কলকাতা পৌরশভার অনেক আগে। তাঁর রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে এই লালবাড়ি থেকে। এখান থেকেই তিনি আস্তে আস্তে নায়ক ভারতবাসীর আপনার জন হয়ে উঠেছেন। তাঁর ১০৪তম জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত হচ্ছে ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দিবস—ত্রিপুরী কংগ্রেস.....পৃঃ ৫

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয় □ ২

বিজয়ের কণিক মুহূর্ত—ত্রিপুরী কংগ্রেস / পীযূষকান্তি রায় □ ৫

ডাকঘরপল্লী নিখরের কলকাতা আগমন ৫

ত্রিবিলাস (২য় পর্ব) □ ১৪

পৌরসভা সংবাদ □ ২০

বর্ষতলায় আলোচ্যালয়ের অবস্থিতি ● ৭২ নং ওয়ার্ডে নবনির্বাচিত পৌর প্রতিনিধি ● এ ডি সি-র জন মজুর ● মেয়রের ঢাকা অভিমুখে গমন ● পৌরপ্রধানের পাকদল অভ্যর্থনে ● বিধানসভার নেতার অভ্যর্থনা ● ২য় কলকাতায় কেমাটিনি বাড়ি ভাঙা হল ● পৌর আদায়ীকরণে অভিযোগ ● মাছ ব্যবসায়ীদের নতুন আইনেশ ● পঞ্চায় ১২টি ঘাট সংস্কার হবে ● ইতিহাস পাঠ ● কলকাতায় অনুষ্ঠিত সড়ক কনফ্রেন্স

ত্রিবিলাসপ্রেমীদের জন্মদিন এ বিশেষ আকর্ষণ নেওয়া হবে □ ২৩

সম্পাদক অবলেন্দু ভট্টাচার্য

সহযোগী অরুণকুমার রায় ও
আকাশ চৌধুরী

মূল্য ১ টাকা

প্রধান সম্পাদক অনুপ মিত্র

কলিকাতা পৌরসংস্থার আদেশ অনুযায়ী পুরশ্রী, বস্তু ও জনসংযোগ বিভাগ, ১ এস পি মিত্র, ৪র্থ তলা, কলকাতা-৭০০ ০০৭ হইতে অনুপ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং অনুপশ্রী কর্পোরেশন লিমিটেড কর্তৃক ১৮৯, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে মুদ্রিত

সম্পাদকীয়

আগামী মাসে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন। কলকাতা পৌরসভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল নিবিড়। পৌর প্রতিনিধি, মেয়র, অলডারম্যান, এমনকি চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার হিসেবেও তিনি পৌরসভায় কাজ করে গেছেন। প্রত্যেকবারই তাঁর জন্মদিনে পুরসভায় প্রকাশ করা হয় তাঁর জীবন সম্পর্কিত প্রবন্ধ বা আলোচনা। জানুয়ারি মাসের সংখ্যা বইমেলা সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে এ কারণে এই সংখ্যায় সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে লেখা আমাদের আগাম শ্রদ্ধার্ঘ্য।

অপর একটি প্রবন্ধ কলকাতার প্রতিবেশী সংক্রান্ত। এটি গত সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব।

এ ছাড়া পৌরসভার কাজকর্মের বিবরণ নিয়ে যথারীতি আছে পৌরসভা সংবাদ।

বিজয়ের কণ্টক মুকুট—ত্রিপুরী কংগ্রেস

পীযূষকান্তি রায়

১৯৩৯ সালের ইতিপূর্বে কংগ্রেসে সভাপতিত্ব পদে নির্বাচন ছিল গান্ধীজীর আশীর্বাদ ধন্য। ২৪-২-১৯৩৯ তারিখে সভাপতির আসনে উপবেশনের পরে সুভাষচন্দ্র ফরওয়ার্ডব্লকে গান্ধীজীর প্রতি তাঁর চিত্তের শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন ...all India fervently hopes and prays that Mahatma Gandhi may be spared to our nation for many, many years to come. India cannot afford to lose him and certainly at this hour. We need him to keep our people united. We need him to keep our struggle free from bitterness and hatred. We need him for the cause of humanity.... তবুও কংগ্রেস সভাপতির পদে প্রার্থী হওয়ার এক দুর্মূল্য দুর্ভাগ্যজনক বিষাদ উপস্থিত হলো, যার মধ্যমণি ছিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং।

১৯২০ সাল থেকে গান্ধীজীই ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি পদে নির্বাচনের প্রধান প্রস্তাবক। ১৯৩৯ সালের সভাপতি নির্বাচনের বিষয়ে ও ওয়ার্কিং কমিটির আয়োজন সম্বন্ধের সঙ্গে মতবদ্ধীতে, গান্ধীজীর আলোচনা হয়েছিল। তাঁদের সর্বসম্মত প্রার্থী ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। কিন্তু তিনি স্বাস্থ্যের কারণে অপারগতা হেতু প্রথম অনিচ্ছা প্রকাশ করলেন। পরে মত পরিবর্তন করে ১৪-১-৩৯ তারিখে প্রার্থী হওয়ার মত দিলেন। এই হেতুতে উপস্থিত ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, ভুলাভাই দেশাই, আচার্য কৃপালনী ও মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। কীভাবে কথা ছিল আজাদ কিন্তু প্রতিনিধি ডাঃ পট্টভি সীতারামাইয়ার মনোনয়নের প্রস্তাব উপস্থিতিতে। সুভাষচন্দ্রের নাম মনোনয়নে কথা প্রস্তাব করা হয়েছিল। ইহা ডেলিগেটদের মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সম্বন্ধিত বলেও বাদি বুঝান প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ালেন। পরে ২৮-১-৩৯ তারিখে আহ্বান থাকলে মৌলানা আজাদ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নিলেন। এ পরিস্থিতে ২১-১-১৯৩৯ তারিখে সুভাষচন্দ্র এক বক্তব্য জারি করলেন যার এক অংশে বললেন, Inview of the situation created by the withdrawal of Maulana Abul Kalam Azad and after reading the statement that he has issued, it is imperative for me to say something on the subject ...It is not for me to say in what capacity I should serve. That is a matter to be decided by my countrymen and in this particular case by my fellow delegates. But I have no right to decline to serve if and when I am ordered to a particular place...In view of the increasing international tension and the perspective fight over Federation, the new year will be a momentous one in our national history. Owing to this and other reasons, if my services in office are demanded by the majority of the delegates with what justification can I withdraw from the contest when the issue involved is not a personal one at all ? If, however, as a result of the appeal made by eminent leaders like Maulana Azad, the majority of the delegates vote against my election, I shall loyally abide by their verdict and shall continue to serve the congress and the country as an ordenary soldier. In view of all these considerations I am constrained to feel that I have no right to retire from the contest. I am therefore, placing myself unreservedly in the hands of my fellow delegates and shall abide by their decision. কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হিসেবে সর্বাধ বল্লভভাই প্যাটেল ও আরও অনেকজন সুভাষের প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে বক্তব্য জারি করায় সুভাষচন্দ্র ২৩-১-১৯৩৯ তারিখে এক বক্তব্য জারি করে বললেন ...Even at the late hour I am prepared to withdrew from the contest, if an anti-Federationist, for instance, like Acharya Narendra Dev, is accepted as the President for the coming year. ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য সর্বশ্রী বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, জামনালাল বৌজাজ, জে বি কৃপালনী, ডাঃ শৈলেন্দ্র নাথ বোস এবং ভুলাভাই দেশাই পরিস্থিতিতে পুনরায় প্রতিবন্ধকতা জারি করে ২৪-১-১৯৩৯ তারিখে বললেন ...In his statement Subhas Babu has mentioned his opposition to Federation. This is shared by all members of the Working Committee. It is the Congress Policy. He has also mentioned ideologies, policies and programmes. All this we feel, is not relevance to the consideration of the choice of Congress President. The Congress Policy and Programmes are not determined by its successive Presidents... The election as befits the dignity of this high office, has always been unanimous...we also

ask his colleagues to urge on Subhas Babu to reconsider his decision and allow Dr. Pattabhi Sitaramayya's election to be unanimous. সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ যাতে তিনি তাঁদের সভাপতির প্রত্যাহার করেন

...It is an extremely painful task for me to engage in a public controversy with some of my distinguished colleagues in the working committee but as matters stand, I have no option in the matter. It is news to me that there is a rule that same person should not be reelected president except under exceptional circumstances ...Since the adoption of the new constitution of the congress in 1934, the Working Committee is being nominated, theoretically at least, by the President...The position of the President today is no longer analogous to that of the chairman of the meeting. The President is like the Prime Minister or President of the United States of America who nominates his own cabinet. It is altogether wrong to liken the Congress President to constitutional monarch. এ প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করব, গান্ধীজীকে ঘিরে প্রতিপক্ষরা সুভাষকে ইতিমধ্যেই তাঁদের বিরোধী শিবিরভুক্ত মনে করতে শুরু করেছিলেন। তাই তাঁরা বলতে চাইলেন ...we also ask his colleagues when Gandhi and Subhas are both dear to us. অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র কিন্তু তাঁদেরকে তাঁর distinguished colleagues বলেই উল্লেখ করেছেন। ২৪-১-১৯৩৯ তারিখে কংগ্রেস কমিটির সকল সদস্য সমীপে সভাপতিই পাঠালি আবার এ বিষয়ে এক বক্তব্য আরি করে পূর্বাপর আলোচনাটির বৈধতাকে প্রথম টানে বললেন ...it was agreed that if perchance the Mahatma remained adament in his refusal, according to the constitution, Dr. Pattabhi was the only choice left, since we were clearly of the opinion that it was unnecessary to reelect Subhas Babu. In our opinion there never was any question of leftist or rightist. Let it be noted that Subhas Babu knows that the Procedure adopted for his own election last year was precisely the same as the one adopted now. এই তারিখেই সুভাষচন্দ্র ও সংবাদপত্রের বেতারভাষণ পরিবর্তনার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদে কংগ্রেসের পরিশ্রমপ্রতিনিধির নবম সাধারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন ...It is but natural that the leftists or the radical bloc in the congress should feel so strongly on the question of the Federation scheme and should desire to have genuine anti-Federationist in the Presidential Chair.

ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি পদের নির্বাচনের পূর্বে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রবীণপন্থী গান্ধীবাদী নেতৃবৃন্দ যে তীব্র বিরোধিতা প্রদর্শন করেছিলেন, তা থেকেই অনুমেয় নির্বাচনোত্তর কংগ্রেস অধিবেশন পর্ব তাঁর পক্ষে সুখকর হবে না। অবশেষে ২৯-১-১৯০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মহাত্মা গান্ধী ও প্রবীন শরীফের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৯৯ ভোটের ব্যবধানে (১৫৭৭ : ১৩৭৮) সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৫২তম সভাপতিপদে নির্বাচিত হলেন। নির্বাচনের ফল ঘোষিত হয়েছিল ৩০-১-৩৯ তারিখে। এই জয়লাভকে উপলক্ষ করে কংগ্রেসের ভেতরে তাঁর অবস্থিরোধ দেখা দিল এবং ওয়ার্কিং কমিটির গঠনমূলক পরিবেশের জন্য তিনি পুনরায় তাঁর ছলে বক্তব্য, মন্তব্য ও পত্রের চালাচালি গান্ধীজী সহ অন্যান্য প্রথম সারির কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের। ডাঃ সীতারামাইয়ার পরাজয়ে গান্ধীজী ৭-২-৩৯ তারিখে বললেন ...Sri Subhas Bose has achieved a decisive victory over his opponent, Dr. Pattavi Sitaramayya, must confess that from the very beginning I was decidedly against his re-election for reasons into which I need not go. Nevertheless, I am glad of his victory. And since I was instrumental in inducing Dr. Pattavi not to withdraw, the defeat is more than his. I am nothing if I do not represent definite Principles and Policy. Therefore, it is plain to me that the delegates do not approve of the principles and policy for which I stand. rejoice in the defeat. আবার কিছু বিবরণে ৪৯ ভোট সুভাষচন্দ্র বিজয়ে মহাত্মাজী তাঁর মনের ভাবনাকে কখনও মনে অভিব্যক্ত জানালেন ও বললেন After all Subhas Babu is not an enemy of his country. He has suffered for it. In his opinion his is the most forward and boldest policy and programme. The minority can only wish it all success. If they can not keep pace with it, they must come out of the congress. If they can, they will add strength to the majority. The minority may not abstract on any account. They must abstain when they cannot co-operate. (হরিজন পত্রিকা, ফেব্রুয়ারি) মহাত্মাজীর এমন মন্তব্য সুভাষকে বাধিত করে তুলল। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এক দীর্ঘ বক্তব্যে ৫-২-৩৯ তারিখে বললেন ...It grieves me to find that Mahatma Gandhi has taken it as a personal defeat. I would respectfully differ from him on this point...personally I am definitely of the opinion that there is neither reason nor justification for a split within the ranks of the congress. I, therefore, earnestly hope that there will be no occasion now or in future for the so-called majority party...In the extra-parliamentary sphere, we shall endeavour to rally all our strength

and resources for combating Federation and for pushing on towards PURNA SWARAJ. And we shall, of course, act in accordance with the Principles and policy of the Indian National Congress. I do not know what sort of opinion Mahatmaji has of myself. But whatever his view may be, it will always be my aim and object to try and win his confidence for the simple reason that it will be a tragic thing for me if I succeed in winning the confidence of other people but fail to win the confidence of Indian's greatest man.

সুভাষের অভিযোগের পর জহরের যে সংক্ষিপ্ত শেষ চিঠি আমরা এতক্ষণ দেখে ৯-২-৩৯ তারিখে আবার জওহরলাল নেহরু তাঁকে এক দীর্ঘ পত্র লিখলেন। পত্রের শুরুতে তাঁদের বুঝবার জন্যে শান্তিনিকেতনে হওয়া কোন আলোচনার প্রসঙ্গ টেনে সুভাষের সভাপতি পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুফল ও কুফল বিষয়ে লিখতে গিয়ে বললেন ...I recognise the good but apprehensive of the harm that will follow. দীর্ঘপত্রে অনেক অবান্তর কথা বলে সুভাষের বিরুদ্ধে একে একে অভিযোগ উত্থাপন করতে শুরু করলেন। ইতোপূর্বে থেকে তাঁকে লেখা পত্রের বিষয়ে উল্লেখ করে বললেন ...I discussed in great detail what our attitude to Federation should be and asked for directions. You sent me none, not even an acknowledgement. একটি মারাত্মক অভিযোগ এনে বললেন, The AICC office has deteriorated great during the past year. You have not even seen it and letters and telegrams to you are seldom answered with the result that many office matters get hung up indefinitely. Just as the movement when our organisation requires the closest attention, the headquarters functions ineffectively. তাঁদের অনেক অভিযোগ সম্পর্কে সমালোচনা বিষয়ে এবং ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে শেষে লিখলেন

We have got into an unhappy tangle and for the moment I see no obvious way out. I am prepared to try my best but the clarification and lead must come from you. আবার অনেক কথা শেষে বললেন So we come back to this, behind the political problem, there are Psychological problems, and these are always more difficult to handle. The only way to do so is perfect frankness with each other and I hope therefore, that all of us will be perfectly frank. I do not expect you to answer this letter immediately. It will take few days. But I would like you to send me an acknowledgement. পত্রখানিতে সার্বিকভাবে ইঙ্গিতে প্রকাশ অভিযোগ সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে।

৭-৩-৩৯ তারিখে ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশন বসার কথা। ইতিমধ্যে ১৪-২-৩৯ তারিখে সুভাষচন্দ্র সেবাগ্রামে মহাত্মাজীর সঙ্গলাভ ও মিলনি প্রয়াসের জন্য সিদ্ধান্তিলেন। এই আলোচনা করে ওয়ার্ধাতে ২২-২-৩৯ তারিখে ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠকে ত্রিপুরী অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়সূচি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। এ কারণে ২১-২-৩৯ তারিখে জহর বম্বেতেই প্যাটেলের নিকট নিম্নোক্ত টেলিগ্রাম পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে এক তারবার্তা পাঠালেন Kindly see my telegram to Mahatma. Regretfully feel Working Committee must be postponed till Congress. Please consult colleagues and wire opinion. এই দিনই বম্বেতেই প্যাটেলের নিকট দ্বিতীয় তারবার্তায় বললেন owing to my illness the meeting of the Congress Working Committee must be stopped. Please consult Colleagues and wire. তাঁর এ তার বার্তার বিষয়ে আরো বেশির ভাগ সদস্যরা। সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলেন। ইতোমধ্যে সরকার ও সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতাকে সন্দেহের চোখে দেখতে বিভিন্ন কাগজে তাঁর আক্রমণের সময়। অবশেষে মেডিক্যাল বুলিটিনের ফল হিসেবে ইংরেজের গোয়েন্দা বিভাগ কাল রিপোর্ট তা উল্লেখ করেছে। তাঁর শেষ আক্রমণের সময় ৪৯-১৯৪০ তারিখে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেছিল তা ছিল : It is very reliably reported that Subhas Bose, since his detention in jail, has lost 17 pounds in weights. He recently demanded to be given glucose injections. The jail doctor did not consider these necessary and was not prepared to accept the responsibility of giving them. Subhas Bose accordingly obtained the services of his brother, Sunil Bose, who gave him an injection on 22nd August. Since then, Subhas Bose has been running temperature. It is suggested that this temperature is due to the injection, possibly given as an over dose, but it is equally possible that it is being done deliberately to make out a case for Subhas Bose's release on medical grounds. The loss of weight seems very likely to be due to injection as a result of over-eating with too little exercise. কাগজে লেখা কে. এম. মুন্সী ও এ. কে. আজাদকে সুভাষের এক সময়ের অসুস্থতার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে তাঁর Advent of Freedom গ্রন্থে। পরিশেষে দুটি তারবার্তায় সুভাষচন্দ্রের অসুস্থতা বিষয়ে সন্দিহান হয়ে এই দিনই বম্বেতে যান নেহরু, তারবার্তা করে—এক পত্রে দৌত্যকার্যে ওয়ার্কিং কমিটির সাক্ষাৎকার সম্পর্কে তাঁর নিকট সমালোচনা থেকে উদ্ভূত অনেক কথা

প্রেরণা জোগাবেন। পত্রের শুরুতে লেখা হলো we were all deeply pained to hear of your illness. It was not to be thought that you should come to Wardah at the risk of your health. We hope that you will be soon restored to complete health. পত্রে আরও অনেক সংবাদই দেবে তারপর পরবর্তীদের কথা ঘোষণা করে বললেন ...We feel (?) to choose your cabinet that represent your visuals. তাঁরা মন্ত্রীত্বের জন্যে ছিলেন আবুল কালাম আজাদ, সরোজিনী নাইডু, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভুলাভাই দেশাই, পট্টভি সীতারামাইয়া, শঙ্কর রাও দেব, হুমায়ুন কবীর, ডঃ বি. কৃষ্ণরাও, আব্দুল গফফর খান, যমুনালাল বাজাজ, অমৃতলাল শেঠ। জওহরলাল নেহরুর পরবর্তী অধিবেশন বসে প্রস্তাবিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে সুভাষ জানতে চাইলে জওহরলাল নেহরু ১-৩-৩৯ তারিখে তাঁকে জানান ...I do not want to complicate the situation further by formally resigning. under the existing circumstance committee can not function as it cannot raise even a quoram. এর পরই গান্ধীজী পুনরায় তাঁকে কার্যভার নিতে বলেন এবং শরৎচন্দ্রের প্রস্তাবানুযায়ী ও শাসনতন্ত্রীয় সংকট এক বিশেষজ্ঞের নিয়োগের জন্য। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরী অধিবেশনের প্রাক্কালে তিনি রাজকোটে আসবেন জানান এবং করলে দেশের মানুষের দৃষ্টি ত্রিপুরী অধিবেশন থেকে সরে গিয়ে গান্ধীজীর দিকে নিবদ্ধ হলো।

জানুয়ারীর শেষসপ্তাহে সুভাষ ত্রিপুরীতে কংগ্রেস অধিবেশনে যোগ দিতে যাত্রা করলেন। ৭-৩-৩৯ তারিখে এ. আই. সি. সি.'র অধিবেশন শুরু হলো। চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী ট্রেনযোগে বসিয়ে সুভাষকে অধিবেশন মঞ্চে নিয়ে আসা হলো। জাতীয় কংগ্রেসের সাধিবেশন স্বীকৃত না হলেও কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে সুভাষ শুরু এক প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। কংগ্রেসের অতীত ইতিহাসে এমন প্রস্তাব উত্থাপনের নজির ছিল না। প্রস্তাবের মূল বক্তব্য ছিল—বিশ্বে ওয়ার্কিং কমিটি এ আই সি সি'র পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করে এসেছে, আর নতুন ওয়ার্কিং কমিটি, কংগ্রেস সভাপতির, গান্ধীজীর পরামর্শ অনুযায়ী গঠন করা উচিত। নবনির্বাচিত সভাপতি মুসলমান, নরীবাদিনীন ও সংবিধান অস্বীকৃত এ প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমোদন করলেন। ১৯-৩-৩৯ তারিখে এলাহাবাদ অধিবেশনের উদ্বোধন হলো। অসুস্থতা বৃদ্ধি হেতু সুভাষ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন এবং শরৎ বসু কংগ্রেস সভাপতির সংক্ষিপ্ত ভাষণ পাঠ করলেন। সংক্ষিপ্ত ভাষণে ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের পদত্যাগ, গান্ধীজীর সাক্ষাৎকার অস্বীকার, আজাদ ভবনে এ অবস্থায় ছাত্র, কংগ্রেসের এলাহাবাদ হতোদ্যম ভুলাভাই ইত্যাদি ঘটার পর উপস্থিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের সুবর্ণ সুযোগটির বিষয়ে তিনি বলেন ...I do not see the rightest ground for pessimism. With congress in power in eight provinces, the strength and prestige of our national organisation have gone up...If we only sink our differences, pull our resources and pull our full weight in the national struggle, we can move our attack on British. Shall we have the political foresight to make most of our present favourable position or shall we miss this opportunity, which is a rare opportunity in the life time of a nation ? কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্ব এ হতাশাকে মানসিক বলে বর্ণনা করে এ দেশের মানুষের স্বদেশ প্রেমের উপর সর্বাধিক আস্থা জ্ঞাপনপূর্বক আরও বললেন ...Coming to home politics, in view of my ill health....I must give clear an unequivocal expression to what I have been feeling for sometime past, namely that, the time has come to us to raise the issue of Swaraj and submit our national demand to the British Government in the form of an ultimatum and give a certain time limit within this period or if an unsatisfactory reply is received, we should resort to such sanction we possess in order to enforce national demand. The sanctions that we possess today are mass civic disobedience or Satyagraha. And the British Government today are not in a position to face a major conflict like an All India Satyagraha for a long period. উপসংহারে প্রার্থনা জানালেন may the spirit of my teacher C. R. Das, of reverend Motilal Nehru and Mahatma Gandhi who is still with us to guide and assist our nation, help the congress out of the present tangle. বক্তৃতার আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা ছিল The so-called democratic powers, France and Great Britain have joined Italy and Germany in conspiring to eliminate Soviet Russia from European politics for the first ? দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে এম. এন. রায়ের একটি প্রস্তাবে বলা হলো সভাপতির অনুপস্থিতিতে তাঁর নির্বাচন নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তা আলোচনার নিরসনের জন্য এ. আই. সি. সি.র হাতে অর্পণ করা হোক। বিষয়টি নিয়ে সভায় তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হলো। জওহরলালও এ বিষয়ে তাঁর মতামত প্রকাশ করতে পারলেন না। এমন পরিস্থিতিতে আনে তাঁর প্রথম প্রস্তাবটি করে নিলেন। জাতীয় সংহতি শেষ কথাটি বলা হলো জয়প্রকাশ নারায়ণকে। তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাবে সুভাষচন্দ্রের 'চরমপত্র' হুন শেষ না। তৃতীয় দিনের অধিবেশনে (১১.৩.৩৯) পেথিক্সলরেন্স শুরু এক প্রস্তাব পেশ করলেন যাতে পরোক্ষভাবে নবনির্বাচিত সভাপতির উপর তাদের আস্থা নেই বলে বলা হলো ...The congress

declare its firm adherence to the fundamental policies of the congress which have governed its programme in the past twenty years under the guidance of Mahatma Gandhi and is definitely of the opinion that there should be no break in these policies. ...In view of the critical situation that may develop during the coming years and in view of the fact that Mahatma Gandhi alone can lead the congress and the country to victory during such a crisis, the congress regards it as imperative that the executive authority of the congress should command his implicit confidence and request the congress president to nominate the working committee for the ensuing year in accordance with the wishes of Gandhiji. ত্রিপুরা সংখ্যাধিক্যে এ প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। ত্রিপুরীর ঠিক অভিজ্ঞতা নিয়ে অনুচ্ছ সুভাষচন্দ্র ফিরে এলেন যা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। দেশের কাছে তিনি এসেছিলেন দেশনায়কের সেবার ব্রত গ্রহণ করে। তা করতে গিয়ে তাঁকে অন্তরের নির্দেশিত স্থির অন্বেষণের পথ বিসর্জন দিতে হয়েছিল। এত সব ঘটে যাওয়ার পরেও সুভাষ গান্ধীজীর সহায়তা লাভের জন্য সাড়াই রইলেন। অনুচ্ছ দেহে তিনি বাহু পরিবর্তন বা চিকিৎসার জন্য বিদেশের আবহাওয়ায় জিয়াগঞ্জাতে অবস্থান করতে শুরু করলেন। ত্রিপুরীর দুঃখজনক অভিজ্ঞতার পরেও সুভাষচন্দ্র ম্লান হয়ে গেলেন না। সাধারণ বিরোধ-বিদ্বেষতা কাটিয়ে উঠে তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য সচেষ্ট হলেন। ওয়ার্কিং কমিটি নতুন করে গঠন করা ছিল তাঁর সম্মুখে প্রধান কাজ। পন্থের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে মহাত্মাজীর সহায়তা ছাড়া তা করা এক অসম্ভব ব্যাপার। এ কাজ করতে তিনি পুনরায় অহি দিল্লীতেজনে মহাত্মাজীর শরণাপন্ন হলেন। এখান থেকে গান্ধীজীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট

১৯৪০ সালে ৪৩ অক্টোবর বেতিয়াহাটা ট্রেনিংস্থ বসু

নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সেবারেবি শুরু করলেন। ২৩-৩-৩৯ তারিখে জওহরলাল সুভাষকে তাঁরবার্তায় ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে শীঘ্র বাহুস্থ নিয়ে বসতে to solve the deal lock in the congress organisation. ২৮-৩-৩৯ তারিখে সুভাষ আবার জওহরলালকে এক পত্রে আরো বিস্তারে অবস্থানের পর উপসংহারে বললেন ...I have already asked you if you would consider it fair on the part of Sardar Patel to declare that my re-election would be harmful to the country's cause. You never said a word that he should withdrew such a remark thereby indirectly supporting his allegation. Now I would ask you what you think of Mahatmaji's remark to the effect that after all, I am not enemy of the country. Do you think that such a remark was justified? If so then did you put in a word on my behalf of Mahatmaji? এ থেকে প্রতীয়মান, মহাত্মাজী, সর্দার প্যাটেল বা অন্যান্য নেতাদের, তাঁর বিরুদ্ধপক্ষে নেওয়া বিবৃতি, তাঁকে কি পরিমাণে আঘাত করেছিল এবং সম্ভবত তিনি জওহরলাল নেহরুর নিকট আশা করেছিলেন বিষ্ণু মাত্র সহানুভূতি ও সিমপ্যাথিলাভ। ২৯-৩-৩৯ তারিখে সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে চিঠি লেখার পরে এক পত্রে লিখলেন ...I am temperamentally not a vindictive person and I do not nurse grievance. In a way I have the mentality of a boxer, that is, to shake hand, smilingly, when boxing bout is over and take the result in a sporting spirit. I take the part resolution as it has been passed by the congress. We must give effect to it. I myself allowed the resolution to be moved and discussed despite the ultravires clause in it. How can I go back on it? ...There are two alternatives before you (1) Either to accommodate our views with regard to composition of the new Working Committee or to insist on your views in their entirety. In the case of the latter, we may come to the parting of the ways. Fourthly, I am prepared to do all

that is humanly possible for me to expedite the formation of the new committee and AICC. But I am so sorry that it is not possible for me to come to Delhi now. Dr Sushil (Bose ?) has acted to you this morning on this point. I got your telegram yesterday. ঐ পত্রে উল্লেখ, গান্ধীজী সুভাষকে লিখেছিলেন তিনি সেদিনই বম্বে পত্র দ্বারা উপলিখিত প্রস্তাব সম্বন্ধে কর্মসমিতি গঠনটি মুলতুবি রাখতে প্রস্তাব করে বসলেন ...At Tripuri, the air was thick with the rumour that the revolution had your fullest support. উপলিখিতের ঐসব অনুচরদের আচরণে সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করে বসলেন বিপক্ষ দিনে আত্মরক্ষার্থে কেউ কেউ আপনার কাছেও সাহায্যার্থী হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা ব্যর্থমনোরথ হয়েছিলেন। I may tell you that great pressure is being brought to bear on me to resign. I am resisting because my resignation will mean a new phase in congress politics which I want to avoid till the last. ৪২-৪-৩৯ তারিখে সিঙ্গাপুরের থেকেই মহাত্মাজীকে এক দীর্ঘ পত্রে সুভাষ লিখলেন ...to make me feel thoroughly sick of the whole affair. I may say further that when I left Tripuri, I felt such a loathing and disgust for congress politics as I have not done for the last nineteen years. Thank God, I have got over the feeling now and have recovered my composure. আরও অনেক আলোচনার পর গান্ধীজীর সমর্থনেই হিসে দাবার ও আজাদ অনশনের বিষয়েও পত্র তুললেন. There are six hundred and odd states in India and among them Rajkot is a tiny one. It would not be an exaggeration to call the Rajkot struggle a flea bite. ২-৪-৩৯ তারিখে গান্ধীজী সুভাষকে তাঁর পূর্ব পত্রের জবাবও অপর একখানি তারবার্তায় পাঠালেন। তারবার্তায় গান্ধীজী তাঁর পছন্দ মতো কার্যকরি কমিটি গঠন করে আপনি প্রস্তুত ও তা এ আই সি সি'র নিকট পেশ করতে বললেন। If you secure majority, you should be enabled to carry out your policy unhampered. If you do not secure majority you should resign and invite AICC to elect a new president. একটি তারিখে দেয়া পত্রখানি ছিল তাঁর মনের কথা স্পষ্ট করে। তাতে তিনি লিখলেন

What is wrong is not the difference between us but loss of mutual respect and trust. This will be remedied by time which is the best healer. If there is real non-violence in us, there can be no civil war much less bitterness. Taking all things into consideration, I am of opinion that you should at once form your cabinet, formulate your programme definitely and put it before the forthcomingAICC. If the committee accepts the programme, all will be plain sailing and you should be enabled to prosecute it unhampered by the minority. If on the other hand your programme is not accepted, you should resign and let the committee choose its president. And you will be free to educate the country along your own line. I tender this advice irrespective of pandit Pant's resolution. তাঁর রাজকোটের আলোচনের বিষয়ে সুভাষের সমবেদনায় উত্তরে বললেন ...I am glad you have mentioned the little Rajkot affair. I feel that it has great national importance. বিষয়টি নিয়ে তিন ভাগিন গান্ধী মহিন গিয়াস-এর কথাগুলোর বলছেন মত প্রকাশ করলেন। অবশেষে লিখলেন Though we have discussed the sharp differences of opinion between us, I am quite sure that our private relations will not suffer in the least. শেষ কথায়ে লিখলেন I do not think that after the clear expression of our views, a meeting between us is necessary. But if you still think otherwise, please wire. ৯-৪-৩৯ তারিখে সুভাষ ও কওহরলাল নেহরুকে যে পত্র লিখেছিলেন, তার উত্তরে ৫-৪-৩৯ তারিখে এক অতি দীর্ঘ উত্তরে তিনি নানা বিষয়ের মধ্যে করে অবশেষে কমিটি গঠনের বিষয়ে লিখলেন ...Gandhiji further told us that the impression he had gathered from your visit to him was that you were not keen on having his co-operation although you had asked him rather casually for it. It seems you were thinking in terms of forming a working committee of various persons whom you had already considered (and perhaps promised) for this purpose. You were of course perfectly entitled to do so but all this indicated that you were thinking in terms other than those of co-operation with Gandhiji and his group. সুভাষের সভাপতির পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়ে বললেন I was against your standing for election for two major reasons: its meant under the circumstance a break with Gandhiji and I did not want this to take place. It would mean also, I thought, a set back for the real left. The left was not strong enough to shoulder the burden by itself. I thought it probable that you would win the election as against Pattabhi, but I doubted very much whether you could carry the congress with you in a clear contest with what is called Gandhism. বল্লভভাই প্যাটেলের বক্তব্য বিষয়ে লিখলেন Ballabhbhai's phrase that your election could be harmful to the country, cause was used in a private telegram to Sarat, অর্থাৎ, বুদ্ধিমান শিল্পীর মতো তিনি বল্লভভাই-এর শব্দ নিয়েই সমালোচনা করিলেন। শরৎ প্রসঙ্গে বিষয়ে বললেন

You ask me for my interpretation of Pant's resolution. I do not think it was a matter of no-confidence but it was certainly one which indicated a want of full confidence in your judgement. Positively it is a vote of confidence in Gandhiji. ইতিপূর্বে ২৯-৩-২৯ তারিখে সুভাষ গান্ধীজীর নিকট এক পত্রে ত্রিপুরীর ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে নানা বিষয়ে তাঁর অভিমতের ও সহায়তা প্রার্থনা করেছিলেন। তার পূর্বেই তাকে পাঠানো সুভাষকে লেখা এক পত্রে গান্ধীজী বললেন ...I take the resolution for the first time in Allahabad. It (Pant Resolution) seems to be quite clear. The initiative lies with you. I do not know how far you are fit in attend to the national work. If you are not, I think you should adopt the constitutional course open to you. অর্থাৎ ভিন্ন মতামতের কারণে পদত্যাগের প্রস্তাব। পূর্বোক্ত গান্ধীজীর লেখা ২৯-৩-২৯ তারিখের পত্রে সুভাষ এ প্রস্তাবের যথার্থতা উল্লেখ করেছিলেন।

নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি ও সুভাষচন্দ্র এবং মহাত্মাজীর মধ্যে এসব পত্র চালাচালি নিয়ে ঐ সময়ের সংবাদপত্রগুলিতে নানা কথা প্রকাশ হচ্ছিল। তার উল্লিখিত পত্রে এক জায়গায় যখন তিনি সুভাষকে লিখলেন Newspaper correspondents asking all kinds questions about our correspondence. Have referred them all to you. I have disclosed nothing to anyone except colleagues and co-workers. গান্ধীজির অনুমতি ও অনুরোধের এ দুর্বিনীত চক্রান্তের এমন বিষম পরিস্থিতিতে সুভাষচন্দ্রের অবস্থা যে কোন অনুমেয় পাঠকই সহজে অনুমেয়। তা সত্ত্বেও ৬-৪-২৯ তারিখে সবিনয়ে জিজ্ঞাসাপত্রে তিনি মহাত্মাজীর ইচ্ছানুযায়ী একটি সম্পর্ক গড়ে তুলে সমস্যেতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাঁর নিকট পত্র লিখলেন। পত্রের ভাষায় I think it is a magnificent idea, and I am fully prepared to do my best in this matter regardless of what has happened in the past...personally, I feel that your influence and personality could achieve much in this endeavour to bring about unity. Will you not make one last supreme effort to bring everybody together before we give up all hope of unity? ওয়ার্কিং কমিটি গঠনের প্রসঙ্গে তিনি পত্রের এক জায়গায় বললেন You have not yet said anything as to the pant resolution. Do you approve of it? ...If till the last you insist that a composite cabinet is unworkable and homogeneous cabinet is the only alternative before us, and if you want me to form a cabinet of my choice, I would earnestly request you to give me your vote of confidence till the next congress ...Once again I would beg of you to let me know if your opposition to a composite cabinet is due to consideration of principle or is the fact that you should like the old guard to have a larger representation on the cabinet than I suggested in my first letter to you dt. 25th March. Before I close this letter, I shall refer to one or two personal things. You have remarked in one letter that you hope that whatever happens, "our private relations will not suffer. I cherish this hope with all my heart." May I say in this connection that I am the son of a gentleman and as such am a gentlemen. Deshbandhu Das often used to tell us, "life is larger than politics." ...In a letter you expressed the hope that in whatever I did, "I would be guided by God"—believe me, Mahatmaji, all these days I have been praying for only one thing, viz. for light to the path which would be best for my country and my country's freedom. সর্বশেষ প্রদত্ত ব্যক্তিগত চিঠী থেকে তাঁদের ব্যক্তিগত উপরে পুনর্বার মুখোমুখি হলে: ত্রিপুরীতে কংগ্রেসসভাপতি সুভাষচন্দ্রকে তাঁর বহু বন্ধুত্ব (যেমন: কবিগুরু) গভীর স্নেহ করতেন এমনটি প্রকাশ করতে ভুলতেন না। এমনকি তিনি পুনরায় কার্যকরী সভা গঠনের প্রস্তাবও করেছিলেন। যে প্রস্তাবটির তাৎপর্য কংগ্রেস কার্যকরী থেকে ছাড়া হলো। তিনি সুভাষের সহায়তায় এগিয়ে আসতে বলেছিলেন। ঠিক ২৩-৪-২৯ তারিখেই আবার প্রস্তাবটি থেকে তিনি সুভাষকে লিখলেন The gulf is too wide, suspicions too deep. I see no way of closing the ranks. I feel utterly incompetent to bring the warring elements together for joint work. Pt. Pant's resolution I can not interpret. The more I study, the more I dislike it ...you should therefore give it your own interpretation and act accordingly without the slightest hesitation. I can not, will not impose a cabinet on you. You must not have one imposed on you, nor can I guarantee approval by AICC of your cabinet and policy. It would amount to suppression. Let the members exercise their own judgement. If you do not get the vote, lead the opposition till you have convened the majority ...I breathe violence in the air. I see no atmosphere for non-violent action. Do you not see that we too honestly see the same thing differently and even draw opposite conclusions? How can we meet on the political platform? Let us agree to differ there and let us meet on the social, moral and municipal platform. I can not add the economic for we have discovered

our difference on that platform also. বইটির পত্রপত্রিকায় 'পদ্ম প্রস্তাব' ব্যাখ্যা করতে তিনি অনেক বলেছেন কিন্তু পূর্বে এক পত্রে স্পষ্ট ভাষাতেই বলেছিলেন ...It seems to be quite clear. আমরা স্মরণে রাখব তাঁর দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতিত্বকালে ত্রিপুরীর ভাষণে তিনি ইংরেজ সরকারের প্রতি চরমপত্র প্রদানের কথা বলেছিলেন, কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন নিয়োগতন্ত্রের প্রবক্তা, সমাজতন্ত্রপ্রবণে বিশ্বাসী। চরমপত্র প্রস্তাবের উল্লেখও ছিল কংগ্রেস সংবিধানের পরিশিষ্টে। ত্রিপুরায় পূর্বতন সংবিধানের ১নং পরিচ্ছেদে বলা হয়েছিল The object of the Indian national congress is the attainment by the people of India of Purna Swaraj (Complete Independence) by all legitimate and peaceful means. 'চরমপত্র' আইনানুগ শান্তিপূর্ণ পথ নয়। এসবই ছিল গান্ধীজীর চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। পত্রপত্রিকায় গান্ধীজী আরও বললেন My conviction is that working along our lines, in our own way, we shall serve the country better than by the different groups serving to work a common policy and common programme forged out of irreconcilable elements. অভিমতস্থলে তিনি লিখলেন Nobody put me up against you...you are wrong if you think that you have a single enemy among the old guard. লক্ষণীয়, গান্ধীজীর নিকট তাঁর সহায়তা প্রার্থনা করে সুভাষের সমস্ত বিবৃতিই প্রত্যাহৃত হওয়া উচিত ছিল। কার্যবিধেই তাঁকে নিজেকেই গঠন করতে হবে, যার অর্থ সুভাষচন্দ্রের নিকট স্পষ্টই ছিল — হা এ. আই. সি. সি. দ্বারা নাকচ হয়ে যাবে এবং তাঁর অপসারণ ও পলায়ন-কৃতাঞ্জলি পাবে। ১৪-৪-৩৯ তারিখে তিনি আবার রাজকোট গান্ধীজীর নিকট তারবার্তায় জানতে চাইলেন যে মাসের প্রথম সপ্তাহে এ. আই. সি. সি.র অধিবেশন ডাকা হলে তাঁর পক্ষে সুবিধাজনক হবে কিনা। যে মাসের প্রথম সপ্তাহে গান্ধী সেবা সংঘের সম্মেলন পূর্বেই নির্ধারিত হয়েছিল। এখানে গান্ধীজীর উপস্থিতি আবশ্যিক। তাই তারবার্তায় গান্ধীজী প্রস্তাব পাঠালেন ২৮-৪-৩৯ তারিখে এ. আই. সি. সি.র সভা ডাকতে, কথা দিলেন তিনি অধিবেশনে উপস্থিতি থাকতে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। একই দিনে (১৪-৪-৩৯) অপর এক তারবার্তায় গান্ধীজী সুভাষকে জানালেন Can add nothing helpful. Convinced best course rational interest for you is to form cabinet of your unfettered choice and for suitable programme সুভাষ এরই উত্তরে মহাত্মাজীর সাহায্য প্রার্থনা করে আর একখানি পত্র লিখে থাকবেন কিন্তু তিনি অবশ্য। তিনি কি সুভাষচন্দ্রের এমন অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করছিলেন যেখানে তাঁর মূর্তাগ্রহজনক পদত্যাগ নিশ্চিত করার কথা ? তিনি ১৭-৪-৩৯ তারিখে আবার তারবার্তায় সুভাষকে জানালেন ২৮-৪-৩৯ তারিখে এ. আই. সি. সি.র অধিবেশন ডেকে—অর্থাৎ তিনি তার পূর্বের দিনে হয়ে নবগঠিত ওয়ার্কিং কমিটীর বৈঠক। আরও বললেন Impossible for me impose committee on you. If you will form one let AICC decide. Composite cabinet seems to me impracticable. অসুস্থ সুভাষচন্দ্র বিপাকে হয়ে নির্বাচনোত্তর কংগ্রেসের এমন সংকটজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্তির জন্য গান্ধীজী ও জওহরলাল নেহরুর সাহায্য চাইছিলেন। তিনি ১৫-৪-৩৯ তারিখে জওহরলালকেও এক পত্র লিখলেন ১৭-৪-৩৯ তারিখে উত্তরে জওহরলাল জানালেন ...I am very much disturbed by developments and I do not quite see what should be done, or rather anything that I see is so out of harmony with what you suggest, or what Gandhiji suggests, that I am left high and dry জওহরলাল এর সংবেদনশীল হৃদয় এমন সংকট মুহূর্তে সুভাষের সাহায্যে এগিয়ে আসতে চাইছিলেন যদিও তাঁর দ্বিতীয়বারের নির্বাচনের বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। ২০-৪-৩৯ তারিখে এলাহাবাদ থেকে এক তারবার্তায় সুভাষকে জানালেন তিনি তারবেগে গান্ধীজীকে জানিয়েছেন ...Feel your guidance control

situation essential. Earnestly hope you will agree. Meanwhile trust you will not commit yourself by public statement. পত্র তো যায়ই এ সময়েই সুভাষচন্দ্র মহাত্মাজীকে লিখেছিলেন We have had a long correspondence during the last three weeks. This correspondence has not produced any tangible result so far as the formation of the working committee is concerned. পরে ওয়ার্ধিং কমিটির গঠনের অপরিহার্যতার বিষয় নয় দৃষ্টান্ত কলকাতি ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনার পর এবার লিখলেন I am looking forward eagerly and most hopefully to our meeting in or near Calcutta before AICC meeting এ আলোচনার জন্যও হিসেবে তিনি কংগ্রেসপুর অথবা অধিবেশন স্টেশনের প্রস্তাব দিলেন। তাঁদের এ আলোচনা আর হয়নি বলেই মনে হয়।

জওহরলাল নেহরু এ বিষয়ে সুভাষের হয়ে গান্ধীজীর নিকট নানাভাবে যুক্তি উপস্থাপন করেছিলেন। ওয়ার্ধিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে গান্ধীজীকে লিখলেন Subhas has numerous failings but he is susceptible to friendly approach. I am sure that if you make up your mind to do so, you could find a way out এঁর একজোট আচরণের প্রতি বিন্দিং আকর্ষণের ভাষণ দিয়ে লিখলেন I realise the importance of Rajkot but I think you will agree with me the larger Congress issue is indefinitely more important and is likely to govern all our activities. I think now as I thought in Delhi that you should accept Subhas as President. To try to push him out seems to me to be an exceedingly wrong step. সুভাষের composite cabinet এর পক্ষ নিয়ে লিখলেন As for the working committee, it is for you to decide. But I do not think that the idea of homogeneity, if narrowly interpreted, will not lead to peace or effective working. গান্ধীজীর মনের প্রতিফলন হলো না। সুভাষচন্দ্রের নিজ একটি মন্তব্য ছিল কংগ্রেসকর্মে নেতৃত্ব তাঁর অধিকারের বাইরে গেছে। ১১-৪-৩৯ তারিখে তিনি অধিবেশন স্থলেই এক পত্রে লিখেছিলেন Nobody has done more harm to me personally and to our cause in the crisis than Pandit Nehru.

গান্ধীজী এ. আই. সি. সি. সম্মেলনের জন্য কলকাতায় পৌঁছলে সুভাষচন্দ্র দুবার কালবিলম্ব না করে তাঁর সঙ্গে দেখা করে দীর্ঘ আলোচনায় বসলেন। নিশ্চয় হলো তাঁর প্রস্তাব, গান্ধীজী অন্তত মহাদেব তাঁর সিদ্ধান্তে। ওয়ার্ধি কমিটি গঠনে তিনি তাঁর সাহায্যের হাত বাড়াবেন না। এ. আই. সি. সি.র বৈঠকের ১১-৪-৩৯ তারিখে তিনি অনুপস্থিত রইলেন। তৎক্ষণিক, বহুকাঙ্ক্ষী পার্টিলেকেও তিনি এ অধিবেশনে যোগদান করা করেছিলেন। তাই তিনি কলকাতা এলেন না। সুভাষের পক্ষে একজনকে ইচ্ছেমতো ওয়ার্ধিং কমিটি গঠন করা সম্ভব হল না। ১১-৪-৩৯ তারিখে আবুর এ. আই. সি. সি.র অধিবেশনে ওয়ার্ধিং কমিটি গঠনের ব্যাপারে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র তাঁর বক্তব্যে বললেন I regret very much that since the Tripuri Congress I have not been able to announce the personnel of the new working committee. Mahatmaji's advice to me is that I should myself form a working committee. But this advice I cannot give effect to for several reasons. সে সঙ্গে ত্রিপুরীর কার্যবিধি রাষ্ট্রপতির দুর্বুদ্ধি প্রকাশ করার কথা তোলা করতে গিয়ে বললেন I have been deeply pondering as to what I should do to help the AICC in solving the Problem that is now placed before it. I feel that my presence as president at this juncture may possibly be a sort of obstacle or hardship in its path. For instance, the AICC may feel inclined to appoint a working committee in which I shall be misfit. I feel, further, that it may possibly be easier to settle the matter, if it can have a new president. After mature deliberation, therefore, I am placing my resignation into your hands. সুভাষচন্দ্র সহকর্মিনী নেহরুকে সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য অনুরোধ জানালেন। জওহরলাল নেহরু সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ প্রত্যাহার করার জন্য সভায় এক প্রস্তাব আনলেন। তা নিয়ে সভায় তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে এক অচলাবস্থার পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। পরিস্থিতির বিবেচনায় সুভাষচন্দ্রের পক্ষে পদত্যাগ প্রত্যাহার করে নেওয়া সম্ভব হলো না। সহকর্মিনী নেহরুর অনুপস্থিতে এ. আই. সি. সি.র সদস্যদের মতুন সভাপতি নির্বাচন করতে বলা হলে রাজেন্দ্রপ্রসাদ জাতীয় কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হলেন। পরের দিনের অন্তিম অধিবেশনে নতুন সভাপতি সুভাষচন্দ্র ওয়ার্ধিং কমিটিকেই পুনর্নিয়োগ করলে গান্ধীজী তা অনুমোদন জানালেন।

ঘুষি

ত্রিপুরী কংগ্রেসের চিরু অধিবেশন সুভাষচন্দ্রের প্রথমে কঠিন আঘাত হেনেছিল। তিনি রাজনীতির এমন কুটিল পরিবেশে অস্বস্তির হয়ে পড়েছিলেন। দেশের ভেতরে মানুষটির এমন নিবিড় ভালবাসার হৃদয় তাঁকে সর্বাধিক পীড়া দিয়েছিল। তাঁর অসুস্থতার কৃত্রিম বিশ্বয় অবহেলার পর পরিস্থিতি বলে তিনি অনুভূতির সুগভীর গোপনে এগিয়ে এসেছিলেন জীবন পণ করে, এইক জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে। তাঁর এ মানসিক যন্ত্রণার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত My strange illness শীর্ষক প্রবন্ধে। তাঁর অনুভূতি নিয়ে বিরোধী পক্ষের কুৎসিত প্রচারের বিষয়ে লিখলেন When I was lying in Calcutta after my return from Wardah on the 17th February, it

was widely propagated by interested people that my illness was a 'fake' and that my political fever was being utilised for avoiding meeting of the congress working committee on 22nd February. আসলে ১৮-২-৩৯ তারিখে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর ত্রিপুরীর পথে ১৯-২-৩৯ তারিখেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তা সত্ত্বেও কংগ্রেসের ইতিহাসে এমনটা আগে কখনো হয়নি যে কোনো সভাপতি তাঁর অসুস্থতার বিষয়ে মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে পাঠানো অন্যান্য তারে অসুস্থতা নিয়েই সুভাষচন্দ্র ত্রিপুরীর অভিমুখে ট্রেনে উঠে পড়েন। অন্ধ্রাখণ্ড পরিষদের ত্রিবিক্রমপুরম স্টেশনে এখানে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এক বোর্ড গঠন করা হলো। তাদের সমস্যা হলো—আই. কি আর মিডিক্যাল ইনস্টিটিউট, কি. দি. এবং বেরার, অবশ্যই বিধানের প্রধানদের নির্দেশক এবং জবলপুরের সিভিল সার্জন। তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বোর্ডের রিপোর্ট প্রকাশিত হলে অবশ্য অসুস্থতা বিষয়ে বিরুদ্ধ প্রচারের ইতি ঘটেছিল। মেডিক্যাল বোর্ডের অনুমতির জন্যে তিনি ট্রেনের অভিমুখেও ছোট দিতে পারলেন না। ত্রিপুরীর তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তাঁর মর্মযাতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় চেন্নাইয়ের একটিতে Owing to the morally sickening atmosphere of Tripuri, I left that place with such a loathing and disgust for politics I have never felt before during the last nineteen years. As I tossed in my bed at Jamadoba by day and by night, I began to ask myself again and again what would become of our public life when there was so much of pettiness and vindictiveness even in the highest circle. My thoughts naturally turned towards what was my first love in life—the eternal call of the Himalayas. If such was the consummation of our politics—I asked myself—why did I stray from what Aurobindo Ghosh would describe as "the life divine" Had the time now come for me to tear the veil of Maya and go back to fountain head of all love ? I spent days and nights of mental doubt and necessity. At times, the call of the Himalayas became insistent. I prayed for light in my dark mind. এমন অসহায় পরিস্থিতিতে অসুস্থ দেহে হরিপুরা সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগ স্বাভাবিক বোধ হলেও তাঁর মতো অভিযোদ্ধাচরিত্রের কাছে তেমন স্বাভাবিক হয়নি, যদি না তার অন্যান্যের নিকটি পরাজয় স্বীকার করা। নিজের পছন্দমতো ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে বিরুদ্ধবাদী প্রতিনিধিদের তাদের জানিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা, তা হয়ে তাঁর উপযুক্ত জবাব। তাঁর পক্ষে এই নৈতিক বিজয়। অবশ্য এমনও হতে পারে, দেশের সার্বিক স্বার্থে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তেমন পরিবর্তন না ঘটিয়ে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন নিজের মতো দেশ সেবার পথ খুঁজে নেওয়ার জন্য। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা, দলাদলি নয়, যা কংগ্রেসের ঐতিহ্যগত বৈশিষ্ট্য।

এ অভিজ্ঞতা থেকে সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করলেন কংগ্রেসে মুখোমুখি নতুনের সম্ভাবনাকে তেমন স্থান দেওয়ার তাঁর প্রত্যক্ষ আগ্রহের সিদ্ধান্তে অটল থেকে তাঁরা কল্পনার নতুন পথের খোঁজে। কিন্তু গান্ধীজীর সুভাষের প্রতি এমন অমনোযোগ বড় অদ্ভুত ঠেকে। এমন বিষয় বাস্তবকে পাশ কাটিয়ে ত্রিপুরী ব্রিটিশের নিকট চরমপত্র দেওয়ার প্রস্তাব বা সুভাষের শিল্পনীতি ও সমাজতন্ত্রের ভাবনা কাজ করেছিল বলে মনে হয় না। কে. এম. মুন্সীর বিবৃতিতে সুভাষের তথাকথিত ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করে অর্থহীন মনে হয়। তা নিয়ে গান্ধীজী বিশদভাবে কিছু বলেননি কিন্তু ২-২-৩৯ তারিখে দেওয়া সাক্ষাতে তিনি বলেছিলেন I was decidedly against his selection for reasons into which I need not go... তবে তা কি ছিল ? এমন বিষয় যা নিয়ে ত্রিপুরীতে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাননি ? কি সে মহান গোপন রহস্য যা নিয়ে তিনি এত অনড় ? এমন প্রশ্নের উত্তর অতি অল্পসংখ্যক বিশ্বস্ত সাংবাদিকের কিছু লেখা সুভাষচন্দ্রের সেই সকল অনন্য গান্ধীভক্ত ছোট ঈলার কাছে আলোচনার অথবা গান্ধীজীর নেতৃত্বের বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত মন্তব্য এবং বিশ্বস্ত বিবরণমূলক এক প্রবন্ধ (What Romain Rollan think) মঠান বিদ্যায় ১৯৪৪, সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। নুরুল এ বিষয়ে প্রবন্ধে লিখছেন ...We talked at length of Mahatma Gandhi and his tactics. I ventured to remark that the Mahatma would not take a definite stand on the economic issue. Whether on political or social or economic questions, he was, temperamentally a believer in the 'Golden Mean' I then referred to what the younger generation regarded as some of the defects in his leadership and tactics, namely his incorrigible habit of putting all his cards on the table, his opposition to the policy of social boycott or political appeasers, his hope of a change of heart on the part of the British Government etc. It did not afford us any satisfaction, I said, to oppose him or even criticize him—when he had done more for his country than any one else in recent history and had raised India considerably in the estimation of the whole world. But we loved our country more than any personality. আর সুভাষের মতো গান্ধীজী কি অকপটভাবে তাঁর সুভাষের প্রতি এমন ব্যবহারের কারণে ইতিহাসে জানিয়ে দিলেন—পুরাতন আবরণ খসেই কংগ্রেস ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আর কর্ণধার, রাষ্ট্রনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বা তাঁর পরে কেউ নয় ?

কলকাতা পুরশ্রী-র আগামী সংখ্যা

❀ বইমেলা সংখ্যা ❀

বহু বিশিষ্ট লেখকদের লেখাসমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি বিক্রয়সূচিতে থাকছে

পরিসংখ্যান-সহ বইমেলার ইতিহাস ● কলকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের চোখে বইমেলা ● বইমেলা ও কলেজ স্ট্রিট ● বইমেলা ও বাঙালি মধ্যবিত্ত ● বইমেলা ও লিটিল ম্যাগাজিন ● বাঙালির সারস্বত সাধনা-বই-বইমেলা প্রভৃতি নানা বিষয়

অসংখ্য আলোকচিত্র-সহ এই আকর্ষণীয় সংখ্যা প্রকাশিত হবে আসন্ন বইমেলায়

ভারতপন্থী শিখদের কলকাতা আগমন ও স্থিতিলাভ

পুরবীর নভেম্বর সংখ্যায় ভারতপন্থী শিখদের কলকাতা আগমন বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছিল। এবার ৯৯ পর্বে কলকাতায় স্থিতিলাভ প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

—সম্পাদক

একজন শিখ ইতিহাসবিদ বিশেষজ্ঞের অভিমত ইন্ডিয়ানের শিখ সম্প্রদায়ে অবস্থান সম্বন্ধে বলেছেন। অবশ্য তাঁর বক্তব্যের ভেতর নির্ভরযোগ্য সূত্র তিনি দিতে পারেননি। আমি কিন্তু প্রতিনিয়ত তাঁদের বক্তব্যের বিশ্লেষণ করছি। আমরা জানি রণজিৎ সিংহের নির্দেশে সমস্ত শিখরাই নামের পরে সিং পদবী লিখতে বাধ্য। শুধুমাত্র ছাড়া এটিও তাদের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। ইন্ডিয়ানের কলকাতায় অবস্থান, পাসপোর্ট সহ সৃষ্টি হওয়ার পর পরে এবং যে কারণে তিনি শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে ওঠেন এই পদবীটিও তাঁর পক্ষে ব্যবহার করা আবশ্যিক ছিল। তা কিন্তু জোরও দাবী করা যায় না। শুধু ভারতেই শিখ ধর্মে অবস্থানের লোকের নয়। সারা পৃথিবীর সর্বত্রই পুরুষের দেহধারীর জন্য হিসেবে অনেকে ধরেই রাখেন, তাদের সঙ্গে শিখ হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। তাই ইন্ডিয়ানের শিখ ধর্মে অবস্থানের বিষয়টি নিয়ে শুধু তাঁর বাড়ির উপর ভিত্তি করে কিছু বলা এক ঐতিহাসিক-বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত। যা শিখ বিশ্বের সম্পাদক এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হয়ে বলেছেন ইন্ডিয়ান আসল ছিলেন 'রবিদাস' সম্প্রদায়ভুক্ত একজন নিম্নবর্ণের, ইংরেজ কোম্পানীর শাসনের সময় ব্যবসায়ের সম্পর্কে তাদের কলকাতায় আগমন। ইন্ডিয়ান সম্বন্ধে এমন প্রসঙ্গে তাঁরা অপমান বোধ করেন।

কলকাতায় নানা বৃত্তিতে তারা বেশি সংখ্যায় আসতে শুরু করেন প্রথম মহাযুদ্ধের শুরুতে। একদিন তারা কলকাতার বৈশিক সংস্কৃতিতে প্রায় অঙ্গীভূত হয়ে যান। তাদের অনেকেই এখানে এসেছিলেন দক্ষ প্রতিরক্ষাকর্মে অথবা নানা স্ব-স্বাধীন ব্যবসায় বৃত্তিতে। তা ছাড়া তাঁর সৈনিকরূপে ইংরেজের সাহিত্যিকেও তাদের সুনাম ছিল। কলকাতার রাওড়া সেতু নির্মাণের সময় অতিরিক্ত পাহারাদার হিসাবে জেলা থেকে এসেছিল এক দল শিখ প্রহরী। তারা কলকাতার বন্দর সময়ে রাস্তার ধারের হিসেবে লাগিয়ে ইংরেজ মনিবদের তাক লাগিয়ে দিয়ে ছিলেন। কলকাতায় দারুণ করা যায় মোটর গাড়ির ব্যবসায় বিস্তারের ব্যাপারে অনেক পাঞ্জাবী নিযুক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই আসলে শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত। স্বাধীনতার পূর্বে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বিলাস ও শিল্পনগরীর অন্তর্বর্তী অঞ্চলসমূহকে সাধারণভাবে বলা হত পাঞ্জাব। এই অঞ্চল বর্তমানে পাকিস্তানে। দেশ বিভাজনের পর এই অঞ্চলের হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ ভারতবর্ষে চলে আসেন। তাদের অনেকেই কলকাতায় এসে মোটর গাড়ির যন্ত্রাংশের ব্যবসায় শুরু করেন। তারা সর্দার হরনাম সিং 'রবি'র অনারারি পদোন্নতীর উপলক্ষে ১৯৪৮ সিঃ থেকে প্রোপেন ধনশোধনের প্রচারী। তাদের কার্যালয় ৯ নম্বর লেন-এর বাড়িতে। এ প্রতিষ্ঠান সভ্যদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক উন্নতির জন্য সচেষ্ট।

অন্তত চল্লিশের দশকে বা তারও পরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত কলকাতার ট্রান্সপোর্টেশনের মধ্যে অনেক শিখ ধর্মাবলম্বীদের দেখা যেত। তারা এ কাজে কি করে এ মহানগরীতে নিযুক্ত হয়েছিল তার খোঁজ করতে গিয়ে পাওয়া গেল এক চমকপ্রদ ইতিহাস। সর্দার রাধবীর সিং 'ধীর' ছিলেন একজন চরমপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী। এ অপরাধে তাঁকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য পাঞ্জাব ছাড়তে হলো। তিনি এসে বসা বাঁধলেন কলকাতায়। তিনি এখানে মুক্তাঞ্চলের সহযোগী ছিলেন। তিনি ওই সময় পঞ্চাশটি ট্যাক্সি ক্রয় করে নিজের সম্প্রদায়ের চালক নিযুক্ত করে তাদের এ বৃত্তির সূচনা করলেন। তাঁর এক নিকট আত্মীয়, বর্তমানে বয়স প্রায় সত্তর বছর। আমাকে বললেন তাঁর স্ত্রী বালা বয়সে দেখেছেন ওই সব ট্যাক্সি চালকরা ভিনের শেষে মালিকের কাছে যখন সারাদিনের রোজগার জমা দিতে আসতেন তখন ছোট-বড় আঙ্কের মুদ্রার স্তূপ পড়ত টেবিলের উপর। তত্রমহিলা বলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী সর্দার রাধবীর সিং 'ধীরে'র কন্যা। শিখরা স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়। তাই এ কাজে তারা সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং শহরের মানুষ তাদেরকে নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসী রূপে গণ্য করত। আজ আর তেমন এ বৃত্তিতে তাদের প্রাধান্য নেই। কলকাতায় তারা হোটেল ও আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠানে বিশেষভাবে সাফল্য অর্জন করেছেন। তাদেরই একজন আজ সারা বিশ্বের হোটেল শিল্পে এক অতি প্রসিদ্ধ সম্মানিত মানুষ। তিনি হলেন ভাইকুন্তনাথ মোহন সিং ওবেরয়। কলকাতার ঐতিহ্যপূর্ণ পাঁচ তারা হোটেল, যা কলকাতার এক গর্বস্থল, গ্র্যান্ড ওবেরয় সহরের তিনিই মালিক।

হেলেস স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পাঞ্জাব ও পাঞ্জাবের এক বিশেষ স্থান। চরমপন্থী আন্দোলনের আদর্শে এ দু প্রদেশের মানুষ সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা করা

জাপানী জাহাজ 'কমাগাতামারু'তে চড়ে বহু শিখ যাত্রী, যাদের অনেকে পাকা পাটির মহাজন ছিলেন, গুরদিৎ সিং-এর নেতৃত্বে ১৯১৪ থেকে কানাডা অভিমুখে যাত্রা করে ভ্যাঙ্কুভারে অবতরণে ব্যর্থ হন এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের প্রতিরোধের কারণে হংকং ফিরে যেতে বাধ্য হন। মহাসাগরে অবস্থানরত অবস্থায় যাত্রা করে বজবজের অবতরণ করলে পোলে ইংরেজ পুলিশের কাছ পেয়ে সাংঘর্ষে অবতীর্ণ হন। তা ঘটেছিল ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এ সাংঘর্ষে চল্লিশজন শিখ প্রাণ হারান। এ ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিস্বরূপ আজও হাওড়ায় গঙ্গার ধারে চোখে পড়বে তাদের স্মরণকালে সেদিন বৃহত্তর জনসমাবেশ যেটি সম্ভব হয়েছিল তা বলাই বাহুল্য ছিল নেই। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তাতে কলকাতাও উত্তাল হয়। কলকাতার শিখরাও সে আন্দোলনে সক্রিয় হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়ভাবে গুরদ্বারের মোহন্ত বাবা গুরদিৎ সিং-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন যেসব ঘটনাস্থলে জন্য আন্দোলনের মতো শিখরাও সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। সাইমন কমিশন বর্জনের আন্দোলন এই বিদ্রোহীদের কাছাকাছি ও শিখ সম্প্রদায়কে খুব নিকটে আনতে সাহায্য করেছিল।

শিখ সম্প্রদায়ের জন্য গুরুমুখী ভাষায় বহু বছরেরও পূর্বে কলকাতায় প্রথম সৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশ করেছিলেন পূর্বোল্লিখিত ভাগবীর সিং 'নীর'। তিনি নিজেই তার সম্পাদক ছিলেন। এ কাজে তাঁর সহযোগী ছিলেন নিরঞ্জন সিং 'তালিব'। এ পত্রিকাখানির নাম 'খেল বর্ণধি', যা আজও চলে আসছে। এ পত্রিকার সংখ্যা ৮২৫, আয়তনের মুখার্জি রোডের বাড়িতে। এ পত্রিকার সঙ্গে বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ পাঞ্জাবী সাংবাদিক-লেখক যুক্ত রয়েছেন। গুরুমুখী ভাষায় প্রকাশিত আর একটি সৈনিক সংবাদপত্রের নাম নবীন প্রভাত। অবশ্য দু-একটি বাদে এ পত্রিকাখানি চলে আসছে। কলকাতার শিখদের সংবাদপত্র বা মেটোপলিটান পত্রিকার সম্পাদকও এক সময় ছিলেন শিখদের শিখ সাংবাদিক নিরঞ্জন সিং। শিখ ধর্ম এবং সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা ও তা প্রচারের উদ্দেশ্যে খুব শিখ টিবুন নামে তাদের একখানি ইংরেজি ত্রৈমাসিকপত্র কলকাতার জার্মানী মহাসদন থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এর বর্তমান সম্পাদক সর্দার শরণ সিং।

কলকাতার শিখরা প্রতিনিধিই এই শহরের ধনীয় মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ১৯৩৩ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিপন্ন মানুষদেরই বড়বাজার ও রাসবিহারী এভিনিউস্থিত গুরুদ্বারে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

শিখদের প্রার্থনা মন্দির হল গুরুদ্বার। দশম গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী গুরুগ্রন্থই তাদের পরমগুরু, তার পাঠ ও পূজন হয় গুরুদ্বারে। প্রার্থনা মন্দিরের পশ্চাদভাগে সুশোভিত উঁচাসনে প্রতিষ্ঠিত এ পবিত্র গুরুগ্রন্থ। তার সম্মুখে উপবিষ্ট থাকেন গ্রন্থী, যিনি পাঠ করেন এ গ্রন্থ। গ্রন্থের উপর চামর দোলানো হয় প্রার্থনা নিবেদন করে। গুরু নানকদেব জাতপাত তথা বর্ণবিভেদের বিরুদ্ধে কলকাতায় তাঁর আদর্শিক অবস্থানস্থলে জনসাধারণের মধ্যে কর্মতৎপরতা করেছেন। ওই সব ঐতিহাসিক ঘটনাস্থলের পরে উঠেছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ গুরুদ্বার। তার একটির অবস্থান মহাত্মা গান্ধী রোডের উপর রতনচন্দ্রে, যার বিস্তৃত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৯ সালে গুরু নানকদেবের জন্মের পঞ্চশতবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে এ গুরুদ্বারটি প্রসঙ্গে জগদীশ মুখোপাধ্যায় চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, There was a solitary Gurdwara which was on a rather dilapidated condition situated on Harrison Road as the Bara Sangat Gurdwara, which has now become one of the important centres of Sikh religion and culture in calcutta. তার বলার মধ্যে ফুটে উঠেছে বাঁচিয়ে রাখা গুরুদ্বার আজকের কলকাতার এক অতি গৌরবপূর্ণ ধর্ম মন্দির। ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি গুরুদ্বারের অবস্থান রয়েছে কলকাতার বাণিজ্যিক অঞ্চলে। এটি জরাজীর্ণ ইমারতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নির্বিকার ভাবে। এ গুরুদ্বারের নাম ছোট গুরুদ্বার শিখ সঙ্গত। মূর্তীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এর নামে উল্লেখ অবশ্যই তাঁর গ্রন্থেছে। কাশবাসি নামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে এই গুরুদ্বারের সঙ্গে যুক্ত এক শিখ ভদ্রলোক বললেন, এ অঞ্চলে ছিল আগুনের খাল অর্থাৎ বাগান—যেখানে গুরু গ্রন্থসাহেবের অবস্থান করে সঙ্গত যে ধর্মালোচনা করেছিলেন। তাই এটি ছিল গুরু কা বাগ। আর সঙ্গত অর্থ কীর্তন। তা হয়েছে আজও। আর শব্দটির এ অর্থ জোড়াসাঁকো জানা কারও জানা নয়। তাঁর মতে, ওই কারণের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরবর্তীকালে এক শিক্ষাকেন্দ্র। জমিদারের দেওয়া গুরুর কাপের চৌহদ্দিতে নাকি ওই শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে ওঠার পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয়েছিল মহাসঙ্কট, জমির মালিকানা নিয়ে। বাটীর দলকে এ নিয়ে তুমুলভাবে মামলায় নেমে গিয়েছিল, সাম্প্রদায়িক ব্যাপারও ছিলেন। গুরুদ্বার ছেড়ে উঠে যাবার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল, গুরুগ্রন্থের আসনটিও আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই থেকে আইন-কানুনের বিধিনিষেধের ফেরে গুরুদ্বারটি পড়িয়ে আছে বিবর্ণ অবস্থায়। জমিদারের দাম গুরুর বাগ বা জবরের ঈশ্বর শিক্ষাকেন্দ্রের ইতিহাসটি নিয়ে ঐতিহাসিক অবাটি বাড়াই করা অসম্ভব, তাই উপরের কথাই শোনা কথায় উপরই নির্ভর। এ গুরুদ্বারটির ঠিকানা ২৫ এবং ২৬ নম্বর বাগমারী রোড। গুরুদের স্মৃতিবিজড়িত গুরুদ্বারগুলি শিখপন্থের কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে। এই গুরুদ্বারটিও তেমনই যথোপযুক্ত। মানিকতলাতেও একটি গুরুদ্বার সঙ্গে আর নাম মানিকতলা শিখ সঙ্গত। তালতলীপুরের গুরুদ্বারের নাম 'সাচ্চা কুটিয়া'। কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের সন্নিকটে ২৩ নম্বর রাসবিহারী এভিনিউয়ের উপর গড়ে উঠেছে জগৎসুখায় নামে আরও একটি গুরুদ্বার। বর্তমান অবস্থায় এটির স্থাপনা সম্ভবত ১৯৩৬ সালে। অবশ্য প্রবেশ দ্বারের একখণ্ডলে দেওয়ালে এ সালটির উল্লেখ আছে। অধিন

কলকাতায় বসিলঙ্ক ঈর্ষার কারণেও আর একটি গুরুদ্বার আছে যার নাম পাওয়া শিখ সঙ্গত। উত্তর কলকাতায় ডালহৌসি স্কোয়ার মিনিট্রি আরও একটি গুরুদ্বার রয়েছে। নির্মীয়মান।

কলকাতার শিখ ও গুরুদ্বার নিয়ে যৌজখবর করতে গিয়ে কিছু নতুন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেল। পুরোদ্ভিত্তিতে গুরুদ্বারগুলিতে প্রধানত হলো পাঞ্জাবী শিখদের। পূর্ব ভারতের গুরুদ্বা পরিচালনা করেছেন। ফলে স্থানীয় লোকজনের আসতে শিখধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের। চাকরি বাকরি পাওয়ার গুরুদ্বারের সাথে বাঙালী শিখ আসেন। কলকাতায় আবশ্য জোর বাঙালী শিখের সন্ধান পাওয়া গেল না। তবুও শুরু অনেকদিন বা শুরু হরগোবিন্দজীদের কিছু বাঙালী শিষ্য শিষ্যাই ছিলেন। কলকাতায় হয়ে তারা লুপ্ত হয়ে গেছেন মুখোমুখি সঙ্গে। তবে আমরা একজন বললেন এখনও উপকণ্ঠার গুরুদ্বারে একজন বাঙালী শিখের সাক্ষাৎ করে থাকেন এবং তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে গুরুমুখী ভাষাও শিখেছেন। এখনও হয়ে পাবে অধিকাংশ মধ্যবিত্তের যা শিখ সম্প্রদায়ের কন্যা অবশ্য তাদেই প্রভাবে শিখধর্মের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। কিন্তু বিয়ারে স্থানীয় লোকেদের মধ্যে অনেকে শিখধর্ম গ্রহণ করেছিলেন শুরু হরগোবিন্দজীদের প্রভাবে। তাঁর বিয়ারে অবস্থানকালে একবার আগরায় গেলে এখান একজন ধনাঢ্য বনে একজন 'ব্রাহ্মিন' সম্প্রদায়ভুক্ত বিয়ারের অধিবাসী তাঁর সেবাকর্মে নিযুক্ত হবেন ও তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাদেরকে প্রভাবে এই সম্প্রদায়ের অনেকেই শিখধর্ম গ্রহণ করেন। আরও জানা যায় স্থানীয় সংখ্যালঘিষ্ঠ গুরুদ্বারের নাম হচ্ছে তাদেরকে শিখসমাজ। এটি কিন্তু ঐতিহাসিক হওয়া সত্ত্বেও গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটির অন্তর্ভুক্ত নয়। কলকাতায় ও বসিলা সম্প্রদায়ভুক্ত বিয়ারের স্থানীয় শিখরা বসিলঙ্ক বৃত্তিতে বসিলঙ্ক হয়ে বসবাস করে আসছেন। কলকাতার আজকের ক্যানিং স্ট্রিট অঞ্চলে আরা অনেকেই ব্যবসায় সূত্রে চিরস্থায়ীভাবে বসত গড়ে তুলে বা আশপাশের ব্যবসায়ে লাভবান হবেন আশাকরের পূর্বেই। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা উল্লেখ হয়। বড়বাজারস্থিত সরাসরাকরণ পার্কের মিষ্টি যে মালিক থেকে আজও বর্তমান রয়েছে—তাদেরই নাম ক্যানিং স্ট্রিট এবং তার দুপাশে তো সুতা ও তাপড় জাতীয় সম্ভারের বিক্রয়কেন্দ্র আজও ভুলাশন্ট্রি। এ ভুলাশন্ট্রি সুজানটি যা তার শেষ চিহ্নস্বরূপ আজও অত্যাধুনিক কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে আছে কিনা তা জানবার বিষয়। এ ক্যানিং স্ট্রিটের ১১২ নম্বর বাড়িতে অতি প্রাচীন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তবুও প্রতিষ্ঠিত গুরুদ্বার আর নামে গুরুদ্বার ছোট শিখ সমাজ। আমাদের গুরুদ্বার থেকে এ ঘনিষ্ঠতার ব্যাপারটিকে সম্পূর্ণ আলাদা। অবশ্যটির ব্যবস্থাপকদের অত্যন্ত্রসরতার তা অনধিকার ও অধিকারের শিকার। এ গুরুদ্বারকে পাঞ্জাবী শিখরা বিয়ারী গুরুদ্বার বলে অভিহিত করেন। দোতলায় মন্দির ও একতলায় রয়েছে শ্রী গুরু নানক বিদ্যালয়—যার ছাত্রসংখ্যা ছিলেন স্থানীয় শিখদের পাঠানোর জন্য ১৯৫৬ সালে। এটি সরকার স্বীকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়। এখানে গুরুমুখী ভাষাও শেখান হয়। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক—যিনি নিজেও একজন বিয়ারী শিখ—বললেন গুরুদ্বারটি স্থানীয় হলেও প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে স্থানীয় বিয়ারী রাজবংশী শিখদের উদ্যোগে। এরা নিজ নিজ বাটির ঝুঁড়েঘরে বাস করেছিলেন—এ ভবন নির্মাণের জন্য। দুঃস্থ পরিবারের এখন ছাত্রদের উপর গুরু উপর কারণেই গুরুদ্বারটি খুবই ছোট। এখন বিয়ারী গুরুদ্বার কলকাতায় আছে জানও খুবি। তার একটি কারণ নাবিকেলডাঙ্গা ডাকঘরের নিকটবর্তী স্থানে বাস গুরুদ্বার ঠিক কা নাম। অপরটির অবস্থান ৭ নম্বর বলরামদের স্ট্রিটের উপর তার নাম তারা নিজেরাই। বিয়ারী গুরুদ্বারগুলির প্রধান আয়ের নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এদের গুরুদ্বার পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ করা হয় অতি সমিতির অধীনে কিছু স্থায়ী সম্পত্তির আয় থেকে। বিয়ারী শিখরাও গুরুগোবিন্দ সিং নির্দেশিত পথের আনুষ্ঠানিক নিয়মাবলী পালন করে থাকেন। তাদের নামের শেষে অবশ্য বিয়ারী ঐতিহ্যের লক্ষণ বর্তমান—যেমন শুরু নানক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নাম মনোরঞ্জনসিং সিং। পূর্ব ভারতের অধিবাসী হওয়ার কারণে দৈহিক অবকাঠামোয় তারা পাঞ্জাব অঞ্চলের শিখদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আর্থিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রেও তারা পাঞ্জাবী শিখদের চেয়ে অনেক অগ্রসর। তারা সাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিযুক্ত—যেমন রেডিমেইড পোশাক ইত্যাদি। দুই সম্প্রদায়ের গুরুদ্বারে উপাসনা পদ্ধতিরও কিছিৎ পার্থক্য রয়েছে। বিয়ারী গুরুদ্বারে দীপারতি ও ঘণ্টাধ্বনির সমাবেশ পদ্ধতি লক্ষ করা যায়নি যা পাঞ্জাবী গুরুদ্বারে অনুপস্থিত। তাদের আখ্যায় বিয়ারী শিখ সম্প্রদায় সমাজবাদী সত্তা এবং পাঞ্জাবী শিখ সম্প্রদায় সিং সভার অন্তর্গত।

শিখ সম্প্রদায়ের সামাজিক বিন্যাস বিষয়ে কিছিৎ আলোচনা প্রাসঙ্গিক। গুরু নানকদেবের ভক্তি আন্দোলনের পরিবেশে ঈশ্বীয় ঘরে তা আরও অগ্রসারিত অবেহিলেন অন্ত অর্থাৎ উপাসনাগৃহরূপে ধর্মশালাগুলোর জাকনকে। গুরু নানক এক মহান ধর্মিনায়কদের ভূমিকায় ভূতলের সঙ্গে সীধু আছে ঘোষণা করেছিলেন : "আমি না হিন্দু, না মুসলমান, আমি মানুষ। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষবাষ্পে জর্জরিত ভারতবর্ষের যুগে" তাঁর এ ঘোষণা ছিল হিন্দু-মুসলমান সমন্বয় সাধনার এক মহৎবাণী। তাঁর্মুক্তাল আগের হিন্দু যুগের বর্ণবৈষম্যজনিত ক্রি-নিন্দু আচরণও তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী। এ প্রসঙ্গে মুকর্ণ ডাক্তার তাঁর Guru Nanak's Humanism প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন His followers were encouraged to eat in gather in the free Kitechen, to which they contributed their share for rations and service, in cooking and later, in scrubbing utencils. In this way he suggested a Path for the growth of individual, in and through the others and he insisted on this, because he wished to bring consciousness to the

highest and the lower, a kind of Primitive Communism, which was later to flower into the solidarity of the Sikh people. পরবর্তী সময়ে সিং-এ সিদ্ধান্তের এক বলিষ্ঠ ঐতিহ্যের পরিচয় সৃষ্টি করেছিলেন। তাদের মধ্যে ছুৎ-অছুৎ ভাবনা অবশ্যই নেই তার প্রমাণ গুরুদ্বার লাঙ্গর। কিন্তু প্রয়োজনেই হিন্দুসমাজের জন্মগত মূল সংস্কার এখনও শাসন করে চলেন তাদের বিবাহ ব্যবস্থায়।

পঞ্জাব কৃষিভিত্তিক দেশ। শস্য সম্পদের জন্য তাদের সমৃদ্ধজীবনের উৎসব। স্বাভাবিক, এ কারণে, তাদের প্রধান উৎসব যা হিন্দু ও শিখ উভয় সম্প্রদায়ে অনুষ্ঠিত পালন করেন। এই পুণ্য উৎসবের দিনেই গুরুগোবিন্দ সিং উপহার করেছিলেন খালসা সাহ। খালসাদের নিশানাও তা নিশান সাহেব-উল্লাসের মাধ্যমে পালন করে থাকেন। তা ছাড়াও গুরু নানক ও একই গুরু গোবিন্দ সিং-এর জন্মতিথি পরীর বিবাহ সাদে তারা পালন করে থাকেন। হিন্দু বিবাহের যেমন প্রতিফলন নেই তাদের বিবাহ ব্যবস্থায়। তবুও বিবাহে গুরুর আশীর্বাদ লাভের জন্য গুরুদুয়ারে চারবার গুরুগ্রন্থ সাহেব প্রদক্ষিণ করতে হয়। বিবাহের লগ্ন নির্ণয়ের জন্য কোন পুঁথি-পঞ্জিকা দেখার প্রয়োজন হয় না। যে কোন দিনই শুভদিন। নৃত্যগীত আনন্দের কোন নিষেধ নেই, তবের মধ্যে। তবে মৃতের আত্মার শান্তির জন্য 'ভোগ' অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে পাঠ করা হয় পবিত্র গুরুগ্রন্থ সাহেব। আদ্য প্রথের ছোলপৃথি, নানা শাখার বাহন ইত্যাদি মুসলমান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তবেই তাদের অনুকূল নানা মুসলমান শাখার পরিচয় কোন আরটী ধারণ করতে দেখা যাবে না এই মুহূর্তের জন্য।

কলকাতায় তাদের কিছু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে দীর্ঘকাল ধরে। ১৯৫৩ সালে সর্দার রামবীর সিং 'শীখ' এর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের শিখ কালচারাল সেন্টার। তাদের সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য শিখ স্টুডেন্টস ফেডারেশন আছে ১০টি কেন্দ্র। কলকাতায় তাদের দুটি বিদ্যালয়ও রয়েছে। একটি তালতলাপুরে খালসা স্কুল, অপরটি উত্তর কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রীটের নিকটে খালসা স্কুল।

সংখ্যা বলা যায়ে ১৯৭১ সালে কলকাতায় মোট শিখ জনসংখ্যা ছিল ৩০১। পূর্ববঙ্গের এক প্রত্যন্তবর্তী গ্রামে আদি ১৯৩১/১৯৪৯ সালে প্রথম একজন শিখের আগমন ঘটে করেছিলেন আমার বাল্যবন্ধুরা। তার হাতে ছিল কৃপাণ, কপালে ছিল ইস্পাতফলক। কেশ ছিলই ছিল। তাকলাধারী উঁচু-পাগ। ছেলেরা এ পুরুষটিকে ঘরে ঘরে দেখে খুব ভেবেই দেখেছিলাম। কলকাতায় তখন নিশ্চয়ই বেশ কিছু সংখ্যক শিখ ছাত্র অধ্যয়নরত ছিলেন। কলকাতায় তা ছাড়া উপকণ্ঠে শিল্পায়ন ও ব্যবসায় বাণিজ্য বিস্তার এবং দেশের অন্যান্যস্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য পঞ্জাব থেকে এ শহরে পঞ্জাববাসীদের আগমন বৃদ্ধি পেল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। আজ তারা কলকাতার সর্বশ্রেণীর প্রতিবেশী তাদের সংখ্যা মন্দ নয়। এদের মধ্যে তার দুজন হচ্ছেন শিখ সম্প্রদায়ভুক্ত।

কলকাতায় তাদের আগমন বৃদ্ধির মূলে শুধু শিখ ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে উৎসুকতা ও আগ্রহ নয় অনেকে বাঙালীদের নিকট তাদের আত্মীয়তা পেয়েছিলেন। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের ঐতিহ্য ইতিহাসখ্যাত ভট্টিমালবে 'পঞ্জাবেরিয়ান' একখানি ইংরেজি বই। আনন্দমোহন বসুর প্রথমদিকে পরিচালিত স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের সভাপতি যুগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে সভাতে যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মূলবক্তব্য ছিল On the Rise of Sikh power in the Punjab তার এক অংশে তিনি বলেছিলেন Guru Nanak Preached the great doctrine of Indian unity and endeavoured to knit together Hindus and Mussalmans under the banner of a Common faith. বহুবিখ্যাত সাহিত্যিক প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার ১৮৬৮-১৮৭১ পর্যন্ত পঞ্জাবে অবস্থান করেছিলেন এবং পঞ্জাবী ভাষা নিয়ে তাঁর বর্ণিত জীবনচরিতে শুরু নানক সম্বন্ধে তাঁদের উপর তিনি গুরু নানকের জীবনী রচনা করেছিলেন 'নানক প্রকাশ'। ১৮৯৯ সালে হিমাদ্রি বাসার্জি বাংলায় রচনা করেন গুরু গোবিন্দ সিং এর জীবনী। তার পূর্বে ১৮৯০ সালে প্রসন্নকুমার সান্যাল শিখগুরু সম্বন্ধে ও পূর্ণচন্দ্র লাহিড়ী গুরু কালিয়ান—এর শিখ ইতিহাস বাংলায় অনুবাদ করেন। ১৯১৩ সালে শরৎকুমার রায় 'শিখ গুরু ও শিখ জাতি' নামে একখানি বই রচনা করেন। এ ছাড়াও গুরু গোবিন্দ সিং এর জীবনী অবলম্বন করে কালক্রমে অনেক নাটক রচিত হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণেই এ সবই ছিল কলকাতায় বিদগ্ধজনের সৃষ্টি। পরবর্তীকালেও কলকাতার বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা শিখ ধর্ম নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন।

ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে হয়েছিল কলকাতায়। তার প্রথম উদ্যোগী রামমোহন শিখগুরুর আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হননি, ইসলামের একেশ্বরবাদ তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। শিখগুরু বা শিখধর্ম সম্বন্ধে তিনি কিছু লিখেও যান নি। ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। অথচ শিখগুরুর সঙ্গে তাঁর পরিচিত না হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কারণ তাঁর পেশার জন্য তিনি পাটনা গিয়েছিলেন যার কাছেনেই অবস্থিত ছিল ঐতিহ্যমণ্ডিত শিখ গুরুদ্বার পাটনাসাহেব। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে শিখধর্ম বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার দ্বারা বালক রবীন্দ্রনাথও প্রভাবিত হয়েছিল। ১৮৭৩ সাল, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন এগার। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে গিয়েছেন হিমালয় প্রবাসে। বোলপুর থেকে রেলপথে অনেক দেশিন অতিক্রম করে তাঁরা এসে পৌঁছলেন অমৃতসরে। এখানে অবস্থান করে কিছুদিন অবস্থান করে দেবেন্দ্রনাথ ও বালক রবীন্দ্রনাথ প্রাতেই অতিবাহিত করেন, গভীর অভিনিবেশে শুনতেন গুরু গ্রন্থসাহেবের পাঠ।

রবীন্দ্রনাথের মনে শিখধর্ম সম্বন্ধে যেটুকু যে ভেবেছিল তা শুধু আজও পরিলক্ষিত হয় পত্রাবলির তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে। রবীন্দ্রনাথ অনুষ্ঠিত এক সভায় তাঁর ভাষণে পুলিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় উল্লেখিলেন তাঁর ব্রাহ্মসমাজের আদি ব্রহ্মসঙ্গীতের রচিত উৎসবে

গগনের থালে রবি, চন্দ্র দীপক জ্বালে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে,
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে,
কেমন আরতি এ ভব খণ্ডন, তব আরতি
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।

রচিত তথ্য ও কাহিনীতে শিখ গুরুগোবিন্দ সিং ও শিখদের তাঁদের নিয়ে রচিত কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচয় বালাকাল থেকে। তাঁর এমন একখানি কবিতা

পঞ্চনদীর তীরে বেনী পাকাইয়া শিরে,
বেদিতে বেরিয়ে বসে যত জাগিয়া উঠেছে শিখ
নির্ভীক নির্ভিক
প্রভাত অরুণ গুরুজীর জয় ধ্বনিয়া উঠেছে দিক।
নূতন জাগিয়া শিখ
নূতন উষার সূর্যের পানে চাহিয়া নির্নিমিখ।

রবীন্দ্রনাথ গুরু গোবিন্দ সিং-এর জীবনী ও বাণী বলেছিলেন। মহর্ষি আদি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা পদ্ধতিতে ব্রহ্মসঙ্গীতের মন্ত্রিসের অনুকরণে ভজন-আরতির প্রবর্তন করেন। শান্তিনীকেতনে তেলের সেন নববিধানে সমাজ (ব্রাহ্মসমাজ এর ইন্ডিয়া) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১১.১১.১৮৬৬ তারিখে। সে অনুষ্ঠানে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসহ গুরুগ্রন্থ সাহিব থেকেও পাঠ করা হয়েছিল। কেশব সেন নিজেও ১৮৬৯ সালে পাঞ্জাব গিয়ে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেছিলেন যখন তারা তাঁকে গুরুগ্রন্থ উপহার দিয়েছিলেন। তিনি নববিধান সম্বন্ধে অবশ্য কিছু পরিবর্তন এনেছিলেন যা ছিল শিখধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর Response of Brahmo Samaj to the message of Guru Nanak প্রবন্ধে লিখেছেন He change the name of the Missionary Body to Sri Darbar and Put the epithet 'Bhai' before the names of the Missionaries. গুরুগ্রন্থসাহিব নানক প্রকাশ গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত ভাই মহেন্দ্রলাল বসু ছিলেন এ সমাজেরই প্রচারক। সাহারো নিজের ঊপর একজন কেশব-অনুরাগী অধিনায়কের মন্তব্যসহ জপজী ও সুখমনি পবিত্র গ্রন্থদুটোর বাংলার অনুবাদ করেছিলেন। নববিধান সমাজে পতাকা উত্তোলন এবং আরতির প্রবর্তন ছিল শিখধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, শীখদীক্ষার প্রথা বর্তমানে একমাত্র বিহারী গুরুদ্বারেই প্রচলিত, অন্য কোথাও নয়। স্বামী বিবেকানন্দও বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন জন্ম গুরু গোবিন্দ সিং-এর প্রবর্তিত ভাবনা দ্বারা। তিনি শিক্ষালয় ধর্মসম্মেলন থেকে প্রত্যাবর্তন করে ভারত

> ..... শিখ ধর্মের প্রতি, তাদের ইতিহাসের প্রতি, বাঙালি জাতির প্রজ্ঞাবিশিষ্ট আকর্ষণ.....

পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এই সময় কাশ্মীর থেকে ফিরে যাবার পথে ১৮৯৭ খ্রি: অমৃতসরের মন্দিরে অবস্থান করেছিলেন। তখন এখানে এক বক্তৃতায় হিন্দু জাগরণের গুরু গোবিন্দ সিং-এর অবদান কথা বিশ্লেষণভাবে উল্লেখ করেছিলেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নামরূপে উচ্চারিত শব্দ "ওয়াহে গুরু" ছিল তাঁর প্রিয়। এ অভিভাষণে শব্দে তিনি ছিলেন সংক্ষেপিত। তাই নানক সম্বন্ধে তিনি এর উচ্চারণ করেছেন। স্বামীজীর এ ভাবনা সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা যা মন্তব্য আছে তাই তা তিনি গ্রন্থে লিখেছেন.... The great Sikh Khalsa was one of the finest organisations ever created within the mother church and by her genius. With what order he painted for us, again and again, the scene is which Guru Govinda Singh uttered his call to sacrifice! স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বারা সমর্পিত হয়েছিলেন কিশোরী কর্মকারী শ্রীশ্রীজগদম্বিকারই ওপরে। এখানেই তাঁর নরেন্দ্রীকরণের সূত্রপাত। নরেনের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ লাভ করেছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী। নরেনকে তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তারপর তিনি আর মাত্র মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এ কাহিনীর কাছাকাছি করতে গিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতার নিকট যা বলেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে তাঁর পুস্তিকায় গ্রন্থে... 'Guru Nanak was like that, you know, looking for the one disciple to whom he would give his power. And he passed over all his own family–his children were as nothing to him–till he came upon the boy to whom he gave it, and then he would die. নিবেদিতাকে স্বামী ব্রহ্মানন্দের থেকে ২৬ মার্চ ১২৮০ তারিখের এক পত্রে লিখছেন, "তোমার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ হোক। বিশ্বাসের আশা ত্যাগ করিও না। জী গুরু গুরু। জী গুরু গুরু! তোমার ধমনীতে ক্ষত্রিয় শোণিত। আমাদের চলুন পোশাক মৃত্যুক্ষেত্রে মৃত্যুর সাজ। আমাদের জন্য মৃত্যুবরণই আমাদের লক্ষ্য, সাফল্য বা সার্থকতা নয়। জী গুরু গুরু।" পত্রের শেষের দিকেও বারবার উচ্চারণ করেছেন জী গুরু গুরু। শিখ ধর্মের প্রতি, তাদের ইতিহাসের প্রতি, বাঙালি জাতির প্রজ্ঞাবিশিষ্ট আকর্ষণ হেতু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণপুরুষ আশুতোষের মুখবন্ধিত উদ্যোগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখ ইতিহাস পাঠন-পাঠনের

করছে। ইদানীং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও তা শুরু-পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবু অনেকদেরের ধুলো মুছি অক্ষয় করে রাখার জন্য তাঁর নামে এ মহানগরীতে একটি রাস্তারও নামকরণ করা হয়েছে। তাঁর শহিদ ভ্রাতা সিং-এর স্মরণেও নামকরণ করা হয়েছে কলকাতায় একটি বিশিষ্ট পাড়ের। আমরা জানি, ১৯-৪-১৯১৯ তারিখে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে ব্রিঃ জেনারেল ডাইয়ের নৈশাচীন গুলি সন্ধ্যায় দশ হাজার নিরস্ত্র ও অবিশ্বি সত্যাগ্রহরত ভারতীয় উপর যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, তার প্রতিবাদে কলকাতায় কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ইংরেজদের দেওয়া 'নাইটহুড' খেতাব ফিরিয়েছিলেন — an stand, shorn of all special distinction, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance are liable to suffer degradation not fit for human beings. তাঁর এ পত্রখানির পূর্ণ বয়ান ৩-৬-১৯১৯ তারিখে দা স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশ পায় ও জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রচার করা হয়েছিল।

কলকাতায় শিখ সম্প্রদায়ের দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করলেও এ শহরের বাঙালি জনসাধারণের উপর তাদের প্রভাবের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অল্পকাল লক্ষ্য করা যায় বাঙালি মহিলাদের, বিশেষতঃ নিতান্তিকা/অবিবাহিতা তরুণীদের শাড়িপরার, কাঁধিয়ে ও চড়িয়ে রাখবার কায়দায়। অনেক যুবককে ইস্পাতের তৈরি বালাও ধারণ করতে দেখা যায়। অবশ্য এটি ধারণ করার কারণ হিসেবে সাধারণ তা শক্তির প্রতীক হিসেবে গণ্য করে থাকেন। তাদের তড়কা-রুটি আজকাল কলকাতার বাঙালিদেরও প্রিয় খাদ্য। তাদের তাজরা পান ও নৃত্য কলকাতার নব-প্রজন্মের বাঙালি সন্তান-সন্ততিদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে।

তারা এ নগরীর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এ নগরীর জনসাধারণের প্রতি তারা ভালবাসায় ও সম্মানে উদার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কার এক সন্তানহীন মাতৃস্থানীয় শিখ রমণীর স্নেহের দানে ধন্য হয়েছিল আমার জীবন। তারা শঙ্কর ঘোষ লেনে আমাদের আড়া বাড়ীর পাশের বাড়িতেই থাকতেন। একদিকালার ঐ সময়ের ছুটিদিন ঘোর ধরে তিনি আমার ঔরস সন্তানের মতো ধরে ধরে সঙ্গে করে বড় শিখ মন্দিরে নিয়ে গিয়েছেন। তখন ঐ বয়সে শিখধর্ম, তার উদারতা, গুরুবাণী সম্বন্ধে উপলব্ধি করার মতো পরিপক্কতা অর্জন করিনি। তবুও ঐ ভাবগম্ভীর পরিবেশে পবিত্র গুরুগ্রন্থের পাঠ ও সম্মুখে বসে আজ শিখ নর-নারীদের গুরু-বাণী শ্রবণের একনিষ্ঠতা আমার হৃদয়ে একটি স্থায়ী রেখে গিয়েছিল। পাকুড়ীকিয়াল, বঙ্গ পরে, ১৯৮৯ সালে অনুরূপভাবে আবার সুযোগ হয়েছিল। কর্মনিষ্ঠদের প্রফেসরার সন্তরের অনেক যুবক ছিলেন 'অমৃত ধারী' পোশাকে। একজন অন্বেষণেই সুদর্শন শিখ ভদ্রলোক স্নেহাপ্লুতচিত্তে হয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন আমরা কলকাতাবাসী কিনা। উত্তর শুনে খুশী হয়ে আমাকে বললেন। তিনি নিজেও কখনও কলকাতায় যাননি। পাঞ্জাবের সরকারের বড় বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন তিনি। আমাদের ঐ মিলনে মেতে আমি খুশী হওয়ার কারণটি কি ছিল : আমার এক দৃষ্টি ভেসে উঠেছে। সেকারণ তা ছিল ১৯৮৬ সাল। পুরানো দিল্লির ঐতিহ্যকে অবহিত হওয়ার নিমিত্ত শিখগুরু অর্জন মন্দির দেখার পরে খুঁজছিলাম গুরুগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ। তৈরি প্রতিষ্ঠানের ঠিক বিপরীত দিকের ফুটপাথে এক প্রৌঢ় শিখ ভদ্রলোকের বই এর সেকারণে তা পেলাম। পুরো বাহ দেওয়ার মতো অর্থ সঙ্গে না থাকায় তা কেনা থেকে বিরত হতে চাইলে শিখ ভদ্রলোক সাদরে ডঃ গোপাল সিং অনুরোধ হয়ে বসে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি ভাল করে দেখে আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন মূল্য সুবিধা মতো পাঠিয়ে দিলেই চলবে। আমি তাঁর বলেছিলাম। তখন হয়ে হয়েছিল কোন বিশ্বাসে তিনি অজ্ঞাতকুলশীল আমার মতো একজন অনুরাগকে তা নিয়েছিলেন ! ১৯৮৪ সালের নিহত শিখ বিরোধী দাঙ্গার যে ভাঙন ভারতে লক্ষ্য করা গিয়েছিল, কলকাতা মহানগরী ছিল তার ব্যতিক্রম। তবুও বাঙালি জাতির অন্তর্গত হওয়ার একটা কারণে হয়ে আসার দীর্ঘদিন হয়ে।

ভারি আশ্চর্যের কথা উত্তর ও পশ্চিম ভারতে একটা দীর্ঘ উদারতার মাধ্যমকাল সৃষ্টি করে অনুরূপের প্রতি নমনীয়তার অবশ্য উপস্থাপনে সহায়ক হয়েছিল। তা চিরস্থায়ী রূপ ধারণ করতে পারেনি। সমসাময়িক কালে বঙ্গদেশের ঐ ঐতিহ্য অবশ্যই হিন্দু বৃত্তের মধ্যেই তাঁর মহান জাতীয় জাগরণে একটি উদারতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, কিন্তু তা ছড়িয়ে পড়ে করেনি। কোন বিশিষ্ট পত্রের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধতা সম্ভবে কারণে তা অর্জন হয়েছিল। তবুও বাঙালি জীবনে কট্টরতাদের পাশাপাশি ধর্মীয় উদারতার উপর নির্ভরশীল একটা বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও চিরদিনই সক্রিয় ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণে অনুরূপ হয়েছিল কট্টরপন্থীদের 'ওয়াহাবিজ্‌ম'। যদেশের দৃষ্টি আজ হয়ে পন্থা গ্রহণ করতে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ সহ পাঞ্জাবের নবযুবকরা যেমন ঔদ্ধত্যের সঙ্গে হাত নিয়েছিলেন অনুরূপভাবে, তখনই বিদেশিরা বঙ্গদেশ তথা কলকাতার যুবকরাও। দুটি প্রায়ই দেশ বিভাজনের ভিন্ন ধারায় একদিকে হাত নিয়ে বৈরি এসে আবার অঙ্গ উঠে দাঁড়িয়েছে। আজকের কলকাতায় সে দুর্দিনের বিভাজনের নিকার হয়ে অনেক পাঞ্জাবী সহ শিখ সম্প্রদায়ের মানুষও কলকাতায় এসেছিলেন ভাগ্যের সন্ধানে। তারা সহ সমৃদ্ধ-বলিষ্ঠ হয়ে স্বাধীনভাবে অনেকে নিজেরও এ মহানগরীতেও। দুই আজার এ যুগল মিলন মহামোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের কলকাতায় চিরদিন ভোক্ত জাতির দর্শন ও ভাবের পথের প্রতীক রূপে।

ধর্মতলায় আলোছায়াময় বনবীথি

ঐতিহ্যবাহী নেহরু রোড আর পার্ক স্ট্রিটের সংযোগস্থলের জায়গাটি আর অষ্টাদশের মতো গুরুত্বপূর্ণ পুরিক্ষেত্রময় নেই। পাড় বাঁধানো পুকুর, গাছের ছায়ায় ঘেরা একটি উদ্যান কলকাতাবাসীদের উপহার দিল সি এম ডি এ। গত ৫ ডিসেম্বর এক অনুষ্ঠানে 'বনবীথি' নামক উদ্যানটি সর্বসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হল। শুধু 'বনবীথি'ই নয়, ধর্মতলার মোড়ের কাছে 'মনোহর পুকুর' এলাকার চারদিকে পথ আলোকে হয়েছে, পুকুরের পাড় বাঁধানো হয়েছে এবং লাগানো হয়েছে সুন্দর বেঞ্চিসমূহ। সব মিলে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী এই এলাকার পরিবেশ উন্নয়নের প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে চলেছে। উদ্বোধন করতে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেন, কলকাতা একদিন হিরোশিমা হবে, এমন ভয়ের আমরা এখনও চিড় ধরেনি। আমাদের নানা সমস্যা আছে। তবে তার মধ্যেই কলকাতার সৌন্দর্যায়নের কাজ হয়ে চলেছে। এই প্রকল্পগুলিকে এখন ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। কলকাতা পৌরসভার মেয়রকে আমি এই দায়িত্ব নিতে বলেছি। তিনি রাজি। মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, সি এম ডি এ-র এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। এই উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করবে পৌরসভা। বাইরের রাস্তায় আমরা ফুটপাতও তৈরি করে দেব। অনেকে বলেছিলেন, পৌরসভা আর রাজ্য সরকারে যাঁরা কাজ করছেন তাঁদের রাজনৈতিক চরিত্র ভিন্ন। তাতে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হবে কিনা।

কিন্তু গত কয়েক মাসে সেই সমস্যা একবারের জন্যও পড়তে হয়নি আমাদের। শহরের উন্নয়নের ব্যাপারে পৌরসভা, নগরোন্নয়ন বিভাগ, সেচ দপ্তর, পরিবহন দপ্তর—সবাই একসঙ্গে কাজ করলে আমরা শহরকে আরও সুন্দর করতে পারব। অনুষ্ঠানে রাজ্যের নগরোন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যও ভাষণ দেন। তিনি শহরকে আরও সাজানোর প্রতিশ্রুতি দেন। মঞ্চে সেনাবাহিনীর বেঙ্গল এরিয়ার জেনারেল অফিসার কমান্ডিং সি জে এস সাধুও উপস্থিত

কলকাতা ময়দানে বনবীথি উদ্যান দ্বারোদ্ঘাটন করছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, পাশে মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, পরিবেশমন্ত্রী মনীশ গুপ্তসহ, পৌর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য

ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবেশমন্ত্রী মানস মুখার্জি।

৭২ নং ওয়ার্ডে নবনির্বাচিত পৌর প্রতিনিধি

৭২ নং ওয়ার্ডের পৌর প্রতিনিধি তৃণমূল কংগ্রেসের অপেরার বাপ্পাদিত্য আকস্মিক মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়। গত ২৪ ডিসেম্বর এই ওয়ার্ডে নতুন করে উপ-নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হলে দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতমময়ী চট্টোপাধ্যায় পাঁচ হাজারের বেশি ভোটে জিতেছেন। এই ওয়ার্ডে কংগ্রেস প্রার্থী বিশ্বনাথ মজুমদার ও সি পি আই (এম) প্রার্থী রতন মজুমদার পেয়েছেন যথাক্রমে ১১৬৪ ও ১৬৪৯টি ভোট। বিজয়ী প্রার্থী গৌতমময়ী চট্টোপাধ্যায় পেয়েছেন ৬৮৬৪টি ভোট।

এ ডি বি-র ঋণ মঞ্জুর

কম আয়ের মানুষের পরিষেবার উন্নয়নের জন্য ২৫ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করেছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (এ ডি বি)। দ্রুত নগর ও শহরতলির পরিষেবার পরিবেশ বৃদ্ধিযুক্ত করা, পৌর পরিষেবার সকলের সমানাধিকার নিশ্চিত করা এবং পৌরসভার পরিচালনায় আরও স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে এই অর্থ দেওয়া হচ্ছে।

খাল সংস্কার, বস্তি উন্নয়ন, নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ইত্যাদি খাতে খরচ করতেই এই টাকা দিচ্ছে বিশ্বব্যাঙ্কের শাখা সংস্থা এ ডি বি। ঋণটির মেয়াদ ২৫ বছর। এর সঙ্গে অতিরিক্ত সময় হিসেবে আরও ৬ বছর দেওয়া হবে।

মেয়রের ত্রাণ তহবিলে দান

মেয়র পারিষদ শমসুজ্জামান আনসারি জানিয়েছেন, কানাঘুষো মহানাগরিকের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হুগলির বিধায়কের কর্মীরা মেয়রের ত্রাণ তহবিলে ১০০১ টাকা দান করেছেন।

পৌর মহানাগরিক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় পৌর প্রতিনিধি গৌতমময়ী চট্টোপাধ্যায়কে শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন। পাশে উপস্থিত তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃ সহ অন্যরা

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল স্মরণে

দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মৃত্যুবার্ষিকে কলকাতা পৌরসভার মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে মহানাগরিকের সঙ্গে ছিলেন মেয়র পারিষদ সদস্য। তমলুক গ্রন্থাগারে আরও অনেকে।

দেশপ্রেমিক বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়, পাশে মেয়র পারিষদ মানস রায়

বিদ্যাসাগর মেলায় অংশগ্রহণ

জীবনযাত্রা ও জনশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সপ্তম বিদ্যাসাগর মেলায় অংশগ্রহণ করেছিল কলিকাতা পৌরসংস্থা। অন্যান্য পূর্ববর্তী বছরের মতো এবারও পৌরসভার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এই মেলায় স্টল নির্মাণ করেছিল। প্রকাশনা ও বিভিন্ন বিভাগের আলোকচিত্র নিয়ে। মেলায় আগত বহু মানুষ এই স্টল পরিদর্শন করেছেন এবং পৌরসভার প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন।

মধ্য কলকাতায় বেআইনি বাড়ি ভাঙা হল

ঔপনিবেশিকের মনমোহন বর্মণ স্ট্রিটের একটি নির্মীয়মাণ বেআইনি বাড়ি ভেঙে দিল কলকাতা পৌরসভা। বিল্ডিং বিভাগের ডি জি জগদীশ বাগচীচৌধুরী বাড়ি ভাঙার সময়ে উপস্থিত ছিলেন। বিল্ডিং বিভাগের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানিয়েছেন বাড়িটি পুরোপুরি বেআইনি। কিছুদিন আগে পৌরসভা

মাছের প্রকাশে কলিফ্লাওয়ারের লাইসেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে অন্যদের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার

একটি অংশ ভেঙে নিয়েছিল। কিন্তু বাড়ির প্রমোটার ছাড়া অংশ প্রথমে নতুন করে তৈরি করে। ফলে বাড়ির পাশবর্তিত একাংশ ভেঙে পড়ার এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। তাঁরাক কাজে পুলিশের সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

পৌর বাজারগুলিতে অভিযোগ

পৌরসভার বাজার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ সদস্য সাবমুজ্জমান আনসারি পৌরসভার বিভিন্ন বাজারে ওজন কম দিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সভা করেছেন। এবং ঠিক হয়েছে যেসব বিক্রেতা এরকমে ঠকাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত কলকাতা পৌরসভার নিজস্ব ২৪টি বাজার আছে। আর এসব বাজারে ক্রেতাদের জিনিসপত্র ওজন করে দেখার ব্যবস্থাও আছে। এই ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে সেই জায়গাটা সহজে ক্রেতাদের নজরে আনার জন্য সাইনবোর্ড লাগানো হবে। বাজারের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পৌরসভা কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মাছ ব্যবসায়ীদের নতুন লাইসেন্স

গত ১ ডিসেম্বর চিংড়িঘাটার মাছ বাজারে ৪৩ জন ব্যবসায়ীকে কলকাতা পৌরসভার পক্ষ থেকে কন্ডিশন্ড-টেরাইজড্ লাইসেন্স দেওয়া হল। পৌর এলাকার ৫৭ নম্বর ওয়ার্ডের এই বাজারে দীর্ঘকাল ধরে ব্যবসা চলতেও লাইসেন্স ছাড়াই। পৌরসভার এই উদ্যোগের ফলে প্রায় ৫৩ হাজার টাকা আদায় হল বলে জানান মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার। এদিন সকালে এক অনুষ্ঠানে মাছ ব্যবসায়ীদের হাতে লাইসেন্স তুলে দেন মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার। অনুষ্ঠানে পৌর প্রতিনিধি পঙ্কজ দাকাল ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের অফিসাররা উপস্থিত ছিলেন।

গঙ্গার ১২টি ঘাট সংস্কার হবে

কলকাতার পৌরসভা ও পোর্ট ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে শীঘ্রই গঙ্গার ধারে ১২টি ঘাটের সংস্কার করা হবে। প্রাথমিক পর্বে কাশীপুর থেকে মুখোপাধ্যায় ঘাট ও আহিরিটোলা থেকে কাশীপুর এলাকার ঘাটগুলিসহ রাস্তাঘাট সারিয়ে আলো লাগানো হবে। ১ ডিসেম্বর মেয়র পারিষদ হলদিয়া শুল্কের সঙ্গে বন্দর কর্তৃপক্ষের সভা হয়। মেয়র পারিষদ জানান, পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে গঙ্গার ঘাটগুলোর সৌন্দর্যায়ন করা হবে। সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাংসদ কোটা থেকে এই জন্য ১৫ লক্ষ টাকা দিচ্ছেন।

ইফতার পার্টি

গত ২২ ডিসেম্বর কলকাতার ঐতিহ্যবাহিক টাউন হলে পৌরসভার উদ্যোগে এক ইফতার পার্টি অনুষ্ঠিত হল। এই পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার মহানাগরিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও প্রত্যেক মেয়র পারিষদ সদস্য, বিধায়ক আবদুল মান্নান, তাপস রায়, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মাইনরিটি ডেপুটি কমিশনারেট প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন স্তরের মানুষ যোগদান করেন। পৌরসভার বিরোধী পক্ষের সদস্য/সদস্যরা এই অনুষ্ঠানে আসেননি।

চিকিৎসাসংক্রান্ত জঞ্জাল না দিলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

মেয়র পারিষদ প্রদ্যুৎ গুহ আবর্জনাস্তূপের সঙ্গে চিকিৎসাসংক্রান্ত জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে পরিদর্শনরত

গত ১৫ ডিসেম্বর কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দপ্তরের মেয়র পারিষদ আলা করের সাংবাদিকদের নিয়ে হাপা পরিদর্শনে যান। সাধারণভাবে জঞ্জাল ফেলার ব্যবস্থা দেখানোর সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে চিকিৎসা সংক্রান্ত জঞ্জাল নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে সেটি তাঁদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখান। সেখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেয়র পারিষদ বলেন, সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ক্লিনিকগুলি যথাযথভাবে জঞ্জাল দিচ্ছেন না। দৈনিক সেখানে ৮ টন করে জঞ্জাল পাওয়ার কথা সেখানে পৌরসভা পাচ্ছে মাত্র ২.৫ টন। চিকিৎসা ঘৃণ্য ঠেকাতে এই বর্জ্য পদার্থ না নেওয়ার কারণ কিছু অসাধু লোকের যোগসাজশ। ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, স্যালাইনের বোতল, গ্লাভস, টুথ, ব্যান্ডেজ, ব্যাগ প্রভৃতি সব কিছুই একশ্রেণীর হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের কিছু অসৎ কর্মচারীর যোগসাজশে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। ভালভাবে জীবাণুমুক্ত না হওয়ার ফলে সংক্রমণ বাড়ছে। তিনি বলেন, সরকারি হাসপাতালগুলির জন্য গোটা বিষয়টি স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে জানাব। প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীকেও এই বিষয়ে চিঠি দেব। বেসরকারি নার্সিংহোম ও ক্লিনিকগুলির বিরুদ্ধে তিনি কড়া পদক্ষেপ নিতে চান। প্রয়োজনে নার্সিংহোমগুলির লাইসেন্স নবীকরণ না করারও হুমকি দিয়ে তিনি বলেছেন যারা জঞ্জাল জমা দেবে না, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে কলকাতা শহরে মোট ৬০৩টি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম আছে। এর মধ্যে সরকারি হাসপাতাল ও ডিসপেনসারির সংখ্যা মাত্র ৬৩। বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমের সংখ্যা ৫৭৯, বেডের সংখ্যা ৮৭৯৩, বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির অধিকাংশই কলকাতা পৌরসভা প্রদত্ত এই মেডিক্যাল লাইসেন্স সংগ্রহ করে বিজ্ঞাপনসর্বস্বতার মধ্যে ডুবে থাকার ব্যবস্থা করেছে। এর জন্য কলকাতা পৌরসভায় ১৩টি বিশেষ ধরনের গাড়ি ব্যবহার করা হয় এবং দুষণবিরোধী লাইসেন্সগুলি নষ্ট করার বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৯৮ সাল থেকে এই বিশেষ ডাস্টিং মেশিন কাজ করছে। ১২ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে ছাড়ে ৪টির উচ্চতার আলাদা ডাস্টিং মেশিনের বর্জ্য জল করে দূষণমাত্রার মানের মধ্যে এনে ফিরিয়ে পাঠাবার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

মেয়র শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য ডাস্টিং ট্রাইকে হাওড়ার জাংশন সংলগ্নিক নজরে ডাস্টিংটায় ঘুরে নিয়ে জল এবং জিনিসের জঞ্জাল মেলার রেকর্ড রাখা হচ্ছে, তা দেখেন। তিনি বলেন, পৌরসভার নিজস্ব জমিগুলিকে এখন থেকে দুপুর দুটোর মধ্যে এবং ভাড়া জমিগুলিকে দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যে জঞ্জাল মেলা শেষ করতে আদেশ দিয়েছেন।

এর পর মেয়র পরিষদ সাংবাদিকদের জানান, পৌরসভার জরুরি থেকে গত ৫ ডিসেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাতদিনে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল, চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট, বিদ্যাসাগর হাসপাতাল, কলকাতার পুলিশ হাসপাতাল, ডি এন দে মেডিক্যাল কলেজ হ্যান্ড হসপিটাল থেকে বর্জ্য পদার্থ পাওনি। এরপর তিনি সাতদিনে কুড়িটি সরকারি হাসপাতাল থেকে পৌরসভার প্রাপ্ত বর্জ্য পদার্থের এক হিসাব সাংবাদিকদের হাতে তুলে দেন।

হাসপাতালের নাম	প্রাপ্তের হিসাব
ডি ভার সি: হাসপাতাল (বেলে)	
ই এস আই	
ডি এন দে মেডিক্যাল	
অলেক্স ম্যান্ড হাসপাতাল	
রিজিওন্যাল ইউনানি	
(গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া)	
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	
লেডি ডাফরিন হাসপাতাল	
ডাঃ আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজ	
অন্যান্য হাসপাতাল	১৩
শীলরোডের সরকারি হাসপাতাল	৬৭
কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতাল	৩৫
ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেলথ	৩৭
শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল	৩
কলকাতা পুলিশ হাসপাতাল	৩
এস এস কে এম হাসপাতাল	১৩১
চিত্তরঞ্জন ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট	৪
চিত্তরঞ্জন সেবা সদন	৪৯
চিত্তরঞ্জন শিশু সদন	৩৬
কমান্ড হাসপাতাল	৫
সেন্ট্রাল হাসপাতাল	৩৬
বালানন্দ ব্রহ্মচারী হাসপাতাল	১৩
বিদ্যাসাগর হাসপাতাল	৩

কলকাতায় অনুষ্ঠিত সড়ক কংগ্রেস

কলকাতায় গত নভেম্বর মাসের ৩ থেকে ৭ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছিল ৬১তম সর্বভারতীয় সড়ক কংগ্রেস। এই উপলক্ষে কলকাতার ময়দানে টেকনিক্যাল প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে একটি স্টল নেওয়া হয়েছিল। পরিচয়ে ছিলেন রাস্তা বিভাগের চিফ-মুখ্যবাস্তুকার (যান্ত্রিক) দিবেশ দাশগুপ্ত। স্টলটি সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল। রাস্তা তৈরিতে পৌরসভা কীভাবে নিজেদের ক্ষমতায় নিজেরাই নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে সেটিই ছিল এই স্টলের মূল বিষয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত বিভিন্ন প্রতিনিধিবৃন্দ স্টলটি আগ্রহভরে ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। পৌরসভার ইতিহাসে এই ধরনের টেকনিক্যাল প্রদর্শনীতে সাধারণত অংশগ্রহণ করা হয় না সেই হিসেবে পৌরসভার সক্রিয় অংশগ্রহণ খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এই বিষয়ে কৃতিত্বের দাবিদার রাস্তা বিভাগের কর্মীবৃন্দ এবং দিবেশ দাশগুপ্ত যাঁর নেতৃত্বে তাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে কলকাতা পৌরসংস্থা প্রকাশিত বই পড়ুন

ছোটদের জন্য

আমাদের বিদ্যাসাগর

আমাদের সুভাষচন্দ্র

সাধারণের জন্য

মুক্তির সংগ্রাম ও কলকাতার পার্ক

C. V. Raman Birth Centenary Issue

Anthology Number 1924-1947

Netaji Birthday Com. Vol. Cent. eve-tribute

C. M. Gazette-Netaji Centenary Issue

Calcutta-a set of Pictures

Calcutta at a Glance

কলকাতা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে তথ্যসমৃদ্ধ পুরশ্রী নিয়মিত পড়ুন

উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সারা বছর পাবেন।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

১, হুগ স্ট্রিট, হুগ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০ ০৮৭

Tech / WB / RNP-127 / 2000

প্রাণ চাঞ্চল্যে মুখর
এক অনন্য শহর

কলিকাতা পৌরসংস্থা